KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : নীল ০২মার
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 C.m.
Vol. & Number : ৫৩/৩ ৫৩/৪ ৫৩/৫-৬ ৫৩/৮	Year of Publication : আষাঢ় ১৩৯৯ // July 1992 শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৯ // Aug 1992 ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৯ // Sep-Oct 1992 অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ // Dec 1992 Condition : Brittle Good
Editor : আবুল ০৩৯	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৫-৬ সেপ্টেম্বর-অকটোবর

''শম্ভু মিত্র : একটি পরিচয় — আলাপে আলাপে এক অন্বেষণ''—সন্দর্ভে নাট্যজগতের এই প্রবাদপুরুষের স্বরূপ সন্ধানে অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবিড় শ্রমসাধ্য প্রয়াস।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন্দ্র করে যে লোমহর্ষক নাটকীয় মুহূর্তের উদ্ভব ঘটেছিল অন্নদাশঙ্কর রায়ের ''বিনুর অপসরণ'' আলেখ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই ইতিহাস।

''অগস্ট বিপ্লব''—এর অর্ধশতাব্দী স্মরণে বিশেষ করে জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ভ।

অগস্ট বিপ্লবের সমসাময়িক কালে বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অবস্থা নিয়ে প্রচুর তথ্যসম্বলিত আলোচনা।

বিদগ্ধ লেখকের কলমে সহজবোধ্য ভাষায় ভারতের অর্থনীতির বিবর্তন এবং বর্তমান সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

''জাত বৈষ্ণব কথা''—এবারের পর্বে আরও চমকপ্রদ তথ্য।

''বিজয় তেন্ডুলকর — একটি ব্যক্তিত্ব'' — মারাঠি নাট্যবিষয়ে গবেষকের দ্বারা সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন।

নারীমুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তসলিমা নাসরিনের কৃতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি সমীক্ষা।

''দীপ্ত প্রাচ্যদর্শন''—প্রয়াত আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রীর দর্শনচর্চা নিয়ে একটি আলোচনা।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৫-৬
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯২
ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৯

শম্ভু মিত্র : একটি পরিচয় অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৯
বিনুর অপসরণ অন্নদাশঙ্কর রায় ৩৪৩

কবিতা
বিষামৃত কবিরুল ইসলাম ৩৫১
আমার ভারতবর্ষে মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৩৫২
ছবিগ্রাম রঞ্জন ঘোষাল ৩৫৩
শব্দের পরিপূর্ণ অভিষেক খালেদা এদিব চৌধুরী ৩৫৫
ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : জনগণের ভূমিকা গৌতম নিয়োগী ৩৫৬

গল্প
শাদা ঘরে ভোমরার গান অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ৩৬৬
বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বাংলার শ্রমিক আন্দোলন নির্বাণ বসু ৩৭৬

ধারাবাহিক রচনা
জাতবৈষ্ণব কথা : দ্বিতীয় পর্ব অজিত দাস ৩৮৭

গ্রন্থসমালোচনা
দীপ্ত প্রাচ্যদর্শন বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৩৯৭
সংগবেষণার নিদর্শন অরবিন্দ পোদ্দার ৩৯৮
'কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', 'শিল্প ও ব্যবধান' এবং একটি স-তর্ক জীবনী শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৩৯৯
সমকালের বাংলাদেশের চলচ্ছবি পল্লব সেনগুপ্ত ৪০২

অর্থনীতি
ভারতীয় অর্থনীতির সংকটের স্বরূপ সন্মথনাথ ঘোষ ৪০৪

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি
নারীমুক্তির পরিপ্রেক্ষিত ও তসলিমা বিজলি সরকার ৪০৯

নাটক
বিজয় তেণ্ডুলকর : একটি ব্যক্তিত্ব অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১৩

স্মরণে
শ্রীযুক্তা লীলা রায় শ্যামশ্রী লাল ৪১৯

মতামত
'উদ্বাস্তু'র সঙ্গে কি 'মারজিন্যাল মেন'-এর তুলনা চলে? রণেন্দ্রনাথ দেব ৪২২
'উদ্বাস্তু' সন্তোষকুমার দে ৪২৩
লাল রক্তের নীল আভা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৩
বিষ্ণু দে-র এলিয়ট অনুবাদ প্রণতি দে ৪২৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলি-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

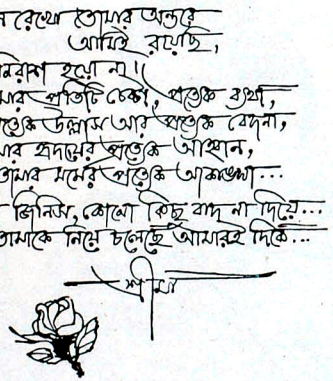

শম্ভু মিত্র : একটি পরিচয়

(আলাপে আলাপে এক অন্বেষণ)

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়
সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কয়েক বছর আগের কথা, ফোন করেছি একদিন।

'হুঁ, কে?'

নাম বলে জানতে চাইলাম:

'পরশু সন্ধ্যেবেলা ফ্রী আছেন?'

'এক মিনিট'।

কিছুক্ষণের নীরবতা। জানি ডায়ারির পাতা উলটোচ্ছেন। আবার ভেসে এল নিচু কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ। কখন আসবে?'

'এই, সাড়ে ছ'টা।'

'বেশ।' নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম বাড়ির সামনে। ধীরে সুস্থে সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে সর্বোচ্চ তলে পৌঁছে ঘণ্টি বাজাব বলে সুইচে যখন আঙুল রাখছি তখন আমার হাতের ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টা। সময় ঠিক রাখতে পেরেছি ভেবে আত্মপ্রসাদে ভরপুর মনে ঘণ্টি বাজাতেই একহাতে দরজা খুলে অন্যহাতে বাড়িয়ে দিলেন সদ্য বানান ধূমায়িত এক কাপ চা। চোখে-মুখে মজা করার চলকান হাসি, ভাবখানা যেন 'আমার সময়-জ্ঞানটাও কেমন সেটা বল!'

দেখা-হবার সময়টা নির্দিষ্ট করে-নেয়া শুধুমাত্র ওই মজাদার চমক সৃষ্টির জন্যই নয়। সময় মেনে-চলাটা তাঁর পক্ষে নিতান্তই স্বভাবসিদ্ধ। অথচ, সময়ের ব্যাপারে তামাম ভারতবাসীর মোটের ওপর মনোভাবটি হল: 'আজ কা কাম কাল হোগা, কাল কা কাম পরসো/ ইতনা জলদি কেয়া হ্যায়, জব জিনা হ্যায় বরসো'। তাই, তাঁর সঙ্গে সময় ঠিক করতে গিয়ে 'এই ধরুন, পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা নাগাদ' বললে যখন শুনতে হয় 'পাঁচটা? না, সাড়ে পাঁচটা?' তখন অনেকেরই মনে হতে পারে 'এ আবার বড্ডো বেশি বাড়াবাড়ি!' এই 'বাড়াবাড়িটা' যে তিনি অন্তত গত চল্লিশ বছর ধরেই করে আসছেন তার সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাপার হরফে যেমন ছড়ান আছে, তেমনই তাঁর সঙ্গে যারা বিভিন্ন সময় কাজ করেছেন তারাও কবুল করবেন। এই এক অনমনীয়তা থেকে নিজেকেও রেহাই দেননি তিনি কখনও। অতি সম্প্রতি শ্যামানন্দ জালান জানিয়েছেন রিহার্সালে 'ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় হাজির হতেন তিনি। ওঁকে দেখে আমরা ঘড়ি মেলাতাম। একদিন জানলা দিয়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি, শম্ভুদা বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন। তখন ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। বুঝলাম, ঠিক সময় উপস্থিত হবার জন্য প্রত্যেকদিনই

শম্ভুদা দশ-পনের মিনিট আগেই বাড়ির কাছে চলে আসেন। তারপর ঠিক ন'টা বাজলে তবে দরজার বেল বাজান।' (আলোকপাত, আগষ্ট ১৯৯২) বছর দশ- এগারো আগের কথা। তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছিল তাঁর নাসিরুদ্দীন রোডের ফ্ল্যাটের বসার-ঘরে বসে। কথা বলতে বলতে একসময় হাত তুলে ঘরটাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ''এখানটায় রিহার্সাল হত। রিহার্সাল একবার শুরু হলে এ'ঘর ছেড়ে ভেতরে যাবার অনুমতি ছিল না। উনি বলতেন—'তুমিও আর সকলের মত এখানে রিহার্স করতেই এসেছ। এটা তোমার বাড়ি বলে মাঝেমধ্যে উঠে গিয়ে সংসারের কাজ করে আসবে সেটা চলতে পারে না।' শাঁওলীর তখন বছর চারেক বয়স। একদিন ওকে ভাত খেতে বসিয়ে দিয়ে রিহার্সালে চলে এসেছি এ-ঘরে। বিকেলের দিকে আমার বোন এসেছে। সে পর্দা ফাঁক করে ইশারায় আমাকে ডেকে নিয়ে বলল 'দেখে যা, মুখপুড়ী, তুই কি মা!' উঁকি মেরে দেখি খাবার ঘরে ভাতের থালার ওপর গাল পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।''

এবারে যদি বলি, এই হলেন শম্ভু মিত্র মহাশয়। তখন অনেকেই অবাক হবেন, হয়ত ভাববেন, 'বারে! শুধু এইটুকু! শুধু সময়ানুবর্তিতা আর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই তাঁর পরিচয়ের শুরু এবং শেষ!' না, তা নয়। কিন্তু তাঁর পরিচয় সন্ধানের সূত্রটি মিলতে পারে এখান থেকেই। আমাদের চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে স্বভাবগত এই গরমিলের মধ্যে নিহিত আছে সেই সূত্র।

'যে-মানুষটিকে চিনতুম তিনি তো কেবল একটা অভিধা নন যে বাছা বাছা গোটাকতক বিশেষণ দিয়ে তাঁর সম্পর্কে আমাদের দায় চুকিয়ে দিতে পারি। তিনি তো নিকৃষ্ট হাতের আঁকা একটা নীরক্ত দ্বিমাত্রিক ছবি ছিলেন না। একটা বিরাট শিল্পী অজস্র জটিলতা দিয়ে একটা রক্তমাংসের পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করেছিলো যার নাম শিশির কুমার ভাদুড়ী।..কতোবার যে শিশির কুমারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার..... মনে হয়েছে মানুষটি একটি ব্যক্তি নয়, —অনেকগুলো ব্যক্তিত্বের একটা জটিল সংমিশ্রণে এই অনন্য মানুষটির সৃষ্টি হয়েছে।' (সন্মার্গ সপর্যা) তেত্রিশ বছর আগে শিশির কুমার ভাদুড়ী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এইভাবে ব্যক্ত হয়েছিল শম্ভু মিত্র মহাশয়ের মনোভাব। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই তাঁর এই লেখা আমাদের পড়া ছিল। পরিচয় হবার পর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কত সময় আমাদের মনের একখানা অংশ যেন খানিকটা দূরে সরে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে তাঁকে। ভেবেছে, এই যে মানুষটি আমাদের সঙ্গে এমন শান্ত স্বরে কথা বলে চলেছেন—অবলীলায় সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে তুলছেন আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য এবং তা করতে গিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ছে বিশ্বমনীষার প্রায় যাবতীয় সংশ্লিষ্ট ভাবনাচিন্তার সঙ্গে তাঁর সহজ-স্বচ্ছন্দ অথচ গভীর পরিচয়, এই মানুষটিই আবার আমাদের দেখা 'রক্তকরবী'-র রাজা, 'পুতুল খেলা'-র তপন, 'দশচক্র'-র ডঃ পূর্ণেন্দু গুহ, 'রাজা অয়দিপাউস'-এর অয়দিপাউস, 'মুদ্রারাক্ষস'-এর চাণক্য, 'গ্যালিলেওর জীবন'-এর গ্যালিলেওর মত একেবারেই আলাদা আলাদা চরিত্রগুলিকে মঞ্চের ওপর জীবন্ত করে তুলতেন। আর, আমাদের মনে হত জীবন সম্পর্কে পরম মূল্যবান কিছু অভিজ্ঞতা অর্জিত হল। কী করে তা সম্ভব হত? সমস্ত মহান অভিনেতার মধ্যেই কি তবে থাকে অনেকগুলো মানুষ? গোড়ায় এই রকম মনে হত। পরিচয় যত গভীর হয়েছে ততোই ধীরে ধীরে বুঝেছি—এক্ষেত্রে কোন সংমিশ্রণের জটিলতা নেই, এখানে লক্ষ্যণীয় হলো সংহতি। বহুপার্শ্ব-বহুস্তরের সমন্বয়ে এই এক সংহত অখণ্ডতা। এহেন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় এই সামান্য পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় পরতে পরতে মেলে-ধরা এই আশ্চর্য 'হয়ে ওঠা'-কে যার নাম — শম্ভু মিত্র। আর তাই, সম্ভবত, তাঁর সম্বন্ধে লিখতে বসলে প্রায় সকলেরই কলমের মুখে উঠে আসে 'জীবন্ত কিংবদন্তী' 'প্রবাদ প্রতিম' 'ভারতীয় আধুনিক থিয়েটারের প্রাণপুরুষ' ইত্যাদি কিছু বিশেষণ—যা আসলে নাট্যানুরাগীজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ, তাঁর পাওয়া দেশী ও বিদেশী সরকারী বা বেসরকারী উপাধি-সম্মানের তুলনায় যা হয়ত নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। কিন্তু, তাই বলে নিষ্কণ্টক পুষ্পার্ঘেই তিনি চির-অভ্যস্ত এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

বিপুল প্রশংসা সম্বর্ধনা সম্মান অর্চনা আর প্রায় সমপরিমাণ অসূয়া কুৎসা নিন্দা জুটেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তাঁর জীবদ্দশাতেই। আজ পর্যন্তও সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাননি তিনি। পরিমাণে ও মাত্রায় অতথানিই না-হলেও শম্ভু মিত্র মহাশয়কে নিয়ে সেই গোড়ার দিকের দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত চালুকথাও কিছু কম নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সবের অধিকাংশই বিশ্বাস্যতা ও সচলতা খুইয়েছে বটে তবে নির্মূল হয়নি বোধ হয় এখনও। প্রশস্তি অভিনন্দন সম্মাননার সমান্তরাল ছিল এই এক বিপরীত প্রবাহ। উজানভাটির আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার এই যুগপত্তা সামলে নিজের কাজ নিয়ে এগিয়ে-চলা নিশ্চয়ই বড় সহজকর্ম ছিল না তাঁর পক্ষেও। তবু দীর্ঘকাল ধরে তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন

তাঁর চর্চা ও সপর্যা। গড়ে দিচ্ছিলেন আমাদের নাট্যচর্চার সম্পূর্ণ এক নতুন পরিচয় যুগপৎ ভেতর ও বাইরে থেকে। প্রতিকূলতা যে শুধুই বাইরের বিরোধিতা থেকে আসে তা ত নয়, আনুকূল্যের মধ্যেও থাকে প্রতিকূলতার বীজ—সেই প্রতিকূলতা বাইরের নয়, অন্তর-উদ্গত। প্রশস্তি অভিনন্দনে নিজেদেরই মধ্যে ঘটে গণ্ডগোল—দেখা দেয় ঈর্ষা, কৃতিত্বের অংশভাগ নিয়ে শুরু হয় কাড়াকাড়ি, তখন দিশা যায় হারিয়ে—চলাটাই হয়ে ওঠে দিগ্বিদিক জ্ঞানরহিত। ''(নবান্ন-র অভিনয়ের জন্য) প্রতিরাতে দু'শ টাকা হারে শ্রীরঙ্গম ভাড়া নেয়া হয়েছিল সাতদিন। একটা দিন ফ্রী পাওয়া গিয়েছিল স্টেজ রিহার্সালের জন্য। চিনু (চিন্মোহন সেহানবীশ) চিন্তায় পড়েছিল সাতদিন করা যাবে ত—লোকে দেখবে ত! আমি হিসেব দেখিয়েছিলাম যে করা যাবে, 'জবানবন্দীর'-র সময় যে-হিসেবটা পাওয়া গিয়েছিল।...স্টেজ রিহার্সাল চলছে। জীবেন বোস (চিত্রাভিনেতা) আমার বন্ধু, তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম কখন কোথায় আলো জ্বলবে, কোথায় কমবে, নিভবে কখন। ফ্লাডলাইট্স আর কার্বন আর্ক, স্পট্স ছিলো না। ইমার্সন ডিমার। আমি অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছি—'এইবার ঢোকো' 'এখন আলো পড়বে' 'এইবারে স্টেজ ঘোরাও'। পেঁছন দিকে বসে অধ্যাপক অমুক গজগজ করছে 'পয়সা খরচা করে থাস্টামো হচ্ছে! এসব কখন লোকে দেখতে আসবে!'— সব জায়গাতেই ত লোক থাকে কখন কানে তোলার। আমাকে একজন জানালে।— চিনুকে ডেকে বললুম—আমি রিহার্সাল করাচ্ছি এখন। এসব কথা আমার আর্টিস্টদের কানে গেলে তাদের morale নষ্ট হবে। আমি কিন্তু এক্ষুনি এদের বের করে দিতে পারি, সেটা মনে রেখে যারা বসে আছে যেন বসে থাকে। তারা সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আর আমি ত কথাগুলো বলছি একটু গলা তুলে। চিনু নির্বিরোধী ভদ্র মানুষ—পড়লে মহা ফাঁপরে। কোনদিক সামলাবে।....যাই হোক, টিকিট কিন্তু সব বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিন 'উদয়ের পথে'-র বিমল রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় রায়, অল ইণ্ডিয়া রেডিও কোলকাতার এ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর প্রভাত মুখার্জিরা সব এসেছেন। অভিনয়ের শেষে ত ধন্য ধন্য। তখন ওই অধ্যাপক অমুক—থাস্টামো বলেছিল যে—একেকজনকে নিয়ে 'অমুক এসেছেন তমুক এসেছেন' বলে ভেতরে নিয়ে আসতে লাগল।...জামাকাপড় জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রেখে পথে বেরিয়েছি। আমি তখন গোয়াবাগানে 'ইপ্টা'-র মেসে থাকি। আগে আগে সুধীবাবু আর কারা কারা যেন। পেছনে আমি আর কল্যাণী (কুমারমঙ্গলম)। কল্যাণী বললে, 'এত প্রশংসা এত ধন্য ধন্য হচ্ছে কিন্তু, মেজদা, তোমার মুখ বিমর্ষ কেন?' আমি বললুম, এই প্রশংসাতেই বোধ হয় সর্বনাশ হল, কল্যাণী। (আমি জানিনা, এতদিন পর কল্যাণীর সেকথা মনে পড়বে কিনা, কিন্তু আমার মনে আছে।)'' (আমাদের ডায়ারি, জুন '৮৭) সাফল্য বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে, আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সাফল্য ত আরও বেশি করে, প্রায়-অন্ধত্ব এনে দেয়। ঠিক সাফল্যের ক্ষণটিতেই ব্যর্থতাকে প্রত্যক্ষ করে শঙ্কিত হওয়া এ'-ও আমাদের চলতি হিসেবের সঙ্গে মেলে না। চারপাশের মানুষজনের স্বভাব-সম্মত প্রতিক্রিয়ার বিপরীত।

আরও কিছু আগের কথা। ব্যবসায়িক থিয়েটারে তখন তিনি মোটের ওপর পরিচিত একটি নাম। মিনার্ভায় অভিনয় করছেন নায়কের ভূমিকায়, নাটকের নাম 'জয়ন্তী'। মহর্ষি মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। একদিন অভিনয় যখন চলছে তারই এক ফাঁকে জানতে পেলেন স্বত্তাধিকারী মহর্ষির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় মহর্ষি হল্ ছেড়ে চলে গেছেন। ব্যস, তার পরের দিন সকালেই চিঠি দিয়ে ছেড়ে দিলেন সেই থিয়েটার। নায়কের ভূমিকা—যশ কিংবা প্রতিষ্ঠার লোভ কোনটাই বারেকের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত করেনি সেদিনের সেই যুবককে। আমাদের সব চলতি হিসেব যে আবার ঘুলিয়ে যায়। আর কাউকে অপমান করা হয়েছে বলে নিজের বাড়া-ভাতে ছাই ঢালে কে! হোন পিতৃপ্রতিম, পিতা ত নয়—এই ত হল হিসেবটা, তবে নিজের উন্নতির পথ নিজের হাতে এমন করে বন্ধ করে কোন আহাম্মুক! আবার শুধুমাত্র যৌবনকেই এই কৃতিত্বের দাবিদার মেনে নিয়ে বিচার করতে গেলে ভুল করা হবে। কেননা যৌবনও যে মোহগ্রস্ত হয়, লুব্ধ হয়, বিচ্যুতি যে ঘটে যৌবনেরও —তার দৃষ্টান্ত শুধু একালেই নয় সর্বকালেই ভূরি ভূরি। কিংবা যদি কারোর মনে হয় যে, 'সেকালে ওসব আদর্শ-টাদর্শ ছিল, এখন আর নেই'—তাহলে রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টাটাই প্রকট হয়ে উঠবে, অভিমতের বাস্তবিকতা প্রমাণিত হবে না। যাই হোক, এ'-ও কিন্তু চারপাশে সচরাচর যেমনটা দেখি তার সঙ্গে ঠিক মেলে না।

মেলে না অনেক কিছুই। এখন আমাদের নাট্যচর্চার সঙ্গে যারা যুক্ত হয় তাদের অধিকাংশেরই যেমন দৃষ্টি থাকে কিছুদিন এখানে অভিনয় করে কীভাবে সুযোগ করে নেয়া যাবে 'ছোটো পর্দায়', তেমনই এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত নজরটা থাকত এখান থেকে শ্যামবাজার বা চিৎপুর কিংবা

টালিগঞ্জের দিকে। আর, বম্বে ত আজও চূড়ান্ত মোক্ষ। শম্ভু মিত্র মহাশয়ের আমলেও অবস্থাটা একই ছিল। গলফগ্রীন বা চিৎপুরের না-হলেও টালিগঞ্জের হাতছানি সেদিনও ছিল। বম্বে সেকালেও ছিল স্বপ্নের অতীত স্বর্গধাম। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে নির্মিত 'ধরতী কে লাল' চলচ্চিত্র-প্রযোজনার সঙ্গে সহ-পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন মিত্র মহাশয়। বম্বের চলচ্চিত্র-জগতের অনেকেই তখন তাঁকে জানতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। আমাদের ধারণা, চাইলে তিনি তখনই হিন্দী চলচ্চিত্রের জগতে নিজেকে সংযুক্ত করে নিতে পারতেন। করেন নি। বম্বেতে থেকে থিয়েটারের কাজ করবার আমন্ত্রণ ও সুযোগ অবশ্য আরও আগেই এসেছিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'-র নির্দেশক ছিলেন তিনি, কিন্তু অভিনয় করতেন না এতে। এই নাটকের হিন্দী অনুবাদ 'অন্তিম অভিলাষ' যখন বম্বেতে অভিনয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন বিজন ভট্টাচার্য ও গঙ্গাপদ বসু অপারগ হওয়ায় তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছিল, গঙ্গাপদ বসুর পরিবর্তে। ''সেটা চুয়াল্লিশের গোড়ার দিকের কথা। 'জবানবন্দী'-র অনুবাদ করেছিল নেমিচাঁদ জৈন। সে বিজনের রোল্‌টা করত। ওর স্ত্রী রেখাও করত। আর ছিল প্রেম ধাওয়ান। বম্বেতে চারনী রোড স্টেশনের কাছে সমুদ্রের দিকটায় একটা খোলা মাঠে ম্যারাপ বেঁধে তখন চলছিলো মারাঠী থিয়েটারের শতবর্ষপূর্তি উৎসব। পি.সি.যোশী ব্যবস্থা করেছিলেন—ওই উৎসবের শেষে দু'দিন বা তিনদিন ধরে হবে 'অন্তিম অভিলাষ'-এর অভিনয়। ওখানে রিহার্সাল দেখে অনেক কমরেডরা বললে, 'এ কীরকম পাঁচমিশেলী হিন্দী উচ্চারণ! অভিনয় দেখে ত লোকে হাসবে।' নেমিচাঁদ আর রেখার হিন্দী ছিল উত্তরপ্রদেশী, ধাওয়ানের পাঞ্জাবী-ঘেঁষা আর বাকিদের বাংলা-ধাঁচের। পি.সি.যোশী বললেন, 'রাহুল সাংকৃত্যায়নজীকে রিহার্সাল দেখান'। রাহুলজী এলেন, রিহার্সাল দেখলেন। আমাদের বললেন 'ঠিক আছে'। পি.সি.যোশীকে বলে গেলেন, 'নেমিচাঁদ আর রেখাকে বলুন উচ্চারণ ভেঙে অন্যদের সঙ্গে মেলাতে। বাঙালীর মতো করে হিন্দী বলার চেষ্টা করতে। দুর্ভিক্ষটা বাংলায় ঘটছে, নাটকে সেখানকার লোকদের কথা বলা হচ্ছে।' অভিনয় হল। পৃথ্বীরাজ (কাপুর) প্রতিদিন নিজেই—কেউ বলেনি তাঁকে—অভিনয়ের শেষে একটা চাদর হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন গেটের কাছে, দর্শকেরা যে যা পারেন চাদরে ফেলে যেতেন। সেই টাকাটাও ফাণ্ডে জমা হত। কথা ছিল 'অন্তিম অভিলাষ' নিয়ে আহমেদাবাদ ও গুজরাতের আরও দু-একটা জায়গায় যাওয়া হবে। আমি বললুম কোলকাতায় ফিরে যাব। যোশী বললেন, 'সেখানে কেন? এখানে থাকুন—এখানেই সেন্ট্রাল স্কোয়াড গড়া হবে, আপনি থাকুন তাতে। তাছাড়া, আপনি চলে গেলে 'অন্তিম অভিলাষ' অভিনয়ের কী হবে!' আমি বললুম—বিনয় রায় এসে গেছে, ও করবে অভিনয়। আমি কোলকাতায় যাব। বিজন নতুন নাটক লিখেছে সেটা করতে হবে।'' (আমাদের ডায়ারি, জুন '৮৭) থাকেন নি বম্বেতে। 'বিজনের সেই নতুন নাটক'— 'নবান্ন' করার জন্য ফিরে এসেছিলেন। পরে, আরও পরে দিল্লীতে 'রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়' থেকে শ্রী সতু সেন মহাশয় চলে আসবার পর ওঁর কাছে অনুরোধ এসেছিল দায়িত্ব গ্রহণ করার, দিল্লীতে থেকে নাট্যচর্চা করার জন্য। 'বাংলাই আমার কর্মস্থল' বলে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই প্রস্তাব। কিংবা 'জাগতে রহো'-র কথাই ধরা যাক। সেই পঞ্চাশের দশকেই 'আর.কে.ফিল্‌ম্‌স' প্রযোজনা কিন্তু ফিল্‌মী পরিভাষায় যাকে বলে 'বিগ ব্যানার প্রোডাক্‌শন' তাই। ভারতবর্ষে সেই প্রথম কোন চলচ্চিত্র 'গ্রাঁ পী' পুরস্কার পেয়েছিল, বাণিজ্যিক সাফল্য ত ছিলই। ''রাজ (কাপুর) আমাকে বম্বেতে থেকে ফিল্‌ম করার জন্য বলেছিল। আমি রাজি হই নি। বলেছিলুম, তোমাদের এখানে ফিল্‌মী দুনিয়ার যে পরিবেশ সেটা এত un-real— আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজ পরে একদিন এ কথাও বলেছিলো, 'আপনি কোলকাতায় বসেই ছবি করুন।' আমি বলেছিলুম—গল্প? সে বললে, 'That's your headache. আমি টাকা দেব, ব্যস। শুধু একটা অনুরোধ—শশী (কাপুর) বেশ ভালো অভিনেতা হয়ে উঠছে, ওকে কাজ করার সুযোগ দেবেন।''' (আমাদের ডায়ারি, মে '৯২)। কোলকাতাতে বসেই 'বিগব্যানার ফিল্‌ম' করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন—করেন নি। অথচ, চলচ্চিত্র শিল্পে যুক্ত থেকে অর্থ ও খ্যাতি দুইই উপার্জন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। 'জাগতে রহো'-র ক্যামেরাম্যান ছিলেন বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার রাধু কর্মকার। তিনি সম্প্রতি জানিয়েছেন, ''শম্ভুবাবুর এ্যাকটিং ট্যালেন্ট সম্পর্কে রাজকাপুরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, শ্রদ্ধা ছিল ওঁর ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টের ওপরেও। রাজ কাপুরের অনেক দৃশ্যের অভিনয় শম্ভুবাবু নিজে করে দেখিয়েছেন। সানন্দে রাজকাপুর ওঁর পরামর্শ মেনেও নিয়েছেন। আগে ছবি তোলেন নি, তবে দেখেছি ক্যামেরার এ্যাঙ্গল সম্পর্কে শম্ভুবাবুর খুব ভাল ধারণা ছিল। স্টেজের অভিনয়ের মত ছবি তোলার ব্যাপারেও উনি

পারফেকশনিস্ট। খুঁটিনাটি সব কিছুর দিকে ওঁর সতর্ক নজর থাকত। পারফেকশনে না পৌঁছান পর্যন্ত কম্প্রোমাইজ করতেন না। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক আইজেনস্টাইনের সহকারী মারি সেটান 'জাগতে রহো' দেখে দারুণ প্রশংসা করেন। বলেন, এই ছবি 'আওয়ারা'-র চেয়েও ভাল।'' (আলোকপাত, আগষ্ট '৯২)। চিত্র-পরিচালক দেবকী বসুর এককালীন সহকারী এবং 'জাগতে রহো'-র সহ-নির্মাতা অমিত মৈত্র বলেছেন, '(শম্ভু মিত্র) সিনেমাটা অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতেন। কিন্তু থিয়েটারের প্রতি টান ছিল বেশি, তাই সিনেমায় ডুব দিতে চান নি।' (ঐ) থিয়েটারের প্রতি টান ছিল, থিয়েটারই করে গেছেন। এসবের কোন কিছুই আমাদের চারপাশের মানুষজনের চলতি হিসেবের সঙ্গে মেলে না। একেবারেই না। আর মেলে না—মেলান যায় না বলেই কি এত কথা চালু হয়ে যায়। মুখে মুখে লেখায়-পত্রে দায়দায়িত্বহীন কথা—যা কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বলে দিলেই হল—মেনে নিলেই হল।

অপবাদ কম জোটেনি কপালে। পরিচয়ের গোড়ার দিকে আমরা কখন-সখন অন্যত্র নানা কথা শুনে বা পড়ে যখনই ক্ষুব্ধ স্বরে অনুযোগ করেছি, 'আপনি এরকম চুপ করে থাকেন কেন? কিছু বলেন না কেন?' তিনি হেসেছেন, উত্তর দেন নি কখার। আরও পরে কখন বলেছিলেন, 'ভদ্রলোকের পক্ষে এসবের মধ্যে না-যাওয়াই ভাল।' আমরা তারপরে আর অনুযোগ করিনি কখন। আমাদের মনে পড়ে গিয়েছিল :

-উত্তর দেও, চন্দ্রধর!

-প্রভু, এর কি উত্তর দেবি। নিজেরা গণিকা যারা তারাই না অন্য সকলেরে গণিকা কওনে এতো উৎসাহিত হয়, কারণ তদ্বারা যে তারা নিজ কলঙ্কেরই মোচনের আশা করে কি না—... এট্টা প্রশ্ন করি দেব, যেই দেশে এতোই সহজে সতেরে অসৎ আর শার্দুলে শৃগাল কয়ে দেয়্যা যায়, সেই রাজ্যে ন্যায়, নীতি, ধর্ম, শৌর্য, এ সকল বাঁচানের উপায় কোথায়?...

-কিন্তুক শার্দুল যে সত্যই শার্দুল তারে কে নিশ্চয় করে? সতী নামধেয়া যিনি নারী তিনি যে যথার্থে কামুকী গণিকা নয় তারে কে প্রমাণ করে?

-বাঃ, চমৎকার বিধান তোমার! সতী যে সত্যই সতী তার প্রমাণের ভার সতীরই উপর? আর, তারে যে গণিকা কয়্যা কুৎসা করে তার কোনো দায় নাই প্রমাণের?

-না, নাই। কারণ, স্বয়ং সেই মাতা জানকীরে অগ্নিগর্ভে ঝাঁপ দিয়্যা আপনার সতীত্ব সম্পর্কে সকলেরে প্রমাণ বোঝাতে হলো। অবশ্য তাতেও কই ফললাভ হোলো না কিছুই, পুনরায় বনবাসে যেতে হোলো।...

সত্যিই নিরর্থক।

শম্ভু মিত্র পেশাদারী থিয়েটারের ভাঙা হাট ছেড়ে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করার জন্য, সংগঠনকে ব্যবহার করেছিলেন নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য বা সঙ্ঘের ভিন্নধর্মী নাটকগুলির বিষয়ের গভীরে যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না তাই জেদ করতেন চমকদার প্রায়োগিক-কৌশল আর আঙ্গিকের ওপর ঝোঁক দেবার জন্য — এসব কথা লেখা হয়েছে ইতিহাস রচনার ছলে। অথচ, 'জবানবন্দী' বা 'নবান্ন' প্রযোজিত হবার আগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের এমন কোন পরিচিতি ছিল কি না যা কোন নিছকই উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেতাকে আকর্ষণ করতে পারে একথাটা অনেকদিন পর্যন্ত তেবে দেখার প্রয়োজন হয়নি যারা এসব বলতেন এবং যারা তা অভ্রান্ত বলে মানতেন একসময় — তাদের কারোরই। ভাবেন নি, তাহলে সেদিন পেশাদারী থিয়েটার ছেড়ে দলে দলে যোগ দিত আর অনেক যশলিপ্সু গণনাট্য সঙ্ঘে। প্রয়োজন হয় নি একথাও ভাবার যে মূলত যে-নাট্যপ্রযোজনা ক'টির জন্য বাংলা গণনাট্য সঙ্ঘের একটি সর্বভারতীয় পরিচিতি সেকালে গড়ে উঠছিল সেই প্রযোজনাগুলি আদৌ সম্ভব হত কিনা তাঁকে না-পেলে। এই কিছুকাল আগে শ্রী উৎপল দত্ত লিখেছেন, '...পেশাদারী সূক্ষ্মতা, পেশাদারী দক্ষতার নিদর্শন রাখলেন আমাদের শ্রী শম্ভু মিত্র মহাশয় তাঁর নাটকে। এবং তার ফলে আমাদের নাট্য আন্দোলনে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল। বোঝা গেল, নাটক না শিখে না বুঝে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়লেই হয় না।' (যুগান্তর, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯০) এই সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা-র জন্য যত্নকেই সেদিন বলা হচ্ছিল 'ধাস্টামো' 'চমকদার প্রায়োগিক কৌশল' ইত্যাদি। খেদ একটাই, শ্রীদত্ত নির্দেশিত সত্যটি মিত্র মহাশয় উপলব্ধি করেছিলেন তখনই আমাদের সেকথাটা বুঝতে অনেক দেরী হয়ে গেল। গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে দেবার পরেও তাঁকে গালপাড়া হতো renegade বলে। অথচ, একা তিনিই যে সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন সঙ্ঘের তা ত নয়। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র, কলিম শরাফী,

মহঃ ইসরাইল প্রমুখেরাও সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন সঙ্ঘ থেকে। গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম কর্ণধার সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তারপর, শ্রীশম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে এঁরা নাট্যচর্চায় যে নতুন ধারার সূচনা করেন বাংলার নাট্যানুরাগীরা শুরু থেকেই তা বরণ করে নেন পরম সমাদরে। কিন্তু, সরাসরি বা আড়াল-আবডাল থেকে গালমন্দ করাটা স্তিমিত হতে তবু সময় লেগেছিল।

'ছেঁড়া তার' নিয়ে গালাগালি দিয়েছিল কিছু সাম্যবাদী কাগজ-পত্র, কিন্তু 'পরিচয়' পত্রিকায় রবীন্দ্র মজুমদার প্রশংসা করে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। 'চার অধ্যায়' নিয়েও বিরূপতার হট্টগোল কম হয় নি। ষাটের দশকের গোড়ায় এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে শ্রী শম্ভু মিত্রের নাম জড়িত হয়ে কুৎসার প্লাবন বয়েছিল। কিন্তু পরে 'দশচক্র' নাটকে ডঃ পূর্ণেন্দু গুহ তাঁর বাড়িতে ছুঁড়ে মারা ইট-পাটকেলগুলিতে জড়ো করে রেখে যখন বলতেন যে ওগুলো, তাঁর 'কালচারাল হেরিটেজ' তখন দর্শক-আসনে বসে তা শুনে 'পরিচয়'-এর দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় লজ্জাবোধ করেছিলেন এই কথা স্মরণ করে যে ওই চিল তিনি নিজেও একদিন ছুঁড়েছিলেন। ক্লীবত্বের মধ্যে নিজের ভুলকে ভুল বলে ছাপার অক্ষরে স্বীকার করে নেবার মত পৌরুষ দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল।

''ছোট বেলায় দু-একটা কারণে পাড়াপড়শীদের কাছে খুব আদর পেতুম। পরেও, আমাকে পছন্দ করত অনেকে—আমার চেয়ে বয়সে বড়রাও। অল্পবয়সেও তো আমি যেমনটা তেমনই ছিলুম—একটু অহঙ্কার, একটু একবগ্গা, এইরকম (মাথাটা খানিক পেছনে হেলিয়ে চিবুক-উঁচু করে দেখালেন) করে চলতুম। 'মেজদা, তুমি রাস্তা দিয়ে চল যেন দেখতেই পাও না কিছু'—সকলে বলত। তাও লোকে পছন্দ করত। আমার প্রতি যে কিছু লোকের আক্রোশ আছে—সেটা টের পেলুম পরে। প্রথম প্রথম ক্যোর করতুম না। তারপর, ওর হিসেবটা একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলুম।''

(আমাদের ডায়ারি, মার্চ '৯২)

এককালে রটনা ছিল কারোর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার মানসিকতাই নেই তাঁর। অথচ, সমসাময়িকদের সঙ্গে নিয়ে চলবার চেষ্টা তাঁর মত করে আর কেউই, সম্ভবত, করেন নি আমাদের নাট্যচর্চার আধুনিক কালে। 'নবান্ন'-র নির্দেশনা ছিল তাঁর ও বিজন ভট্টাচার্যের যৌথ দায়িত্ব, 'জাগতে রহো'-র রচনা ও নির্মাণ এবং 'কাঞ্চনরঙ্গ'-র রচনা শ্রী অমিত মৈত্রের সঙ্গে যৌথভাবে। শ্রী বাদল সরকারকে আমন্ত্রণ করে হাতে তুলে দিয়েছিলেন 'বহুরূপী'র একটি প্রযোজনার দায়িত্ব। চেয়েছিলেন অরবিন্দ দেশপাণ্ডেই নির্দেশনা দিন 'চোপ আদালত চলছে' নাটকটির। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কয়েকটি নাট্যসংস্থাকে একত্র করে গড়তে চেয়েছিলেন একটি নাট্যপর্ষৎ। 'আটঘট্টিতে তাঁরই পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'। রূপকার, বহুরূপী, নান্দীকার, গান্ধার, অনামিকা প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী এবং উদয়শঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমলাশঙ্কর, সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর, আলি আকবর খান, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী সাহিত্যিকগণকে সম্মিলিত করে শুরু করেছিলেন এক অভূতপূর্ব ও সম্ভাবনাপূর্ণ আন্দোলন। কিন্তু, মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনাগ্রহে ফলবতী হয়নি সেই চেষ্টা। যে-কয়েক লক্ষ টাকা তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে সংগ্রহ করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত কিছুটা ফিরিয়ে এবং বাকিটা দান করে দেয়া হয়। ব্যক্তিগত দান যাদের ছিল তাঁদের অধিকাংশই জানিয়েছিলেন শ্রী মিত্র মহাশয় নিজের বিবেচনা মত সদ্‌গতি করতে পারেন টাকার, বাকিদের টাকাটা ফেরৎ দেয়া হয়েছিল সুদ সমেত। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। তিনি জানিয়েছেন, 'শম্ভুদা স্থির করেছেন নাটমঞ্চের জন্য সংগৃহীত সব টাকা ক্যান্সার হসপিটালে দিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের এক বন্ধু বলে বসল, আপনি যদি এমন কিছু লোক পান, যারা আপনার কথায় উঠবে, বসবে, নাকখৎ দেবে, কোন প্রশ্ন করবে না—তাহলে কি কাজটা আবার শুরু করতে পারবেন। উনি শান্তভাবে বললেন, আমার তো দাস চাই না, সহকর্মী চাই।' (যুগান্তর, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯০)

অর্থ রোজগার করার জন্য পেশাদারী থিয়েটারে ফিরে যান নি, চলচ্চিত্রে যুক্ত থাকার সুযোগ আঁকড়ে থাকেন নি, নিয়মিত অভিনয় বন্ধ করার পর 'চ্যারিটি'-র প্রয়োজন ছাড়া অভিনয় করেন নি যিনি 'অর্থলিপ্সু' বলে এককালে কুৎসা করা হয়েছিল তাঁর নামেও। একদিন কথাপ্রসঙ্গে হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, 'এতদিন বেঁচে থেকে বোধ হয় কিছু লোকের কাছে প্রমাণ করা গেল যে এই লোকটার টাকার লোভ হয়ত ততটা নয়।'

উল্লিখিত নিবন্ধে শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আরও একটি কথা জানিয়েছেন আমাদের, ''সময় ১৯৮০। তখন মাঝে মধ্যে উনি অভিনয় করলে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায় এবং লাইনে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। (কয়েকটি নাট্যসংস্থা মিলে কলকাতা নাট্যকেন্দ্র স্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনায়) শম্ভু মিত্র বললেন, 'আমি নিশ্চয় অভিনয় করবো। এটি ছাড়া অন্য প্রযোজনাতেও অভিনয় করতে রাজি আছি। আমার তো এখন খুব বাজার দর। তোমরা আমাকে ব্যবহার করে নাও। দুবছরের মধ্যে তিরিশ

চল্লিশ লাখ টাকা তুলে তোমাদের ভবিষ্যৎ কাজের জন্য একটা মঞ্চ একটা বড় জায়গা বানিয়ে নাও। 'দু-একজোড়া সন্দিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভাবছো এতে আমার খুব নাম হবে? আমার তো নাম আছেই। আর তোমরা যখন এই কাজটা সম্পূর্ণ করবে তখন তো আমি বেঁচে থাকবো না। সবটাই তোমাদের হবে।''' আমাদের খুব অবাক লাগে! কেন এমন হয়, কেন!

-আচ্ছা, কেন হেন হয় বলদিনি? চন্দ্রধর ব্যক্তিটা তো শুনি কিছু গুণধর ছিল, তবু দেখ, প্রচণ্ড আকৃষ্ট।...কেন? কী পাপ করেছে এই বণিকের বংশ যাথে এত লোক এত ক্রুদ্ধ তায়াদের প্রতি?

-উয়াদের চিন্তাভাবনা সব যেন সংখ্যালঘু মানুষের মতো। সমাজেতে বেশীভাগ লোকে যেট্যা ভাবে, ওরা তা ভাবে না। বেশীভাগ লোকে যেট্যা করে, ওরা তা করে না। এইট্যাই পাপ। আরে, জয়ী হতে গেলে এট্টা দলে বদ্ধ হওয়া চাই, আর সংখ্যাগুরু অংশটার যত লোভ মোহ আর দুর্বলতা আছে সেগুল্যাও পরিতৃষ্টি করণের পদ্ধতিটা জানা চাই।

চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা সবই সংখ্যালঘুর মতো, আশেপাশের মানুষজনের সঙ্গে মেলে না কিছুতেই। চলতি হিসেব দিয়ে মিলিয়ে নিয়ে একেবারে নিজেদের সমতলে এনে ফেলা যায় না। তবু সংখ্যাগরিষ্ঠদের তাঁর চেয়ে ভাল আর কে বুঝেছে আমাদের নাট্যচর্চার আধুনিককালে। দীর্ঘকাল ধরে ভিড় করে এসেছেন দর্শক তাঁর কাজ দেখবেন বলেই। শম্ভু মিত্র মহাশয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'যুগান্তর'-এর বিশেষ সাময়িকীতে শ্রী দেবেশ রায় ঠিকই লিখেছিলেন, 'মহত্ত্বের সঙ্গে বসবাস করা কঠিন। নিজেদের অষ্টপ্রহর হীনমন্যতায় ভুগতে হয়।'

কিন্তু, মহত্ত্বের সঙ্গ যে সবক্ষেত্রেই কঠিন নয় একথা শ্রী শম্ভু মিত্রকে যাঁরা জানেন তাদের অনেকেই নিশ্চয় মানবেন। তাঁর সঙ্গে মেলামেশায়, দেখেছি, সহজ না-হওয়াটাই বরং কঠিন। কতদিন সন্ধ্যে গড়িয়ে ক্রমে রাত গভীর হয়েছে বা পূবের রোদ পশ্চিমে ঢলোঢলো হয়েছে তাঁর সঙ্গে কথায়। মাঝে মধ্যে তৃষ্ণা একপক্ষ বা উভয়পক্ষেই তীব্র হলে নিজের হাতে বানিয়ে এনেছেন চা কিংবা কফি। আমরা আপত্তি তুলেছি 'চা-টা ও অন্যত বানাতে পারি' বলে। অকাট্য যুক্তি দেবার মত করে বলেছেন, 'কোথায় কোনটা আছে জানো না ত, কী করে করবে?' তাঁর রান্নাঘরের ঠিক পেছনটায় আছে কয়েকটা নারকেল গাছ, জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে গাছগুলোর মাথা দেখা যায়—পাতাগুলো প্রায় নাগালের মধ্যে। বাতাস বইলে সর্‌সর্ শব্দ ওঠে। চা বানাতে বানাতে একদিন বললেন, 'এই রান্নাঘরটা মেয়েদের পক্ষে খুব ভাল, না? কাজ করতে করতে নারকেল-পাতার শব্দটা কানে আসে, মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালে এতটা আকাশ দেখা যায়!' আর অমনি আমাদের মন যেন ফোকাসটাকে রি-এ্যাড্‌জাস্ট করে নিয়ে নতুন একরকম করে দেখতে পেয়েছে তাঁকে। কারা যেন 'মিসোজিনিস্ট' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল তাঁকে? 'পুরুষের নির্মিত সমাজে নারী তার আপন চরিত্র হ'তে ভ্রষ্ট হয়্যা গেছে। নারী তাই নিজেও জানে না কিসে সে পূর্ণতা পাবে।' —নারী-চরিত্রেরই মুখে এই সংলাপ লেখবার পরেও কারা যেন চেয়েছিল তাঁর সম্পর্কে ওকথা বলতে? একসময় নিজের হাতে চা বানিয়ে খাওয়ানোর প্রায় ধনুর্ভাঙা পণটাকে টলান গেছে, হাল ছেড়েছেন অবশেষে। কিন্তু, পরিহাস করে টিপ্পনি কাটতে ছাড়েন নি, 'সুযোগ পেয়ে মহিলাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছি এটা বোলো না যেন।'

'যখন থেকে থিয়েটার শুরু করেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি যা কিছু পড়েছি করেছি শিখেছি সবই থিয়েটারের জন্য।' (আমাদের ডায়ারি, এপ্রিল '৮২) শম্ভু মিত্র মহাশয়ের চারদশকব্যাপী নাট্যকর্মকাণ্ড বিষয়ে সামান্য ধারণা যার আছে সেও এই কথার সুগভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা আন্দাজ গড়ে নিতে পারবে। আর, যারা নাট্যচর্চা করেন তাদের অনেককেই হয়ত এই অপরিমেয় নিষ্ঠার মুখোমুখি হয়ে লজ্জায় অধোমুখ হয়ে থাকতে হবে। নিজেদের কাজের সঙ্গে নিজেদেরই সম্পর্কের ফাঁকিগুলো প্রকট হয়ে উঠতে পারে লহমার মধ্যে। কারোর মুখে শুনেছিলাম কিংবা কোথাও পড়েছি স্পষ্ট খেয়াল নেই, এক সাহিত্য সেবীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন তিনি পড়াশুনোটা করেন কিনা। ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন যে পড়েন বইকি। 'কি পড়েন?' এই ছিল কবির প্রশ্ন। ভদ্রলোক বলেছিলেন 'সাহিত্য পড়ি।' রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁকে বলেছিলেন, 'না, না, ও ত আপনার কাজ—আপনি ত সাহিত্য চর্চা করেন। পড়বেন ভূগোল ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি—এইসব পড়বেন।' মিত্র মহাশয়ের অধিগত জ্ঞানের ব্যাপ্তি আমাদের নাট্যজগতে প্রায় তুলনাহীন। অর্থনীতি, সমাজনীতি, নৃতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য যে-কোন বিষয়ের আলোচনাতেই তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ অপরিসীম। মানুষের চিন্তার ফসল—তা জ্ঞানের যে শাখাতেই হোক—জেনে বুঝে নেবার জন্য তিনি সর্বদাই উৎসুক। আর, এই সমস্তই

থিয়েটারের জন্য। 'আমি ঠিক করেছিলুম থিয়েটারে আমি থাকবই—অভিনয় করে বা পরিচালনা করে, তা যদি না-পারি সেট্‌স করব কিংবা লাইট করব, তাও যদি না-পারি তবে প্রমপ্‌ট করব, সেটাও যদি করতে না-দেয়, আমি দর্শকদের সীট দেখিয়ে দেব—আশারিং করবো। থিয়েটার আমাকে তাড়াতে পারবে না।' (আমাদের ডায়ারি, অক্টোবর '৮২)

বলা হয় অভিমান করে থিয়েটার ছেড়ে সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সরে থাকছেন শম্ভু মিত্র। এই 'অভিমান' শব্দটা শুনলেই হাসেন তিনি। বলেন, 'জীবনে এত দেখেছি—এই অভিমানের নামে এত কিছু ঘটতে দেখেছি যে ওই শব্দটাতেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি।' কিসের অভিমান, কেনই বা হবে অভিমান! আর থিয়েটার ছেড়েছেন তাই বা কে বললে! এই ত বছর ছ'য়েক আগেও অভিনয় করেছেন মঞ্চে। নিয়মিত অভিনয় বন্ধ করার পরও থিয়েটার নিয়ে পড়াশুনো অব্যাহত আছে, লিখেছেন মাঝে মধ্যেই। আগ্রহ উসকে দেবার মত সঙ্গ পেলে এখনও কথা বলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা থিয়েটার ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। আমন্ত্রণ পেলে দেখতে যান নতুন কাজ, তা সে কলকাতাতেই হোক বা হোক বম্বে দিল্লী ব্যাঙ্গালোর বা ভোপালে। সাগ্রহে আলোচনা করেন, বুঝে নিতে চান আজকের নাট্যচর্চার গতিপ্রকৃতি। এই অতি সম্প্রতিই কি তিনি তুলে দেননি আমাদের হাতে 'সন্মার্গ সপর্যা', 'নাট্যকলা কাকে বলে' আর 'নাটক রক্তকরবী'-র মতো মূল্যবান তিনটি বই? তবু বলা যাবে যে তিনি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন! থিয়েটারে তিনি আজও আছেন, আমাদের যে-কারোর চেয়ে বেশি করেই আছেন। কথা উঠলে অবশ্য হাসেন, বলেন 'বাঃ, সব কাজেই একটা রিটায়ারমেন্ট এজ আছে—আমি রিটায়ার করতে পারব না?' আমরা শুনি সেই কথা আর একই সঙ্গে শুনতে পাই আরও একটি কথা, '...সেই গভীর অর্থময় নাট্যাভিনয়ের সন্ধানে যতো অস্থির চিত্ত নাট্যশিল্পী আজ ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে প্রয়াস ক'রে চলেছেন আমি এখনো তাঁদের পিছনে উৎসুক চিত্তে অনুসরণ ক'রে যাচ্ছি। তাঁরাই তো ভরসা।....' (সন্মার্গ সপর্যা)

অথচ থিয়েটারে আসার কোনো কথা ছিলো না তাঁর। পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কস্মিনকালে কেউ-জড়িত ছিল না থিয়েটারের সঙ্গে। থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত থাকা ত দূরের কথা অভিনয়ে বা সঙ্গীতে তেমন আগ্রহই ছিল না তাঁর পিতৃ কিংবা মাতৃ বংশে। খুব ছোট বয়সেই মৃত্যু হয়েছিল মায়ের। 'বাবা একটা কথা প্রায়ই বলতেন...তোমরা ভেবো যে তোমরা কী করবে। কারণ তোমাদের জীবন ত আর আমি গিয়ে বেঁচে দেবো না...নিজের জীবনটা নিজেকেই বাঁচতে হবে। সুতরাং নিজেরা ঠিক করে নিও যে নিজে কী করতে চাও এবং নিজে কেমন করে বাঁচবে।' (বহুরূপী ৪৬, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) তবু যখন বাড়িতে প্রথম জানিয়েছিলেন যে তিনি অভিনয়ই করবেন বলে স্থির করেছেন তখন ''বাবা বলেছিলেন, 'ও লন চেনি মন্ চেনি ওদেশে হয়। এদেশে নয়। ওই যে কী যেন নাম—অভিনয় করে—কী ভাদুড়ী যেন—', আমি তো অবাক—সে কি পুণ্যশ্লোক শিশির ভাদুড়ীর নাম মনে করতে পারছেন না বাবা!'' (আমাদের ডায়ারি, অক্টোবর '৮৫) ছোটবেলায় এক আধটা অভিনয় করেছিলেন। ক্লাস এইট-নাইনে পড়েন তখন। ''বড়দা (নিজের নয়, বন্ধুর) ধরে ধরে নিয়ে যেতেন বাড়ির মাঝেদের শোনাবার জন্য, 'মেজমা, শম্ভু কেমন বলে শোন।' একদিন বড়দা বললেন আবৃত্তি করতে। আমি লাজুক হেসে জানতে চাইলুম সেটা কী। বড়দা বললেন, 'বলো—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।' আমি লজ্জায় একটু একটু হেসে ধরলুম। বড়দা বললেন, 'ওকি, ওরকম কেন! নগরের নটী অভিসারে যাচ্ছে। অভিসার। রাত্রিবেলা। পায়ের নূপুর বাজছে রুনুঝুনু। তুমি ওরকম করে বলছো যেন কাঁসি বাজছে না কী বাজছে।' তখন বুঝলুম এই মানেগুলো প্রকাশ করবার একটা ধরণ আছে। বড়দার গলাটা খুব খারাপ ছিল। কিন্তু, কবিতা গান—বিশেষ করে—কবিতার প্রতি খুব টান ছিল। কোত্থেকে হল কে জানে! বড়দার বাড়িতে কি ছিল? জানি না। মিত্র ইনস্টিট্যুসন-এ পড়তেন, হয়তো সেখান থেকেই হয়েছিল। সেখানে তখন বাংলা পড়াতেন কালিদাস রায়। হয়ত তাঁর জন্যই হয়েছিল। ওখানকার আরও অনেকেরই কবিতার চর্চা ছিল। হয়ত কালিদাস রায়ের জন্যই।'' (আমাদের ডায়ারি, মার্চ '৯২)

ম্যাট্রিকুলেশন-এর পর জ্যোতিনাথদার (নিজের দাদা নন, কিন্তু আপন থেকেও আপনজন) সঙ্গে ভাল দামের সীটে বসে অভিনয় দেখা শুরু হল। থিয়েটারে তাঁর উৎসাহ দেখে জ্যোতিনাথদা উপহার দিয়েছিলেন তিনখানা বই—একখানা লাইটিং আর দুখানা মেক-আপ সম্বন্ধীয়। তার মধ্যে একখানা আবার মেকআপ-এর জিনিস কী করে তৈরী করতে হয় তাই নিয়ে লেখা। তখন নাটকের অভিনয় যেমন দেখতেন তেমনি নাটক পড়তেনও। বার্নাড শ, গলসওয়ার্দি। ''এভ্‌রিম্যান লাইব্রেরির সংস্করণে ইবসেন-এর তিনটে নাটক ছিল: ওয়ারিয়র্‌স্ অব হেল্‌গেল্যাণ্ড, ঘোস্ট্‌স আর এ্যান এনিমি অব দ্য পীপ্‌ল। ওই তখন পড়েছি। ওয়ারিয়র্‌স্ অব হেলগেল্যাণ্ড-এর স্ট্রাকচারটা এত ভাল—পড়ে একেবারে তাজ্জব! নাটকে সাধারণত কী হয়, একটা পয়েণ্টে শুরু হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে থাকে ত? এখানে বর্তমানের মধ্যেই অতীতটা বুনে দেয়া। যা ঘটছে তা অতীতেরই কিছু কিছুর জন্য ঘটছে, এই ঘটতে ঘটতে যখন একেবারে শেষে গিয়ে পৌঁছান গেল তখন আবার অতীতেরই আর একটা কিছুর জন্য—। এনিমি অব দ্য পীপল ত, মনে আছে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়েছি। ওই মীটিং-এর দৃশ্য যেখানে সবাই ঢিল-ঢিল ছুঁড়লো সেই পর্যন্ত পড়ে একবার উঠতে হয়েছিল কলঘরে যাবার জন্য। সেখানে গিয়ে ভাবছি যা হবার সবই ত হয়ে গেল—সকলের কাছে খুলে বলার পর ত এই হেনস্থা হয়ে গেল, আর কী হতে পারে! ...তখন এইসব নাটক পড়তে পড়তে বুঝতে পারছিলুম নাটক লেখাটা খুব শক্ত কাজ। তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে যত সব কবিদের—এই ধরো শেলি কীট্‌স—এদের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সব ছোকরা ছোকরা কবি। আর, যে সব নাটককার বা ঔপন্যাসিকদের ছবি পাওয়া যায় সব বুড়োবুড়ো দাড়িওয়ালা। আমার তখন ওইরকম মনে হত। তখনই আমি বার্ট্রাণ্ড রাসেল পড়তে শুরু করেছি। রোমাঁ রোঁলার 'জঁ ক্রীস্তফ' পড়েছি—গিমার্কেব্‌ল্! ফ্রয়েড, ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল পড়েছি। আপিয়া-র সেটস—গ্রি ডিমেন্‌শনাল সেট্‌স, লাইট ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখা পড়েছি।

''আমার নাটক ভালোবাসা বা বলা যায় নাটকের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠা নাটকে আসার আগেই। এইসব বইপত্র পড়ার মধ্য দিয়ে। এই ধরো, সতেরো থেকে উনিশ-কুড়ি বছরের মধ্যেই নাটক সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট মতামত তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার। প্রথম যখন শুনেছিলুম যে 'রীতিমত নাটক'-এ প্রেক্ষাঘর থেকে হই-হই করে উঠিয়ে-আনা হয় অভিনেতাদের তখন খুব ইম্‌প্রেস্‌ড হয়েছিলুম। পরে, 'ওয়েটিং ফর লেফটি' পড়েছি—জেনেছি যে ওই নাটকের অভিনয়ে ওটা করা হত এবং তার একটা মানে হত। 'সীজার এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা'-তে অতবড় সেট্‌স—পুরোটা প্রায় নিমেষে সরিয়ে দেয়া হত তা আমি জেনে গেছি তখন, অর্থাৎ ওয়াগন স্টেজ-এর কথা জানি। এখানকার সব দেখেশুনে মনে হত 'ধুর্, থিয়েটার করে ছেলেমানুষেরা।' তখন বাবার কাছে চলে যাই—উত্তর ভারতে, বছর দুয়েক ছিলুম। বাবা রিটায়ার করার পরেই ওখানে চলে গিয়েছিলেন। গোড়ায় লখনৌতে, পরে এলাহাবাদে। দুপুর বেলাটা সরকারী পাব্‌লিক লাইব্রেরিতে যেতুম। নোয়েল কাওয়ার্ড তখন পড়েছি। 'হে ফিভার' আরও সব। মনে আছে, পড়তে পড়তে হাসি চাপতে পারতুম না প্রায়ই—গলার কাছটায় এসে যেত। চারপাশে অন্য আরও অনেকে পড়াশুনা করত ত সে কী অস্বস্তি! একদিন লাইব্রেরী থেকে বাড়ি ফিরেছি সন্ধ্যেবেলা, খোলা-গায় নিচতলার বারান্দায় হাঁটছি। পাশের বাড়িতে রেকর্ড বাজছে। শুনলুম 'উদিপুরী, তুমি এখানে!'—নাকি ওই জাতীয় কিছু, ভাদুড়ীমহাশয়ের কণ্ঠস্বর। বোধ হয় কঙ্কাবতী উদিপুরী। ব্যস, আমার কানে যেন শ্যামের বাঁশী বাজল। মনে হল, নাটক করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। আরও মনে হল—'ধুর্, একুশ বছর বয়স হয়ে গেল—এই বয়সে লোকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যায়, আর আমি বসে বসে বাবার পয়সায় খাচ্ছি!' বাবাকে বললুম—আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। চলে এলুম কলকাতায়। তারপর কিছুদিন আরও কেটে গেল। একদিন একজন বললেন, 'কি শম্ভুবাবু, থিয়েটারে ঢুকবেন? চলুন, ভুমেন রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—আলাপ করিয়ে দিই।' আমি বললুম—নাহ্, ওখানে গিয়ে কী হবে। আর তখন, জ্যোতিনাথদা—যে জ্যোতিনাথদা কখনো আমাকে কিচ্ছু বলেন না, আমি যা বলি সেটাকেই ঠিক বলে মেনে নেন, বললেন, 'খুব ত আমাদের কাছে লম্বা-চওড়া কথা বল—করে দেখাও না।' আমার এমন রাগ হল কী বলবো! চলে গেলুম।'' (আমাদের ডায়ারি, মার্চ '৯২) সেই শুরু।

পারিবারিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেমন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলও তেমনি এবং হয়ত জীনবাহিত উত্তরাধিকারও নিয়ন্ত্রণ করে একজন মানুষের 'হয়ে-ওঠা'-কে। শম্ভু মিত্র মহাশয় যখন থিয়েটারে যোগ দেন তখনও বাংলা নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত তামসিকতার ভাবটি বেশ প্রবল। শিশির কুমার সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্র চন্দ তাঁর স্মৃতিচারণা শুরু করেছিলেন এইভাবে, ''আমাদের ছেলেবেলায় একটি কথা চালু ছিল, বাঙালীর দুই প্রিয়, মোহনবাগান আর শিশির ভাদুড়ী। দুই নিয়ে বাঙালীর গর্বের অবধি নেই, আবার দুইয়ের জন্য ক্ষোভের অন্ত নেই। এক গোষ্ঠী খেলার মাঠে গোরাদের হারিয়ে বাঙালীর মান রেখেছে, অপর জন নাট্যজগতে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু ক্ষোভের কারণ এই যে, এক গোষ্ঠী মধ্যে মধ্যে 'ভাল খেলিয়াও পরাজিত' হয়, অনেকের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়। আর অপর জন মধ্যে মধ্যে পানাধিক্যে মঞ্চে বেসামাল হয়ে পড়েন, দর্শকেরা টিকিটের দাম ফেরত পেয়ে ক্ষোভ মেটাবার চেষ্টা করেন।'' (দেশ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। তবু

এই পরিবেশে যে-কোন নবীন যুবার পক্ষে বেসামাল হওয়া বা অধঃপতনের ঢাল বেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল তখন। মিত্র মহাশয়ের বেলায় সেটা ঘটেনি। তিনি বলেন, 'ওখানকার সব খানাখন্দগুলো সম্বন্ধে মহর্ষি আমাকে সতর্ক করে দিতেন, ওঁকে পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছিলুম।' 'মহর্ষির কাছে আমার কোনো বাধা ছিল না। যৌনজীবন থেকে মহত্ত্বের অনুভব পর্যন্ত সমস্তই আমাদের আলোচনার বস্তু ছিল। এবং তাঁর উপলব্ধিগত জ্ঞানের দৃষ্টান্ত আমি অতোদিন ধ'রে অতো নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি ব'লে আমার ভাগ্যকে আমি ধন্য মানি।' (সন্মার্গ সপর্যা) তাঁর হয়ে-ওঠাকে মহর্ষি নিশ্চয়ই অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিলেন। মহর্ষির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূচনাটি কিন্তু বেশ। 'এই সবে থিয়েটারে ঢুকেছি তখন। সেকালে বুধবার অভিনয় হত—বৃহস্পতিবার নয়। বুধ, শনি আর রবি। রোববারে একটা অভিনয় হত। বোধ হয় কোন একটা সোমবারই হবে, ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার গিয়েছি আড্ডা দিতে। থিয়েটারের লোকেদের আড্ডা। মহর্ষি ছিলেন সেখানে। অন্যেরাও ছিলেন। মহর্ষিই তুললেন কথা—রিলেটিভিটি নিয়ে। বয়সটা কম, ও-বয়সে একটা দেখানেপনা ত থাকেই। আমিও যে কিঞ্চিৎ পড়াশুনো করি সেটার জানান দিতে ইচ্ছে হল। বললুম যে আমি এটা পড়েছি ওটা পড়েছি কিন্তু রিলেটিভিটি থিওরীটা বুঝতে পারিনে। কথা চলতে লাগল। কথায় কথায় উঠে পড়ল তা বললুম ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কও বুঝতে পারিনে। মহর্ষি বললেন যে ওইজন্যেই তিনি সায়েন্স নিয়ে পড়েছিলেন। সাহিত্য ত নিজে পড়া যায়—কিন্তু সায়েন্সটা কেউ পড়িয়ে না-দিলে বোঝা একটু কঠিন। আমি মুখে কিছু বলিনি, কিন্তু মনে মনে বলেছিলুম—বাঃ, ভারি বুদ্ধিমান লোক ত! কথা বলতে বলতে একসময় খেয়াল হল কখন যেন অন্যেরা সবাই থেমে গেছে, কথা চলছে আমাতে-মহর্ষিতে শুধু। ওঁর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে আলোচনা করছি দেখে তারপরেই রটনা হয়ে গিয়েছিল শম্ভুবাবু এম.এ.পাশ। (তাদের কাছে ওটাই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা ত!) মহর্ষি পরে বলেছিলেন যে আমাকে নাকি তিনি বাজিয়ে দেখছিলেন, কতরকম ছেলেই ত আসে থিয়েটারে। তা সেই বাজিয়ে দেখেই নাকি তাঁর মনে হয়েছিল—এই ছেলেটিকে আগলে রাখা দরকার।' (আমাদের ডায়ারি, মার্চ '৯২)

কিন্তু, আগলে রাখব মনে করলেই আগলান যায় না। যাকে আগলান সে নিজে যদি আগলছাড়া হয় তবে শত সদিচ্ছা, শত যত্নেও যে নষ্ট হবার সে নষ্ট হবেই। তাই এক বিচারে নিজের হয়ে-ওঠার চূড়ান্ত দায়িত্ব নিজেরই। এই চূড়ান্ত দায়িত্বকে খণ্ডিত করে বিচার করা চলে না। মানুষের চরিত্রের নৈতিক গড়ন, তার স্বজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি, তার মনন, তার শিল্পবোধ, সৃষ্টিক্ষমতা—সবই হল তার ব্যক্তিত্বের অংশবিশেষ। কিন্তু, সেই ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা এই অংশগুলির হিসেবে টুকরো করে দেখতে হলে সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট না-করে তা দেখার উপায় নেই। প্রাচীন চিন্তায়—কি গ্রীক, কি ভারতীয়, কি ইহুদি দর্শন-ভাবনায়—মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি তাই উঠে পড়েছে বারবার। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে-ওঠার পর্যায়ে 'এই ত আমি' এটুকু জেনেই ক্ষান্ত হয় না মানুষ। 'আমি কে?'—এই প্রশ্ন তাকে তাড়া করে ফেরে। জীবনের অর্থ-সামগ্রিক জীবনের অর্থ সন্ধানলিপ্সা অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে এক সম্যক ধারণা—এক জীবনবোধ গড়ে তোলার প্রবল তাগিদ মানুষের পক্ষে 'স্বাভাবিক'। দার্শনিক আব্রাহাম যোশুয়া হেশেল-এর ভাষায়, 'মানুষ যেন predicate-এর সন্ধানরত এক subject।' 'আমি কে?' আর 'জীবনের অর্থ কী?' এই দুই অনুসন্ধানের টানে হয়ে-উঠতে থাকে যে মানুষ, নিজের পরিচয় আর জীবনবোধ ক্রমেই গড়ে উঠতে থাকে তার—আর, এরই ফলে সংহত অখণ্ডতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব।

-তুমি কী? কে তুমি? মানুষের নিজের তো এট্টা কোনো পরিচয় থাকা চাই। নাকি, আমরা কেবল মুকুরের সুমুখে দাঁড়ায়ে নানাবিধ ভূমিকার অভিনয় করো-করো যাব? শুধুই মুখোশ? মানুষের মুখ নাই কোনো?—এইসব সামাজিক পরিচয় পার হয়্যা অপরিবর্তিত কোনো সত্তা নাই মানুষের?

একটা না একটা সময়ে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হয় মানুষকে, ব্যক্তিমানুষকে—মনুষ্যজাতিকেও।

কিন্তু, এই প্রশ্ন কেন উঠিয়ে ফেলা হল তাঁর লেখা এ-পর্যন্ত শেষতম এবং আমাদের নাট্যসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি, অতিবিরল গোত্রীয় এই 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে? সে কি এমনি এমনিই? ষাট দশকের মাঝামাঝি যখন 'দু'টি অন্ধকারের নাটক' 'রাজা' এবং 'রাজা অয়দিপাউস'-এর প্রস্তুতি চলছে তখন কেন তাঁর মনে এসেছিল চাঁদ সদাগরকে নিয়ে এমন এক নাটকের ধারণা! কোন যোগসূত্রে গাঁথা এই সৃষ্টিগুলি? নাকি এ নিতান্তই সমাপতন? তাঁকে জিজ্ঞেস করা অর্থহীন, তিনি মৃদু হাসেন আর বলেন, 'ও-সব তোমরা ভেবে দেখ। আমার যা করার ছিল করেছি, ব্যস।' সত্যিই ত ভেবে-দেখার আর বুঝে-নেবার দায়টা আমাদেরই। আমরা আগেই

বলেছি—আমাদের নাট্যচর্চার এক সম্পূর্ণ নতুন পরিচয় তিনি গড়ে দিচ্ছিলেন যুগপৎ ভেতর ও বাইরে থেকে। কীভাবে তা করছিলেন তিনি?

ওই প্রশ্নের মধ্যে যাবার আগে একবার বরং দেখে নেয়া যাক যে-শ্যামবাজারী থিয়েটারটা তিনি ছেড়ে এসেছিলেন তার চেহারাটা কেমন ছিল। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এই থিয়েটারকে যিনি অন্দর থেকে জানতেন, লিখেছেন, 'রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার সম্পূর্ণ ইংরেজদের আমদানি।....ক্রমে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে থিয়েটার ব্যবসায় হিসাবে চলতে আরম্ভ হয়। ব্যবসায় হিসাবে চলার জন্যে থিয়েটারকে জনপ্রিয় করবার তাগিদ আসে, আর জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা ছিল ব'লেই ব্যবসায়ীর দৃষ্টি থিয়েটারের ওপর পড়ে। থিয়েটার যখন ব্যবসায় নামে, তখন বাংলায় হিন্দুর পুনরুত্থানের কল্পনা প্রবল।... সেই হিন্দু ভাবধারার প্রাবল্যের মধ্যে কলকাতার রঙ্গালয় যাত্রা শুরু করে। গিরিশ সেই ভাবধারা থিয়েটারের খাদে চালিয়ে জনমনকে নিলেন টেনে। তারপর এল বাংলায় স্বাদেশিকতার বন্যা। সে-উদ্বেলও হিন্দুরঙে রঞ্জিত। থিয়েটারের পক্ষে সে-ভাবধারায় যুক্ত হতে বিলম্ব হ'ল না।...কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন যখন দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রসারের আবশ্যকতা এল তখন থিয়েটার ফেলল খেই হারিয়ে। বিরাট গান্ধী-আন্দোলনের সঙ্গে থিয়েটার সেজন্য তাল রেখে চলতে পারেনি। আন্দোলনের প্রসারতা ও গভীরতা যতই বেড়ে যাচ্ছে (এমনকি গান্ধীকে অতিক্রম ক'রেও) থিয়েটারের পঙ্গুতা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।' (থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ) শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ লিখেছেন, '...তাঁর (শম্ভু মিত্র মহাশয়ের) আগে ভারতীয় থিয়েটারের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রমোদ পণ্য সৃষ্টি। এই সৃষ্টি মান তো মূলত ব্যবসায়িক শর্ত, মুনাফার শর্ত। শিল্প, দেশপ্রেম, সমাজবোধ—এসবই ছিল ঐ শর্তের অধীন। যেটার যতটুকু টিকিট বিক্রীর সহায়ক সেটার ততটুকুই গ্রহণযোগ্য।.....' (আলোকপাত, আগষ্ট '৯২)

এই প্রমোদ-পণ্যের বেসাতি—এই পঙ্গু থিয়েটার ছেড়েই ঘরে এসে বসেছিলেন তিনি। '...ঐ যে থিয়েটার ব্যবসায়িক চেহারায় হ'তো। সেটাতে একদম ভালো লাগতো না।....আমাদের যে অভিনয়টা হয় বা...যে নাটকগুলো দেখি, সেগুলোর সঙ্গে কীরকম নিজের দুস্তর ফারাক মনে হয়। যেসব কথা এখন ভয়ানক ভাবা দরকার, বলা দরকার পৃথিবীতে, এসব যেন কখনোই নাটকে আসে না।....'(বহুরূপী ৪৬, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) এই সময় যোগাযোগ হল ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে। তারপর স্থাপিত হল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। কিন্তু কোথায় যোগ দিলেন তিনি আদতে? এই ধারার কোনও একটি সংগঠন মানে ত শুধুমাত্র কিছু মানুষ নয়, তা হল একটি লক্ষ্য—উদ্দেশ্য বা আদর্শ—একটি স্বপ্ন। কী ছিল গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্দেশ্য? ১৯৪৩-এর জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রথম বুলেটিনে তাঁদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল: 'আজ দেশবাসীর সামনে এক মহাসংকট। সীমান্তে ফ্যাসিস্ত বাহিনী আমাদের এক দীর্ঘমেয়াদী পরাধীনতায় নিমজ্জিত করার এবং এই দেশকে দখল করার ষড়যন্ত্রে ও সংগ্রামে লিপ্ত। দেশের অভ্যন্তরে জনগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত এক বিদেশী শাসনব্যবস্থা স্বীয় প্রভুত্ব কায়েম রাখার ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে জনগণকে সংগঠিত করার সমস্ত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য নির্মম নিপীড়নে মত্ত। ইতিমধ্যে দেশের খাদ্য-পরিস্থিতি উত্তরোত্তর সংকটজনক হয়ে উঠছে এবং গোটা জাতির অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে চলেছে অতিদ্রুত। এই পরিস্থিতিতে, নাট্য-গীত ও নৃত্য চর্চার মধ্যে প্রগতিবাদের যে-প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন ও তাকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের স্থাপনা। এই আন্দোলন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া নয়, বরং এর শেকড় প্রোথিত হয়ে আছে জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনাবিকাশের গভীরে। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্যকে অস্বীকার ত দূরের কথা, বরং এই আন্দোলন একে জনজীবনের সাম্প্রতিক তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে এবং তার পুনর্ব্যাখ্যা ও আত্মীকরণের মাধ্যমে সেই উত্তরাধিকারেরই হৃতগৌরব পুনর্প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।' (মার্ক্সিস্ট কালচারাল ভ্লুভমেন্ট ইন ইনডিয়া, ১ম খণ্ড) অর্থাৎ, আমাদের নাট্যচর্চা প্রমোদ-পণ্য বিকোবার কথা ভুলে ঐতিহাসিক-বাস্তব এবং দেশীয় শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বিত হবে এমন একটা সম্ভাবনা এই প্রথম দেখা গেল। শম্ভু মিত্র মহাশয় যুক্ত হয়েছিলেন সেই সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তোলার প্রয়াসের সঙ্গে।

একসময় যে বাস্তব-সংকটকে মনে করা হয়েছিল চূড়ান্ত—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—তা ধীরে ধীরে নতুন কোন ঐতিহাসিক-বাস্তবের অভ্যুদয়ে হারিয়ে ফেলে তার অর্থ—যাবতীয় গুরুত্ব ইতিহাসে এমন নজির কিছু বিরল নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে যে সংকটকে মনে হয়েছিল গোটা মানব-সভ্যতারই সংকট যুদ্ধের পরিণতি সেই সংকটের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে একটা দুর্বিপাক এড়াল। যুদ্ধোত্তর কালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক স্তরে এর পরে ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে থাকবে অন্য সমস্যা।

এদেশে, তখন স্বাধীনতাকে প্রায় দোরগোড়ায় দেখতে পাবার উত্তেজনায় আমরা যে-কোনো মূল্যে স্বাধীন হবার জন্য ব্যগ্র। অবশেষে, অঙ্গচ্ছেদ ঘটল—স্বাধীনতা এল। সৃষ্টি হল আর এক নতুন ঐতিহাসিক বাস্তব। সৃষ্টি হল এক স্বাধীন দেশ—এক স্বাধীন জাতি। কিন্তু, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তখন এই বাস্তবের সঠিক বিশ্লেষণ করার মত অবস্থায় ছিল না, ভেতরে ভেতরে ভাঙন ধরেছিল আগেই। গান্ধী-হত্যার এক সপ্তাহ পরে এক মিটিং-এ সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে পথে বেরিয়ে এসেছিলেন মিত্র মহাশয়। তার পরের ইতিহাস—বহুরূপীর জন্মবৃত্তান্ত আজ আর সম্ভবত কারোরই অজানা নয়।

সেই শুরুর দিনেই 'বহুরূপী'-র অঙ্গীকার ছিল: 'আমরা ভালো নাটক অভিনয় করতে চাই, যে নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবনগঠনের প্রয়াস আছে।' সমাজ ও মানবজীবনের প্রতি দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। 'বহুরূপী'র প্রথম সম্পাদক শ্রী অশোক মজুমদার জানিয়েছেন, '...বিশেষ করে উনি (মিত্র মহাশয়) আমাদের বোঝাতেন, নাটক করার প্রয়োজনীয়তা কী; কেন আমরা নাটক করছি।...এটা একটা মিশন। এই যে নাটক আমরা করতে যাচ্ছি, এর মধ্য দিয়েই, মানে নাটমঞ্চের থেকেই আমরা একটা দেশের কাজ করতে যাচ্ছি। দেশের জনসাধারণকে জাগাতে চাইছি, তাদের অবস্থাকে বোঝাতে চাইছি। এই স্বাধীনতার পর, জনসাধারণের কী কর্তব্য, কীভাবে তাদের চলতে হবে, কীরকমভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা আসবে, এসব সম্পর্কে বোঝাতে গেলে নাটক একটা মস্ত বড় হাতিয়ার।' (বহুরূপী: ১৯৪৮-১৯৮৮)

প্রতাপচন্দ্র চন্দ তাঁর পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, '....শিশির ভাদুড়ী নাট্যকলায় বিপ্লব আনলেন না, আনলেন বিবর্তন। তিনি পুরাতনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন না, দিলেন নতুন মোড়।' শিশির কুমার ভাদুড়ী নাট্যের বহিরঙ্গে বদল ঘটিয়েছিলেন —প্রায়োগিক বদল। কিন্তু, নাটকের বিষয় নির্বাচনে এবং চর্চার ধরণধারণে থেকে গিয়েছিলো মূলত পুরাতন-পন্থী। সমসাময়িক কালকে বুঝে নেবার দায় তেমন করে অনুভব করেন নি তিনি। শিশির কুমারের নাট্যচর্চা তাই হয়ে পড়েছিল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ক্রমে জীবনবিমুখ। শম্ভু মিত্র মহাশয় আমাদের নাট্যচর্চার ভেতর-বাইরে লাগালেন প্রবল টান, ঘটালেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন—শুধুমাত্র প্রয়োজনাতেই নয়। অশোক মজুমদার বলেছেন যে তিনি বলতেন 'এটা একটা মিশন,—একটা সদ্‌ব্রত। সেই ব্রত পালন করবে যারা তাদের চিন্তা, ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ গড়ে-তোলা থেকে কাজটার শুরু, তারপর প্রযোজনার বিষয় নির্বাচন আঙ্গিক নির্ধারণ। আবার সেখানেই শেষ নয়, তারপর দর্শক গড়ে-তোলার দায়িত্ব। সমাজে সমমনস্কসমভাব সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে ভাবনার আদানপ্রদানের একটা সুস্থ-সতেজ ক্ষেত্র গড়ে তোলা। এই এতখানি এবং সেইসঙ্গে আরও অনেকখানি কাজ শুরু করে দিলেন তিনি। গণনাট্য সঙ্ঘের মত একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের যা করা উচিত ছিল—করা সম্ভব ছিল, অথচ যা তারা করতে পারল না তার সমস্তটাই প্রায় শুরু হয়ে গেল তাঁর উদ্যমে। শ্রী মজুমদারই জানিয়েছেন, 'শম্ভুদা আমাদের যেভাবে বলতেন—যেভাবে কাজ করতে হবে—সেই সেট লাইট থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া, নাটকের ব্যবস্থা, নাটক পরিচালনা। কে কী করবে না-করবে, কার কোন কাজ কার দ্বারা হবে না-হবে, সমস্তই শম্ভুদা দেখতেন।...একজন মানুষ যে এতরকম বিষয় জানেন এবং এতরকম বিষয় বলতে পারেন, এটা দেখে আমরা খুবই স্তম্ভিত হয়ে যেতাম।' (ঐ)

'...আমরা তো একটা নতুন ধরনের নাট্যশিল্প গড়তে চাই যেখানে বড়োছোট সবাই মিলে মিশে একটা যৌথ জিনিস প্রকাশ করবে।' (সন্মার্গ সপর্যা) আর তা করার জন্যই '....নতুন অভিনয়েচ্ছুদের মনের মধ্যেকার শিল্পীসত্তাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হয়। লালন করতে চেষ্টা করতে হয়। যতোটা সম্ভব। এবং একটা শিল্পীর উন্নতির জন্যে...যতোটা সম্ভব স্বাধীনতা ও সুযোগ দেবার চেষ্টা করতে হয়। এই সমস্ত করতে করতেই চেষ্টা করতে হয় যাতে সে-শিল্পীর উদ্ভিন্ন ক্ষমতা উৎকেন্দ্রিক না হয়। যেন স্বাধীনতার সঙ্গে অনুশাসনের একটা সুষ্ঠদ সম্পর্ক থাকে। একটা ভারসাম্য।—অথচ বাইরে কিন্তু সমস্ত সময়টা ধরে তান্ত্রিকদের মারণ-যজ্ঞ চলতে থাকে—সব মূল্যমানকে ভাঙবার জন্যে, পুরো সমাজটাকে উৎকেন্দ্রিক ক'রে দেবার জন্যে।' (সন্মার্গ সপর্যা) অর্থাৎ, এই 'মিশন' যারা কাঁধে তুলে নেবে তাদের 'হয়ে-ওঠা'কে নিশ্চিত করার জন্য সমাজের মধ্যেই আরেকটি সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। 'দলছাড়া নাটক হয় না, এই এর প্রচণ্ড সুবিধে এবং মুশকিল। সুবিধে এই জন্যে যে, ঠিক মতো দল গড়তে পারলে আমরা তার মধ্যে collectively এবং co-operatively বাঁচতে শিখবো। This is the art of the new life, the life yet to come। আর তা যদি

না পারি, তাহ'লে যা মুস্কিল এবং যা নোংরামি সে তো তোমরা সকলেই ভালো করে জানো। ...আমরা ভয়ানক fortunate যে we have such wonderful young people around us...এতগুলো incomparable human material নিয়ে আমরা কিছু করতে পারব না? I defy.' (বহুরূপী ৩৮, মে ১৯৭২) তিনি তখন কাজটা যারা করবে তাদের সতর্ক করছেন, অনুপ্রাণিত করছেন এবং নিজে defy করছেন—সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসম্ভবকে সম্ভব করবেন বলে। কিন্তু, আদতে কোন্ কাজ করতে চাইছিলেন তিনি যার জন্য এতকিছু? 'স্বাধীন ভারতবর্ষ'—নামক এক নতুন ঐতিহাসিক-বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছিলেন তিনি সেদিন নাট্যচর্চাকে, আর সেই সঙ্গে বুঝি চাইছিলেন এই কাজটার মধ্য দিয়েই জাতিকে তার পরিচয়-সংক্রান্ত প্রশ্নটির মুখোমুখি করিয়ে দিতে।

-ভাই সব, এই যে চম্পকনগরী, এরে যারা আদ্যিকালে সৃষ্টি করেছিল, —আমাদের সেই বাপপিতেমহদের দল, —তারা কি কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়া এদেশের মর্যাদা গড়েছে? ...ভাইরে, আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপপিতেমহদের বংশের সন্তান? নাকি আমরা সবাই সব বেজন্মা? ক্ষেত্রজ? প্রাণ দিয়া তারা নিজ-নিজ প্রাণটারে সওদা করেছে—...এ চম্পকনগরীর মত নিডরিয়া সদাগর ভাই—, সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য।'

শ্রী দেবেশ রায় তাঁর পূর্বোক্ত লেখায় যা বলেছেন আমরা তার সঙ্গে একমত, ''শম্ভুবাবুর আগে মঞ্চে থিয়েটারের বাংলা বাচন কী হবে তা স্থিরই হয়নি। শিশির ভাদুড়ী সত্ত্বেও হয়নি। গণনাট্য সঙ্ঘ সত্ত্বেও হয় নি।...শম্ভুবাবুই প্রথম নির্দেশক ও অভিনেতা যিনি বাংলা ভাষার কথ্যরূপকে মঞ্চে এনে ফেলতে পারলেন। 'নবান্ন', 'ছেঁড়াতার' 'উলুখাগড়া'র লোকায়ত, এই এক দিগ্বিজয়ী প্রতিভার খেলায় 'শশচক্র', 'পুতুল খেলা', রক্তকরবী', 'রাজা' ও 'রাজা অয়দিপৌস'হয়ে যেতে পারে।''

আর, এটা সম্ভব হয়েছিল নাট্যের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ভাবনাচিন্তার অনন্যতার জন্যই। একটা জাতির নাট্যকে তো জাতির দৈনন্দিন সহজ সরল সাধ আহ্লাদ খুনসুটি অভিমান থেকে শুরু করে জীবনের গভীরতম আবেগ মহত্তম সত্যকে প্রকাশ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতেই হবে। অভিনেতাকে তো আয়ত্ত করতেই হবে সেই ভাষা যা ওই সবটাই সকলের বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহ্য করে প্রকাশ করতে পারে। 'আমি যে বলতুম—আমরা একটা শহরের আর তার পরে একটা গ্রামের জীবন নিয়ে নাটক করব। সে কথাটাও বোধ হয়—এত ত বুদ্ধিমান লোক ছিল—কখনও বোঝে নি। এমন একটা ভাষা ত আমাদের দখলে থাকা চাই যেটা সকলেই বুঝতে পারে। ওটা জবাহরলাল বলতে পারতেন। গান্ধীজী পারতেন। খুব সহজ যুক্তি দিয়ে বোঝানোর মত করে গভীর কথা বলতে পারতেন। আমরা ত তখন গোমো ইংলিশ, আর সি এ ডক্যুমেন্টারি দেখতুম। চার্চিলকে দেখতুম। খনি মজুরদের সঙ্গে কথা বলছেন চার্চিল, যে-চার্চিল তাঁর ইংরেজির জন্য বিখ্যাত, থেমে থেমে বলছেন—তারা সব বুঝতে পারত। ভোট দিত্ তাকে।' (আমাদের ডায়ারি, এপিল'৯২) এই সহজ ভাষা আয়ত্ত করার সাধনার পরেই বুঝে নিতে হয়েছে ভাষার বাস্তবাতিরিক্ত প্রকাশভঙ্গি। ''..বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরা, যাঁরা দ্রষ্টা, তাঁরা যখন এই জীবনের কথা বলতে চেয়েছেন, এই জীবনের অন্তরের কথাটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তখন তাঁদের ভাষা যেন কেমন রূপকের ভাষা হ'য়ে গেছে। 'মিথ'-এর ভাষা। সমাজের চেতনার গভীর স্তরে স্তরে যে বোধ আছে, যে কল্পনা আছে, যত গূঢ় অনুভবের উপলব্ধি জড়িয়ে আছে, সেসব যেন একমাত্র 'মিথ'-এর পথেই আমাদের অন্তরের অন্ধকার অজানা তন্ত্রীগুলোকে গিয়ে স্পর্শ করে।'' (সন্মার্গ সপর্যা)

সমাজে স্থাণুত্ব আর পরিবর্তনশীলতা দুইই সক্রিয়। নানা বিপরীতের টান তার ওপর। আবহমানতার ধারা আর আধুনিকতার ঝোঁক দুইই থাকে সমাজে। ফলে, ভূমিকাগুলির বদল ঘটতে থাকে কোথাও অতিদ্রুত, কোথাও প্রয়োজনের চেয়ে অনেক ঢিমেতালে চলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। সম্পর্কগুলির কেমন নোঙর তোলা হাল-ভাঙা অবস্থা হয়। অর্থাৎ বাস্তবটা বদলে বদলে যেতে থাকে নিয়ত। নাটক-নির্বাচন থেকে শুরু করে নাট্য-প্রযোজনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় এই বাস্তবকে অন্দর-বাহিরমহল মিলিয়ে ধরবেন বলেই সমাজটাকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন নানা দিক থেকে—দেখাতে চেয়েছেন সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, নারীর সঙ্গে পুরুষের, নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্কগুলিকে। 'কে আমি?' আর 'জীবনের অর্থ কী?' এই দুটি প্রশ্নই যেন বারবার নানারূপে নানামাত্রায় তুলে ফেলে ক্রমে তিনি এগোচ্ছিলেন সেই দুটি অন্ধকারের নাটক প্রযোজনার দিকে,

যার পরে—একদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন আমাদের—আর কোনও কাজ করবেন না বলে ভেবেছিলেন তিনি। 'আলোর মত অন্ধকার আর অন্ধকারের মত আলো'-র নাটক 'রাজা অয়দিপাউস' ও 'রাজা'। একদিকে, বাইরের আলোর মোহ আর বিভ্রান্তি ঘুচে যাবার পর অন্ধকারে পৌঁছে সম্পূর্ণ হল চেনা-জানা, সম্ভব হল 'বাস্তবের লীলার সঙ্গে নিজের বাঁচাকে মিলিয়ে নেয়া'। অন্যদিকে, বাইরের আলো যখন মুছে গিয়ে ঘনিয়ে এল প্রগাঢ় অন্ধকার তখনই অন্তরের আলোর উদ্ভাসে সব অন্ধকার মিলিয়ে যাবার পরম লগ্ন উপস্থিত হল। দু'টি নাটকেই আছে বাইরের দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্তরের দিকে দৃষ্টিকে মেলে দেবার কথা। নিজের সঙ্গে নিজেরই মুখোমুখি হবার কথা। 'কে আমি?' প্রশ্নের সম্মুখীন হবার কথা। আর, এই দুটি প্রযোজনার প্রস্তুতির সময় তাঁর মনে হয়েছিল উজ্জ্বল আলোকিত এক বর্তমান থেকে—সত্যের সন্ধানে শিবের সন্ধানে—ঘন অন্ধকারময় এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দেয়ার বিষয় নিয়ে নাটক লেখার কথা।

'সম্মার্গ সপর্যা'র ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, ''সমাজের মানস-কেন্দ্র খোঁজবার মধ্য দিয়ে, ভারতীয় নাট্যকলার ভিত্তি বোঝবার মধ্য দিয়ে, আরো একটা গূঢ়তর অন্বেষণ তো নিরন্তর ছিলই। ...অন্বেষণটা কেবলমাত্র ভারতীয় নাট্যরূপের একটা আঙ্গিকগত কৌশল খুঁজে পাবার জন্য নয়। কিংবা সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের অন্ধ অহঙ্কার বশে নয়। ওটা হোল মূল উদ্দেশ্যটায় পৌঁছুবার একটা উপযুক্ততম পথ খোঁজা। যদি ভুলপথ ধরা হয় তাহলে নৈবেদ্য আর শেষ পর্যন্ত 'রাজার' কাছে পৌঁছয় না, ভুলপথের 'সুবর্ণ'-দেরই হাতে গিয়ে পড়ে।''

তাঁর সমগ্র নাট্যকর্ম ব্যাপী সেই 'গূঢ়তর অন্বেষণ' আদতে তাই এক 'আত্মোপলব্ধির তীর্থযাত্রা'—ভারতবর্ষের অপরিবর্তিত সত্তা ও ভারতীয় নাট্যের স্বরূপ সন্ধানের জন্য এই পাড়ি। আগামী প্রজন্মের মুখ চেয়ে শিবের সন্ধানে তাঁর পাড়ি।

-আমি নৌকা গড়ো দিব, পাল বেঁধ্যে দিব, যা কিছু আমার আছে সমস্ত উৎসর্গ কর‍্যা দেউল্যা হয়্যা যাব, যাতে ভবিষ্যৎ একদিন রঙেতে রঙীন হয়, যাতে চম্পকনগরী সুস্থ, মুক্ত, অনর্গল হয়্যা যেতে পারে। সেদিন আমারে যদি ভুলে যায় লোকে,—যাক ভুল্যে যাক। নতুন যে বীর হবি তারি পথে জয়ধ্বনি দিয়্যা আনন্দে উন্মত্ত হোক চম্পকনগরী। আমি কিছু চাইনেক। শুধু হোক। শুধু সেই ভবিষ্যৎ সত্য হোক।

তিনি আমাদের নৌকা গড়ে দিয়েছেন—পাল বেঁধে দিয়েছেন—নিজের সমস্তখানি উজাড় করে দিয়েছেন, এবারে 'হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ! কত বাঁও জল দেখ। তল নাই? পাড়ি দেও—' বলে যাত্রা শুরু করার দায় আমাদের।

বিনুর অপসরণ

অন্নদাশঙ্কর রায়

স্বাধীনতা দিবসটি নিছক আনন্দের দিন ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী সেদিন কলকাতায় অনশনরত। তাঁর ধারণা তাঁর জীবনের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু মুসলমান এক হয়নি, হিংসায় উন্মত্ত দেশ। ইংরেজরা চলে গেছে, এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু তারা চলে গেছে বলেই কি দেশের হিন্দুপ্রধান অংশ থেকে মুসলমানরাও চলে যাবে, মুসলিমপ্রধান অংশ থেকে হিন্দু ও শিখরাও চলে আসবে?

একক ভাবে একটা দল সারা দেশকে স্বাধীন করতে পারে। কিন্তু একক ভাবে একটা দল সারা দেশকে শাসন করতে পারে না, যদি না অন্যান্য দলদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। কংগ্রেসের তেমন কোনো অভিপ্রায় ছিল না। যুদ্ধে নামলে সে দেখত ভারতীয় সেনা দ্বিধাবিভক্ত ও পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত। অনশনে দেহত্যাগ করেও মহাত্মা তাদের নিবৃত্ত করতে পারতেন না। একই কালে দাঙ্গা হাঙ্গামাও লেগে থাকত।

একক ভাবে রাজ্য চালানো যায় না, অপরকে ক্ষমতার ভাগ দিতে হয়। তা যদি কার্যকর না হয় তবে রাজ্যের ভাগ দিতে হয়। আর কোনো বিকল্প যদি থাকে সেটা ইংরেজকেই হাত জোড় করে বলা, তোমরাই থেকে যাও অনির্দিষ্টকাল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পর নিজেরাই বিনা শর্তে একতরফা অপসরণে উন্মুখ। কারো কোনো আর্জি শুনবে না। বিনু ব্রিটিশ সরকারের ভিতরে ছিল। শাসকদের মনোভাব জানত। বাংলার লাটসাহেব তাকে বলেছিলেন, ''হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় তবে লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব। আমরা যাচ্ছি।'' রিং মানে বকসিং-এর রিং।

ভিতরে থেকে মুসলিম অফিসারদের মনোভাবও তার অজানা ছিল না। ''আমরা পাকিস্তান চাইনে'' যিনি বলেছিলেন তিনিই বলেন, ''আমরা এখন পাকিস্তান চাই।'' মাস তিনেকের মধ্যে মত পরিবর্তনের অর্থ ইংরেজরাজের শূন্যতা কংগ্রেসরাজ যদি পূরণ করে তো মুসলিম অফিসারদের শ্রেণীর স্বার্থ নিরাপদ নয়। একই উক্তির রকমফের হিন্দু অফিসারদের মুখে। ''পার্টিশন না হলে বাংলার হিন্দু বাঁচবে না।''

একদা যাঁদের পূর্বপুরুষরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন ইংরেজ বিদায়ের সময় দেখা গেল তাঁরা দেশান্তরিত হয়ে পাকিস্তানী বনেছেন। তাই তাঁরাও ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়া কুইট করলেন। বিনু আন্তরিক দুঃখিত। সে চেয়েছিল তাঁরা থেকে যান। তেমনি এটাও সে কামনা করেছিল যে হিন্দু অফিসাররাও পাকিস্তানে থেকে যান। বিশেষত যাঁদের শিকড় পূর্ববঙ্গে। ছিন্নমূল হয়ে কে কবে রস সংগ্রহ করতে পেরেছে। অফিসার শ্রেণী তো চলে এলেনই, তাঁদের অনুসরণে কেরানি ও পিয়ন, পুলিশ ও ডাক্তার, উকিল ও মোক্তার, জমিদার ও মহাজন, পাচক, পুরোহিত, গোয়ালা, মুচি, ধোপা, নাপিত, চাষী, মজুর। তবু ভালো যে পাঞ্জাবের মতো হিন্দু মুসলমান পাইকারি হারে মরেনি, মারেনি, শুধুমাত্র পালিয়েছে। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

এরকম যে হতে পারে তা আন্দাজ করে বিনু ময়মনসিং থেকে বদলি হয়ে আসার সময় বিদায় সভায় বলেছিল, ''পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোট নৌকা। তাতে যাত্রীর সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেলে নৌকাডুবি ঘটবে। যেমন ঘটে গেল সেদিন আমাদের চোখের সামনে ব্রহ্মপুত্রের জলে। পূর্ববঙ্গের সওয়া কোটি হিন্দুর জন্যে সেখানে ঠাঁই নেই। তারা সবাই গেলে পশ্চিমবঙ্গ ডুববে।''

সেই নৌকার বাড়তি যাত্রীরা মাঝিদের হুঁশিয়ারি শোনেনি। ফলে নৌকা ডোবে, মানুষও ডোবে, যারা সাঁতার জানে তেমন কয়েকজন বেঁচে যায়। মাঝিরা পালায়।

ভারতও একটি বড় মাপের নৌকা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেবাক হিন্দু ও শিখ তিন সপ্তাহের মধ্যে উধাও। তেমনি বেবাক মুসলমান পূর্ব পাঞ্জাব ছেড়ে গেছে। কিন্তু দিল্লীর মুসলমানরা তাদের ঘরবাড়ি, জায়গাজমি, মসনদ

বেদখল দেখে সরকারের শরণাপন্ন। সরকার হিমশিম খাচ্ছেন। বিনুর বন্ধু এক হিন্দু আই. সি. এস. অফিসার মুসলমানদের বাঁচাতে গিয়ে তাঁর অধীনস্থ হিন্দু সিপাহীর দ্বারা নিহত। এখন ভরসা গান্ধীজীর নৈতিক প্রভাব। তিনি ব্যর্থ হলে সরকারের দেউলেপনা প্রমাণ হবে। সেকুলার স্টেট হবে ভাঁওতা। কাশ্মীরী মুসলমান ভবী ভুলবে না। মহাত্মাকে শেষ পর্যন্ত অনশনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদে গণ্ডগোল বেধেছিল। মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলা সাত দিন পাকিস্তানের সামিল থেকে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে ভারতের সামিল হয়। সেই সাত দিনে সেখানকার মুসলমানরা উৎসব করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে, পরে আকাশ থেকে পড়ে। বিশ্বাসই করতে চায় না যে এটাই তাদের ভাগ্য। হিন্দুরা সাত দিন মনমরা হয়ে কাটিয়েছে। এখন তারাও উৎসব করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। মারামারি থামাতে সেখানকার নেতারা চেয়ে পাঠান একজন আই. সি. এস. অফিসার।

আঠারো বছর চাকরির পর বিনু এই প্রথম কলকাতায় বদলি হয়েছে। চারটে মাস যেতে না যেতেই তার উপর হুকুম, মুর্শিদাবাদ চলো। বিনু প্রতিবাদ করতে পারত। তার ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। ময়মনসিং থেকে এসে কলকাতার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আবার স্থানান্তর! তা সত্ত্বেও বিনু সহজেই রাজি হয়ে যায়। শাসন বিভাগের প্রতি তার বরাবরই পক্ষপাত। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিচার বিভাগে পদস্থ করা হয়েছিল। প্রায় দশ বছর বাদে সে আবার জেলা শাসক হবে। সেই পদটার প্রতি তার একটা টান ছিল। সেই পদের সঙ্গে জড়িত ছিল ক্ষমতা। জজ তো টুঁটো জগন্নাথ। তা ছাড়া মীরার সঙ্গে তার প্রথম দেখা তো বহরমপুরেই। বিয়ের পরে মধুমাস যাপনও সেখানে।

মীরার কিন্তু একেবারেই সায় ছিল না আবার এক বদলিতে। আবার মালপত্র প্যাক করতে হবে। মালপত্রের মধ্যে পড়ে স্টাইনওয়ে বেবি গ্র্যাণ্ড পিআনো। ভারতে দুর্লভ। বিয়ের পর আমেরিকা থেকে আনা।

মুর্শিদাবাদ যাবার আদেশ পেয়ে বিনু ঘোষ মন্ত্রীমহলের সদস্য এক পুরাতন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে, ''পূর্ববঙ্গের হিন্দু শরণার্থীদের সম্বন্ধে আপনাদের পলিসি কী?'' তিনি উত্তর দেন, ''আমরা ওদের উৎসাহ দিতে চাইনে। দিলে সবাই এসে হাজির হবে। আমরা অভিভূত হব।'' কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বে যদি বিন্দুমাত্র স্বত্ব থাকে তবে পাকিস্তানে কেবলমাত্র মুসলিমরাই সিটিজেন হতে পারে, কিন্তু এরা রেসিডেন্ট এলিয়েন, সমান স্বত্ববান নন। তারা তো সিটিজেনশিপের জন্যে ভারতে চলে আসতে চাইবেনই। সাধ করে কেউ এলিয়েন হতে রাজি হয়?

না, হয় না। তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় জিন্না সাহেব বলেছিলেন বাংলাদেশকে দু'ভাগ করা উচিত নয়, যেহেতু বাঙালি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এক জাতীয়তার লক্ষণ বিদ্যমান। মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্ল্যানে একটি ধারা জুড়ে দেন। বাংলার হিন্দু মুসলমান যদি একমত হয় তবে বাংলা দেশ অবিভক্ত থাকবে। তার মানে দাঁড়ায় অবিভক্ত বাংলাদেশ একাই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। জবাহরলাল প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তো আরো অনেক প্রদেশ বা রাজ্য স্বাধীন হতে চাইবে। ভারত হবে বলকান। কংগ্রেস বলকানীকরণ মেনে নেবে না। মাউন্টব্যাটেন সে ধারাটি প্রত্যাহার করেন। বাংলা দেশ দুই ভাগ হল, কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেওয়া হল না। তা হলে তো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রেফারেণ্ডামের আবশ্যক হত না। সীলেট জেলাতেও না। রেফারেণ্ডামের ফল পাকিস্তানের পথে নাও যেতে পারত।

পার্টিশন হল একপ্রকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, যেমন র‍্যামসে ম্যাকডোনালডের রোয়েদাদ। সেটা প্রাদেশিক স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়, এটা কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের বেলা। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতিকে সম্প্রদায় হিসাবেই গণ্য করা হয়, নেশন হিসাবে নয়। জিন্নাসাহেব পাকিস্তানের পতাকার এক-তৃতীয়াংশ সফেদ রাখেন। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ। তাৎপর্য, পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখরাও সমান অধিকারী। তাদের সংখ্যানুপাতও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানে যে যার ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিকই পাকিস্তানী। সেকুলার স্টেট বলে পাকিস্তানকে চিহ্নিত না করলেও তাঁর বিবৃতির মর্ম পাকিস্তান হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তিনি ভালো করেই জানতেন যে পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখ এলিয়েন হলে ভারতেও মুসলমানরা হবে এলিয়েন। তার মানে চার কোটি মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে হাজির হবে। তারা যদি ভারতে থাকে তবে সেটা হবে কংগ্রেসের সেকুলার পলিসির গুণে।

বিনু মুর্শিদাবাদের শাসনভার নেবার আগেই ঘোষ মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরিবর্তে রায় মন্ত্রী-মণ্ডলী অধিষ্ঠিত হয়। এটাও তো কংগ্রেস পার্টির মন্ত্রী-মণ্ডলী। বিনু ধরে নেয় এঁরাও শরণার্থীদের উৎসাহ দিতে অনিচ্ছুক। মুর্শিদাবাদে তখনো লহু করার মতো শরণার্থী সমাগম হয়নি। সেখানকার গণ্ডগোলটা অন্য কারণে। মুর্শিদাবাদ মুসলিম প্রধান জেলা। তাই মাউন্টব্যাটেন তাকে পাকিস্তানের সামিল

করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। মুসলমানরা আনন্দ উৎসব করে। তাদের আনুগত্য পাকিস্তানের প্রতি। কিন্তু দিন সাতেক পরে দেখা গেল মুর্শিদাবাদ পড়েছে ভারতের ভাগে। তার ভিতর দিয়ে যেহেতু গঙ্গা ভাগীরথী প্রবহমান সেহেতু তাকে ভারতের ভিতরে রাখাই সমীচীন। তার বিনিময়ে পাকিস্তানকে দেওয়া হয় খুলনা জেলা। সেটা হিন্দুপ্রধান। এই দুটি জেলার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক গণনাকে অগ্রাহ্য করেন সার সীরিল র‍্যাডক্লিফ। এতে মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা স্তম্ভিত। সাতদিন পরে পতাকা পরিবর্তন, আনুগত্য পরিবর্তন, ভাগ্য পরিবর্তন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠের অধম! এ কী রকম অন্যায়!

ওদিকে হিন্দুরাও সেই সাতদিন মুসলমান প্রতিবেশীদের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে জমিদারের ভবন আক্রমণ করেছে। পুলিস নিষ্ক্রিয়। জমিদার সপরিবার কলকাতা পলাতক। বলা বাহুল্য প্রজারা মুসলমান। জমিদার হিন্দু। দৃশ্যত হিন্দু মুসলমানের বিবাদ। প্রকৃতপক্ষে জমিদার ও প্রজার বিবাদ। ইংরেজদের অভাবে জমিদাররা নির্বান্ধব। তবে পূর্ববঙ্গের লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়রাও জমিদার। জমিদারি প্রথার বিলোপ যদিও তাঁদের দলের পলিসি তবু অর্থনৈতিক ওলটপালট তাঁদেরও এই মুহূর্তে অভিপ্রেত নয়। মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা তটস্থ থাকে। কিন্তু ভারতের সামিল হয়ে তারাও উষ্ণ মূর্তি ধারণ করে।

বিনু বুঝতে পারে মুর্শিদাবাদের সমস্যাটা আসলে আইন ও শৃঙ্খলার নয়। আইন আছে, পুলিস আছে, আদালত আছে, জেল আছে। এসবের সাহায্যে দুষ্কৃতীদের দমন করা কঠিন নয়, সময়সাপেক্ষও নয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। কিন্তু বিবাদের বীজ যদি থেকে যায় গণ্ডগোল আবার বাধবে। যেটা গোড়ায় আবশ্যকসেটা মুসলমানদের আনুগত্য অর্জন। দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুসারে তাদের তো পাকিস্তানে পা চালিয়ে দেবার কথা। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব দুই রাষ্ট্রই বাতিল করেছে। মুসলমানমাত্রেই পাকিস্তানী নাগরিক নয়, হিন্দুমাত্রেই ভারতীয় নাগরিক নয়। গান্ধীজীর পলিসি, যে যেখানে আছে সে সেইখানেই থাকবে, জোর করে কাউকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না। যার ইচ্ছা সে বিনিময় করতে পারে। সেটা কিন্তু সম্পত্তি বিনিময়। লোক বিনিময় নয়। মুসলিমবর্জিত মুর্শিদাবাদ বা হিন্দুশূন্য রাজশাহী কল্পনা করা যায় না। তাতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ চিরকালের মতো দূর হবে, কিন্তু ইতিহাসের ধারাভঙ্গ ঘটবে। সে ধারা গঙ্গা যমুনার মিশ্র ধারা। তাকে অবিমিশ্র করতে গেলে এপার ওপার দুই পারের বাঙালি জাতীয়তা ধ্বংস হবে। দিল্লীকে মুসলিমশূন্য হতে দেবেন না বলে মহাত্মা গান্ধী প্রাণ দেন। বিনু অবশ্য প্রাণ দেবে না, কিন্তু তারও পণ সে গান্ধীনীতি অনুসরণ করবে ও তা করতে গিয়ে যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। দেশ বিভক্ত, প্রদেশ বিভক্ত, তাই বলে লোক বিভক্ত হবে না। বিনু বিশ্বাস করে যে অবিভক্ত ভারতের জনগণ সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও এক ও অবিভাজ্য। সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও অহিংস।

মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীর লোকজন চিরকাল পদ্মানদীর এপার ওপার করে এসেছে। এখন ও দুটো জেলা দুই আলাদা ডোমিনিয়নের প্রত্যন্ত জেলা। কোনো হিন্দু এলে সেটা খবর নয়, কিন্তু কোনো মুসলমান এলেই পুলিস থেকে রিপোর্ট আসে অমুক ব্যক্তি অমুক গ্রামে এসেছে। গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। দুই জেলার মধ্যে মাল চলাচল চিরকাল অবাধ ছিল। এখন ওটার নাম মাল পাচার। ইতিমধ্যে বাজার থেকে কাপড় উধাও। কারণ অবাধে মাল পাচার।

বিনু একদিন তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পদ্মার ধারে রাত কাটায়। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মাল পাচারের কলাকৌশল। ওপারে আলো জ্বলে ওঠে। যেমন রেলের সিগন্যাল। অমনি এপার থেকে নৌকা ছেড়ে দেয়। পাচার যারা করে তারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুই সম্প্রদায়ের লোক। ওটাকে তারা অপকর্ম মনে করে না। চাহিদা আছে, জোগান দিচ্ছে। মুশকিলটা এইখানে যে মুর্শিদাবাদের চাহিদা মিটছে না, কাপড়ের অভাবে মানুষ কী পরবে। কমিশনার তা শুনে বলেন, কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে উল্টো বিপত্তি। ওপারে হিন্দুর মেয়েরা শাড়ি পাবে কোথায়? বিনু বলে না, বলতে পারত, শুধু কি হিন্দুর মেয়েরা?

চালের দামের উপর থেকে সীলিং উঠে যাওয়ায় হঠাৎ দেখা দিল চালের আকাল। ভাগ্যিস্, কিছু চাল মজুত ছিল সরকারি আড়তে। কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করে চালের অভাব কতকটা মেটানো গেল। বিনুকে এইসব নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়। সাহিত্য শিকেয় তোলা থাকে। সামাজিকতারও সময় মেলে না।

একদিন কলকাতার সেক্রেটারিয়াটে ডাক পড়ে। বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত প্রশাসকদের নিয়ে দরবার করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য ওপার থেকে যেসব শরণার্থী আসছে তাদের সমষ্টিগতভাবে বসাতে হবে সীমান্তের এক একটি গ্রামে। একই গ্রামে চাষী, তাঁতী, কামার, কুমোর, কলু, ছুতোর, ধোপা, নাপিত, মুদি ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ তাঁর স্বপ্ন।

"অবাস্তব।" বিনু বলে ওঠে, "সীমান্তে কোথাও এক কাঠা জমি খালি নেই। সর্বত্র ঘন বসতি।"

মুখ্যমন্ত্রী তাকে ধমক দেন। সে বলে, "আমি ছুটি নেব।" তিনি বলেন, "আমি দিলে তো।"

রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদের মাঝখানে গঙ্গা ও পদ্মা নদী। যেখান থেকে ভাগীরথী বেরিয়েছে সেখান পর্যন্ত গঙ্গা, তার পরে পদ্মা। নদীর মুখ্য স্রোত যেটাকে বলা হয় সেটা কখনো রাজশাহীর পাড় দিয়ে বইত, কখনো মুর্শিদাবাদের পাড় দিয়ে। পার্টিশনের পূর্বে এ নিয়ে কেউ কোনো দিন তর্ক করেনি। সম্প্রতি মুখ্যস্রোত বহমান মুর্শিদাবাদের পাড় ঘেঁসে। রাজশাহী থেকে এক লক্ষ এসে সারা দিন টহল দিচ্ছে।

নদীর মাঝখানের তিনটে চর এখন মুখ্যস্রোতের ওপারে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মানচিত্রে চিহ্নিত। লঞ্চের উর্দুভাষী বিহারী কাপ্তেন দাবি করছেন যে মুখ্যস্রোতের আধখানা পার্টিশনসূত্রে পাকিস্তানের, সুতরাং চরগুলো রাজশাহীর সামিল। মুর্শিদাবাদের মুসলমান চাষীরা এতকাল ওইসব চরে ফসল ফলিয়ে এসেছে, এ বছরও ফলিয়েছে। কিন্তু কাপ্তেন তাদের চরে যেতে দিচ্ছেন না, নৌকা আটক করছেন। মগের মুলুক আর কী। লোকগুলি বিনুর কাছে নালিশ করে।

বিনু তার পুলিস সুপারিনটেনডেন্টকে বলে, "কাপ্তেন অনধিকার প্রবেশ করেছেন। গোটা মুখ্যস্রোতটাই মুর্শিদাবাদের। অন্তত আধখানা তো মুর্শিদাবাদের বটেই। সেখান দিয়ে তো লঞ্চ চলাচল বেআইনি। পুলিসকে পাঠান লঞ্চ আটক করতে।"

তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, "ওরে বাপ রে! পাকিস্তানী লঞ্চকে আটক? ওরা গুলি করবে না? পুলিসের একটি সিপাহীও যদি মারা যায় গোটা পুলিস ফোর্স বিদ্‌বিদ্‌-বিদ্রোহ করবে।"

ব্রিটিশ আমলে জেলা শাসকদের গোপন পুস্তিকায় নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন পারতপক্ষে মিলিটারিকে না ডাকেন। ডাকলে পরিস্থিতি মিলিটারি অফিসাররাই নিয়ন্ত্রণ করবে। তাঁদের হুকুম অনুসারে কাজ হবে। জেলা শাসকের পক্ষে সেটা অসম্মানকর। মিলিটারিকে নিতান্তই যদি ডাকতে হয় তবে তার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

বিনু অগত্যা সরকারের অনুমতি নিয়ে মিলিটারিকে ডেকে পাঠায়। এক ব্রিগেডিয়ার এসে তার অতিথি হন। মহারাষ্ট্রীয়। বলেন, "আমি তিন তিনটে যুদ্ধে লড়েছি। আমি এখন সারা দেশের সব চেয়ে নন-ভায়োলেন্ট ম্যান। আমার পরামর্শ শুনুন। এ ব্যাপারে মিলিটারিকে জড়াবেন না।"

এর পর আসেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। শিখ। বলেন, "পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে আমাদের একটিও জওয়ান যদি মারা যায় তা হলে সেটা হবে ভারতের প্রেস্টিজের ইস্যু। তা নিয়ে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। আমার পরামর্শ শুনুন। পশ্চিমবঙ্গের সশস্ত্র পুলিসকে এ ভার দিন।"

ব্যাপারটা যে কতদূর বিপজ্জনক তা উপলব্ধি করে বিনু রাজশাহীর জেলা শাসকের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। তিনি তাকে নিমন্ত্রণ করেন। একদা তারই অধীনস্থ বাঙালি মুসলিম অফিসার। অতিশয় সজ্জন। বিনুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন বিনু এখনো তাঁর উপরওয়ালা। বিনুর পুরানো কেরানি ও পিয়নদের সাদর আপ্যায়নের আতিশয্যে তার প্রাণ যায় আর কী! স্থির হয় দুই শাসক চরে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে বদলি করে এক উর্দুভাষী মুসলিম অফিসারকে জেলা শাসক করা হয়। পাকিস্তানের লাইন হল আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চরগুলো পাকিস্তানের অন্তর্গত। নদীর মুখ্যস্রোত এখন সীমানা নির্দেশ করছে। তার আধখানা পাকিস্তানে।

দুই সরকার একমত হতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনুকে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী পাঠান। তাদের সঙ্গে আসে ভয়ানক সব অস্ত্রশস্ত্র। স্টেনগান, ব্রেনগান। এসব অবশ্য ব্যবহার করার জন্যে নয়। ক্ষমতা জাহির করার জন্যে। সিপাহীরা নদী পার হয়ে চরে যাবে কী করে? লঞ্চের দরকার হয়। অবিভক্ত বঙ্গের লঞ্চগুলো ছিল খুলনায়। একটি বাদে খুলনার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে চলে গেছে। তাই ভারতের নৌবহর থেকে লঞ্চ আনাতে হয়। সেসব লঞ্চ সমুদ্রের জন্যে, নদীর জন্যে নয়। লোহা দিয়ে মোড়া। কণ্টকময়। লস্করেরা এক ধার থেকে মুসলমান। অবিশ্বাসী হলে ওরা লঞ্চগুলো নিয়ে ভাগীরথী থেকে পদ্মায় পড়বে ও সরাসরি রাজশাহী চলে যাবে। ওদের দেশ নোয়াখালি, চাটগাঁয়। ওরা পাকিস্তানী নাগরিক। বিনুকে পরামর্শ দেওয়া হয় দক্ষিণী লস্কর আনাতে। বিনু বলে, "এরা বাঙালি লস্কর, এদের সঙ্গে বনিবনা সহজ। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এরা পেশাদার মানুষ, রাজনীতি বোঝে না। যার নিমক খায় তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।"

সশস্ত্র বাহিনী ও লঞ্চের লস্করদের উপরে কর্তৃত্ব করার জন্যে পাঁচজন প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারকে বিনুর অধীনে অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়। এঁরা সবাই এখন আই. এ. এস। একজন উইং কমাণ্ডার ছিলেন, বাঙালি খ্রীস্টান। একজন ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান। দু'জন মেজর, বাঙালি ব্রাহ্মণ।

একজন ক্যাপটেন, বাঙালি কায়স্থ। উইং কমাণ্ডারকে সদরে রেখে বাকি চারজনকে গঙ্গা পদ্মার তীরে মোতায়েন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে। লঞ্চেরও।

এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় বেতার দিয়ে। পুলিস ওয়াইয়ারলেস। তার জন্যে নিজস্ব একটা কোড বানায় বিনু। যারা জানে তারা ছাড়া আর কেউ ডিকোড করতে পারে না। একদিন রাত দুটোর সময় সে ওয়াইয়ারলেস মেসেজ পায়। "দু'শো রাউণ্ড গুলি চলেছে। জলদি আসুন।" অমনি বিনু রওনা হয়ে যায়। ওয়েপন ক্যারিয়ার সব সময় তৈয়ারি থাকে। যদিও তাতে ওয়েপন থাকে না। বিনু যখন গঙ্গা তীরে পৌঁছয় তখন ভোর হয়ে এসেছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলেন, কেউ মারা যায়নি, সবাই নিরাপদ। রাতের অন্ধকারে শত্রুর পায়ের শব্দ পেয়েছে মনে করে লঞ্চের সিপাহীরা গুলি চালিয়েছে চরের দিকে, দিক ভুল করে সে গুলি ছুটেছে তীরের সিপাহীদের অভিমুখে। এরাও পালটা গুলি চালিয়েছে লঞ্চের সিপাহীদের শত্রু মনে করে। ভাগ্যি সব ক'টা সিপাহীই আনাড়ি। নইলে একটা ম্যাসাকার ঘটে যেত। ভোরের আলোয় আবিষ্কার করা গেল একটি বাছুর মরে পড়ে রয়েছে চরের উপর। কাদের বাছুর, কোথা থেকে এল, কেউ বলতে পারে না। পরে গোয়ালারা এসে হাজির। সঙ্গে এক পাল গোরু। চরে তারা গোরু চরাতে এসেছিল। বাছুরটি কেমন করে দলছুট হয়। তা বলে তাদের বাছুরকে মেরে ফেলবে! এত বড় অন্যায়! তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। সামলাও ঠেলা।

চর অপারেশন উপলক্ষে বিনুকে মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে দেখা করতে হত কমিশনারের সঙ্গে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তিনি বলতেন, "এই যে প্রিন্স অব ডেনমার্ক। এবার কী খবর!" তাঁর টেলিফোন পেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের ঘর থেকে আসেন। বিনুর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। তিনিও একদা সাহিত্যিক ছিলেন। পার্টিশনের পূর্বাহ্নে ময়মনসিং-এ তিনি বিনুর নিমন্ত্রণে নৈশভোজন করেন।

বিনুর সঙ্গে দু'জনেই ভদ্র ব্যবহার করেন। সে যখন যা চাইবে তাঁরা তা মঞ্জুর করবেন। সীমান্তে শরণার্থী বসতির কথা আর উল্লেখ করা হয় না। শরণার্থী যাঁরা মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন তাঁরা সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন। শহরের আশে-পাশেই তাদের বসত। স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের কোনো প্রয়াস ছিল না। কার যে কী জাত, কী পেশা তা প্রকাশ না করায় বিনু তা জানত না। তাঁরা সরকারি সাহায্য চান। সম্ভব হলে চাকরি। কিংবা লাইসেন্স।

একদিন কলকাতা থেকে ডাক পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে বিনু একখানা পত্রিকা কিনে দেখে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমানদের তাড়াতে যাচ্ছেন এটা আদৌ সত্য নয়। যত সব বাজে গুজব। বিনু সরাসরি সেক্রেটারিয়াটে গিয়ে হাজিরা দেয়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। সেখানে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তার মর্ম অমুক তারিখের মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের ওপারে খেদিয়ে দিতে হবে। বিনু তো অবাক। অপর জেলা শাসক সময়টা একটু বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন। কর্তা বাড়িয়ে দেন। তাঁর মুখখানা গম্ভীর। বিনুর মনে হয় তিনি যা বলছেন তা তাঁর নিজের কথা নয়, অন্য কারো কথা। তাঁকে দিয়ে বলানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিনু তাঁর পক্ষপাতী হতে শুরু করেছিল। তিনি আর যাই হোন, কমিউনাল নন। সে মুখ বুজে শুনে যায়। বিনা বাক্যে ঘর থেকে বেরয়। কথা দেয় না যে অমন কাজ করবে। বাইরে গিয়ে তার সহযোগীকে বলে, "রক্তপাত অনিবার্য। লিখিত আদেশ চাই। আপনি ভিতরে গিয়ে লিখিত আদেশ চান।" তিনি ভিতরে গিয়ে লিখিত আদেশ চাইলে স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন, "লিখিত আদেশ মিলবে না। মৌখিক আদেশই যথেষ্ট।"

বিনু ভারত সরকারের সারকুলার পেয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল জেলা শাসকরা দেখবেন যাতে মুসলমানদের উপর জুলুম না হয়। জুলুম হলে জেলা শাসকদের জবাবদিহি করতে হবে। বিনু কার নির্দেশ মানা করবে, কেন্দ্রীয় সরকারের, না প্রাদেশিক সরকারের। সে একজন আই.সি.এস অফিসার। কেন্দ্রের প্রতি তার প্রথম আনুগত্য। সে মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ উপেক্ষা করে। তার বিশ্বাস বিধানচন্দ্র সেকুলারমনস্ক ব্যক্তি। তিনি ওরকম আদেশ দিতেই পারেন না। হয়তো ভুলেই যাবেন।

টলস্টয় ও গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত বিনু কলেজ জীবনে স্টেট ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করত না। কিন্তু কর্ম জীবনে তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে আইনের শাসন না হলে দেশ অরাজক হবে। জেলা শাসক তথা জেলা জজের প্রথম কর্তব্যই হল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা। রক্ষক না হয়ে তাঁরা যদি ভক্ষক হন তবে তো নিরীহ নাগরিকের ধন প্রাণ বিপন্ন। তেমন কাজ বিনুর দ্বারা হতে পারে না। তাকে মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছে গণ্ডগোল থামানোর জন্যে, নতুন করে বাধানোর জন্যে নয়। হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে উৎখাত করতে গেলে স্টেট ভায়োলেন্স ব্যবহার করতে হবেই। সেটা অপব্যবহার। রক্তপাত ঘটলে রাজনীতিকরা বলবেন তাঁরা অমন আদেশ দেননি, লিখিত প্রমাণ কই? বিনুকেই দোষ দেবেন।

অবশেষে বর্ষাকালের প্লাবনের পর চরগুলো জেগে ওঠে।

এক নম্বর চরটা মেজর বি. অনায়াসে দখল করেন। খোশ খবরটা বিনু তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করে কলকাতার কর্তাদের জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিনন্দন জানাতে পদ্মাতীরে আসেন। সঙ্গে কমিশনার। তাঁদের অভ্যর্থনা করে সরকারি টুরিং লঞ্চের উপরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হয়। তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ের রাজনীতিক পরিকর। এঁরাও ভোজনসঙ্গী। অনাহূত অতিথি।

ভোজনের পর মন্ত্রী ও কমিশনার বিশ্রাম করতে যান। বিনু পরিকরদের সঙ্গে আলাপচারি করে। তার কানে আসে পেছনে বসে থাকা একজন আরেকজনকে বলছেন, ''দিল্লী থেকে কলকাতায় টেলিফোন এসেছে। ও তো এখন এ দেশে নেই। যা করবার, এইবেলা করে নাও।''

বিনু ঠাহর করে, জবাহরলাল এখন বিদেশে। তাঁর ফেরার আগে যা করবার তা করে নিতে হবে। অমুখ তারিখটা তাঁর ফেরার তারিখ। মন্ত্রী এসেছেন তার আগেই বিনুকে দিয়ে যা করবার তা করাতে।

মন্ত্রীর ক্যাবিন থেকে অনুরোধ আসে। বিনুকে তিনি নিভৃতে কিছু বলতে চান। সে ক্যাবিনে গিয়ে দেখে কমিশনারও উপস্থিত। তিনজনের গোপন বৈঠক।

প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা। বিনুর সুখ্যাতি। দেশের এই সংকটের ক্ষণে বিনুর মতো করিৎকর্মা অফিসাররাই তো ভরসা। বিশ্বত্তসূত্রে অবগত হওয়া গেছে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন।- ইণ্ডিয়ান আর্মি রাজশাহী অধিকার করলে বিনুকেই করা হবে রাজশাহীর জেলা শাসক।

বিনু মনে মনে হাসে। রাজশাহীর জেলা শাসক সে ছিল এগারো বছর আগে। তার চেয়ে জুনিয়ার অফিসারকে হালে সেক্রেটারি করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলে যান, ''যুদ্ধের আগে সন্দেহভাজন হলে জনগোষ্ঠীকে বহিষ্কার করা আবশ্যক। সীমান্তের মুসলমান গোষ্ঠীকে বিশ্বাস কী? ওরা তলে তলে রাজশাহীর মুসলমানদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। ওরা প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানী। আপনি কি অবিলম্বে ওদের সদলবলে বহিষ্কার করতে পারবেন?''

''আমি বরং ইস্তফা দেব, তবু অমন কাজ করব না।'' বিনু ঘাড় নাড়ে। ''করতে গেলে রক্তপাত হবে।''

''হোক না। হোক না।'' মন্ত্রী বলে ওঠেন।

''রক্তপাত হলে এমন হৈ চৈ পড়ে যাবে যে বাধ্য হয়ে ও পলিসি প্রত্যাহার করতে হবে। ইতিমধ্যে যে অনর্থ ঘটে যাবে তাকে অঘটিত করতে পারা যাবে না।'' বিনু নিবেদন করে।

এর পর ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে। মন্ত্রী বলেন, ''দেখুন, ওপার থেকে হাজার হাজার হিন্দু পালিয়ে আসছে সরকারের পেষণে। এখন ওদের আমরা কোথায় রাখি। আমাদের পলিসি কী হবে আপনিই বলুন।''

''ওদের আর যেখানেই রাখুন সীমান্তে নয়। সীমান্তে এক টুকরো খালি জমি নেই।'' বিনু উত্তর দেয়।

''পলিসি স্থির করতে আপনাকে কে বলছে? পলিসি আমরাই ঠিক করব। এই যদি আমাদের পলিসি হয় যে সীমান্তের মুসলমানদের বহিষ্কার করতে হবে তবে আপনি কি সেই পলিসি ক্যারি আউট করবেন?'' মন্ত্রী জানতে চান।

বিনু ঘাড় নাড়ে। ''আমি দরকার হলে যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু এমনতর কাজ করতে পারিনে।''

কমিশনারও ক্ষুন্ন হন। বলেন, ''হিন্দুদের ওপার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে। ওরা কোথায় যাবে?''

মন্ত্রী যোগ করেন, ''আপনিই বলুন।''

''ওরা যেখানেই জায়গা খালি পাবে সেখানেই যাবে। পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে না হোক বিহারে, ওড়িশায়, মধ্যপ্রদেশে। ওখানকার নেতারাও তো পার্টিশনের জন্যে দায়ী।'' বিনু মনে করিয়ে দেয়।

''কিন্তু ওসব জায়গায় শরণার্থীরা যদি না যায়?'' মন্ত্রী তর্ক করেন।

''তা হলে আমি কী করতে পারি?'' বিনু চুপ করে রইল।

''আচ্ছা, এবার আপনি আসতে পারেন।'' মন্ত্রী তাকে বিদায় দেন। মুখে বিরক্তির ভাব।

সেদিন চায়ের টেবিলে তিনি এলেন না। কমিশনার এলেন। গম্ভীর ও নীরব। বিনু বুঝতে পারল তিনি তার পক্ষে নন। চায়ের পর সে লঞ্চ থেকে নেমে তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাইরে অপেক্ষমান মুসলমানদের বলে, ''আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। আমি থাকতে আপনাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না।'' ওদের মুখে দুর্ভাবনার ছাপ।

হ্যাঁ, মধ্যাহ্ন ভোজনের এলাহি আয়োজন হয়েছিল ওইসব সীমান্তের মুসলমানদেরই চাঁদায়। তুলেছিলেন মহকুমা হাকিম।

রাতে কলকাতার ট্রেনে মন্ত্রী ও কমিশনারকে বিদায়সম্ভাষণ জানায় বিনু। সঙ্গে মহকুমা হাকিম ও উভয়পক্ষের পরিকরগণ। কিন্তু মন্ত্রীর মুখ বেজার। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, ''আশা করি আপনি আরো একটা চর জয় করবেন।''

''যদি বিনা রক্তপাতে সম্ভব হয়।'' বিনু আশা করে।

বিনুর কাছে মুর্শিদাবাদ ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। যেমন নেহরুর কাছে কাশ্মীর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। গান্ধীজীকে একজন ইংরেজ বন্ধু প্রশ্ন করেন, ''হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলিম-প্রধান কাশ্মীর থাকে কোন্ যুক্তিতে?'' মহাত্মা উত্তর দেন, ''হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে যদি মুসলিম-প্রধান মুর্শিদাবাদ থাকতে পারে তবে হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলিম-প্রধান কাশ্মীরও থাকতে পারে। আমাদের এটা সেকুলার স্টেট। এ রাষ্ট্রে যে যার ধর্ম পালন করতে পারে, কিন্তু নাগরিক হিসাবে কেউ হিন্দু বা কেউ মুসলিম নয়, সকলেই ভারতীয়।''

তাই যদি হয় তবে মুসলিম বাছাই করে সীমান্ত উজাড় করা কেন? আসল কারণটা কি সেখানে বেছে বেছে হিন্দু বসানো? তার মানে লোকবিনিময়। লোকবিনিময় ভারত ও পাকিস্তান ব্যাপী হলে একটা হবে অবিমিশ্র হিন্দু নেশন, অন্যটা অবিমিশ্র মুসলিম নেশন। পার্টিশন যদি ইভিল হয়ে থাকে, এটা গ্রেটার ইভিল। মহাত্মা সেটা হতে দেননি, তাই নিহত হয়েছেন। সেই মর্মান্তিক ট্রাজেডির পরও যাঁরা সেই খেলা খেলছেন বিনু তাঁদের নির্দেশে সেই খেলা খেলবে না। শান্তির জন্যে সে প্রস্তুত।

দিন দুই পরে স্থানীয় বিধায়ক বিনুকে খবর দেন। তিনি শুনেছেন খোদ ঘোড়ার মুখে, ''আপনার জায়গায় আরেকজন আই. সি. এস. আসছেন।'' বিনু এইরকমই প্রত্যাশা করছিল। তবে এমন তড়িঘড়ি নয়। হয়তো অমুক তারিখের মধ্যে কার্যোদ্ধার করার তাগিদ ছিল। কিন্তু সে যেদিন চার্জ দেবে তার একদিন কি দু'দিন আগে সেই গোপন আদেশটি প্রত্যাহৃত হয়। ততদিনে নেহরু দেশে ফিরে এসেছিলেন। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়?

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে বিনুকে বিদায় দিতে একজনকেও দেখা গেল না। কিন্তু বেলডাঙা স্টেশনে কে এক অজানা অচেনা প্রৌঢ় মুসলমান এসে তার কামরায় এক হাঁড়ি রসগোল্লা রেখে যান। বিনু প্রশ্ন করার আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। তখন সপরিবারে মিষ্টিমুখ। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কলকাতায় হোমরা চোমরাদের হাঁড়িমুখ। কেউ কথা বলেন না। সে যেন কী একটা গুরুতর অপরাধ করে এসেছে। যিনি ভিতরের খবর জানতেন তেমন এক বন্ধু তাকে বলেন, মন্ত্রী মহোদয়ের মুখে মুর্শিদাবাদের কাহিনী শুনে গোটা ক্যাবিনেট মিটিং একবাক্যে গর্জে ওঠে, ''এক্ষুণি তাড়ান।''

বিনুর অপসারণে দুঃখিত হন তার পুরাতন বন্ধু এক প্রাক্তন মন্ত্রী। বলেন, ''দিল্লী থেকে যিনি টেলিফোন করেছিলেন তাঁর পলিসি হচ্ছে তাঁর ভাষায় ভীতসে প্রীত হোতা হ্যায়। ভীতি থেকে প্রীতি উৎপন্ন হয়। ভীত করেই তিনি পাকিস্তানকে প্রীত করবেন। ভীতি দেখিয়েই তিনি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কেও প্রীত করবেন। ওপার থেকে যদি শরণার্থীরা আসে এপার থেকে মুসলিম শরণার্থীরা যাবে। টু ওয়ে ট্রাফিক। রক্তপাত হলে মুসলমানেরই দোষে হবে।''

বিনু ব্যথিত হয়ে বলে, ''প্রাচীন গ্রীকদের মতে দেবতারা যাদের বিনাশ করতে চান তাদের পাগল করে দেন। এসব পলিসি পাগলের মতো পলিসি। এসব কাজ পাগলের মতো কাজ। বাধা না দিলে বাঙালি জাতিটাই উচ্ছন্ন যাবে। গান্ধী নেই, এখন নেহরু ভরসা।''

অল্পদিনের অসুখে কিরণশঙ্কর রায় মারা যান। বিনু তাঁর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেয়। তাঁর পুত্রকে সমবেদনা জানায়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক সম্পর্ক নয়। তাতে চিড় ধরে না।

চীফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন বিনুকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উচ্চতর পদের জন্যে সুপারিশ করেন। জবাহরলালকেও বলেন বিনুর উপর অবিচার হয়েছে। সে কিন্তু ইতিমধ্যে মনঃস্থির করেছিল যে, আর নয়। সব রকম অভিজ্ঞতাই হয়েছে। মায় অর্ধসামরিক অপারেশন। আজে বাজে মামলার বিচার করা আয়ুর অপচয়। সাহিত্যের সাধনা অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে। সেটা বহুদিন অবহেলিত রয়েছে। সে বলে, সে আর চাকরি করবে না। জবাহরলালকে বলা নিরর্থক। সময় অর্থের চেয়ে মূল্যবান। সে চায় সাহিত্যের জন্যে সময়।

একদিন তার অসুখ করে। মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে। কথা বলতে গেলে জিব জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা কথা বলতে আরেকটা কথা বেরিয়ে আসছে। মুখ বেঁকে গেছে। বিনু বুঝতে পারে এটা প্রকৃতির ওয়ার্নিং। মোমবাতি দু'দিক থেকে পোড়ানোর পরিণাম। বড় অফিসার ও বড় সাহিত্যিক এক সঙ্গে দুই হতে চাইলে অকাল মৃত্যু।

সে মীরাকে একটা আধুলি ধরিয়ে দেয়। রাজার মাথা উঠলে পদত্যাগ। নইলে নয়। রাজার মাথা ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র লেখা হয়। বলা হয় তার শরীরের মোমবাতি দু'দিক থেকে পুড়ছে, তাকে সাহিত্যের জন্যে চাকরি ছাড়তে হবে। মীরা বলে, ''তোমার উচ্চতা বাড়বে।''

পদত্যাগপত্র গভর্নর জেনারেল মঞ্জুর করেন। কিন্তু তার পরেও চীফ সেক্রেটারি তাকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে

পাঠান। শান্তিনিকেতনে বাসা মিলছিল না বলে সে আরো কয়েক মাস সময় চায়। মুখ্যমন্ত্রী সে অনুরোধ মঞ্জুর করেন। শান্তিনিকেতনে বাসা মেলে। বিনু যাবার জন্যে তৈরি, এমন সময় নতুন চীফ সেক্রেটারি সত্যেন্দ্রনাথ রায় একমাসের জন্যে জুডিসিয়াল সেক্রেটারি পদে কাজ চালাতে আহ্বান করেন। একমাসের জায়গায় আরো দু'মাস, তার পরে আরো তিনমাস এমনি করে ছ'মাস কাজ করে বিনু অবশেষে নিষ্কৃতি পায়। সেক্রেটারিয়াটের অভিজ্ঞতাটা বাকি ছিল, সেটাও হল। সেই সঙ্গে লীগাল রিমেমব্রান্সার পদে হাইকোর্টের অভিজ্ঞতাও। ততদিনে তার পুরো পেনসন পাওনা হয়েছে। একুশ বছরের চেয়ে কয়েক মাস বেশি কার্যকাল। সাতচল্লিশ বছর বয়স। ইচ্ছা করলে আরো তেরো বছর থাকতে পারত। যদি বাঁচত। অথবা যদি সাহিত্য সেবা থেকে বিরত হত।

সেই বাড়তি ছয় মাসের সব চেয়ে বড়ো লাভ বিধানচন্দ্রের সঙ্গে সদ্‌ভাব। বেলাশেষে তিনি বিনুকে ডেকে পাঠাতেন, দুটো একটা সরকারি বিষয়ে কথার পর আপনা থেকে বলতেন তাঁর জীবনদর্শনের অপ্রাসঙ্গিক কথা। বোধ হয় সাহিত্যিক বিনুকে। ঘরে আর কেউ থাকত না। দু'জনে মুখোমুখি।

তাকে বিদায় সম্বর্ধনা দেন সেক্রেটারিয়াটের বিচারবিভাগীয় কর্মীরা ও স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয়। সব ভালো যার শেষ ভালো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ছাপাখানায় চতুরঙ্গ ছাপার কাজে নানারকম বিঘ্ন ঘটায় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বের কারণে সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অনেকেই সেপ্টেম্বর সংখ্যা এখনও পাননি বলে উদ্বেগ জানিয়ে পত্র দিয়েছেন। এইসব পত্রলেখকদের আমরা যথাসম্ভব ব্যক্তিগতভাবে জবাব দিয়েছি। পত্রিকা ছেপে বের করতে ক্রমাগত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে বলে এবার আমরা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা একত্র প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। এর জন্য পত্রিকার কলেবর কিছুটা বাড়লেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটান হয়নি। এই কারণে নিয়মিত গ্রাহকদের আমরা জানাচ্ছি যে তাঁদের গ্রাহকচাঁদার সময়সীমা প্রতিটি ক্ষেত্রেই আর একমাস বাড়ান হবে। পরিস্থিতির চাপে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হওয়ার কারণে আমরা বেদনা বোধ করছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুধী পাঠকবৃন্দকে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখার কারণে আমরা পুনরায় মার্জনা প্রার্থনা করছি।

বিষামৃত

কবিরুল ইসলাম

ডানদিকে জীবন যদি, মৃত্যু বাম দিকে
একচোখে উজ্জ্বল আলো, অশ্রু অন্য চোখে
বাইরে মুখের হাসি, অন্তরে অনল
দেখা হলে 'কেমন আছেন' ?—
ভাল নেই!

বিপরীত এ-মেরুর বাসিন্দা প্রত্যেকে
কেউ-কেউ দুনৌকায় পা রাখতে পারেন
তাঁরা ব্যতিক্রমী ধর্মে সহজ সক্ষম
পৃথিবীর ভারসাম্যে নন্দিত নমুনা।

মনুষ্যসমাজে তাঁরা স্বাগত দ্ব্যক্ষর
যেহেতু আছেন তাঁরা, তাই আমরা আছি
শিখে নিই জীবন-চর্যার কিছু পাঠ—
এ-ভাবে জীবন-মৃত্যু দ্বান্দ্বিক নিয়মে।

না-হলে কে আর বুঝত বিষামৃত ভেদ
মানুষের পৃথিবীতে কবি ও সন্ন্যাসী।।

আমার ভারতবর্ষে

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

জনৈক ব্রাহ্মণ আর পীরবাবা পাশাপাশি শুয়ে
বর্ধমানের কাছে গুড়গ্রামে কবরের নিচে
ভালবাসা শুধু ভালবাসা মুছে দেয় ধর্মস্বর
ব্রাহ্মণ চাননি চিতা চেয়েছেন একটি কবর।
এই ত জ্যোৎস্নার মধ্যে জেগে উঠে দুজনে এখন
অযোধ্যার প্রশ্ন নিয়ে কৌতুক প্রসন্ন কথা বলে
মাটির চাদর গায়ে আলিঙ্গনে হিম শীতটুকু
উপভোগ করতে করতে ওম খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা।

আমার ভারতবর্ষে চিরকাল প্রিয় মানুষেরা
পাশাপাশি থেকেছেন—ছিল ভালবাসাবাসি ঠিক—
খরা ছিল, বন্যা ছিল—ছিল মেঘ কখনো কখনো—
এবং দুর্ভিক্ষ ছিল—ছিল তবু যৌথপরিবার...

অন্ধকারের সব স্থপতিরা মাঝে মাঝে এসে
ভারসাম্য বদলে দিল বৃত্তময় স্বার্থপরতায়।

ছবিগ্রাম

রঞ্জন ঘোষাল

গত রবিবার আমরা কেউই গির্জেয় যেতে পারি নি
কারণ আমাদের এই উপত্যকাবর্তী গ্রামে
ভূকম্পের কিছু বাড়াবাড়ি
শনিবারের সন্ধ্যে যখন কুমড়ো গড়াগড়ি খেতে খেতে
মধ্যরাত্রির মোমবাতির আঁচে পুড়ি পুড়ি
তখন কাচের জালায় রাখা দুটি
শিঙিমাছ ছলবল করে উঠেছিল
এটি আমাদের খুব ঐতিহ্যগুঢ়িত সিসমোগ্রাফ
আমরা শনিবারের মাল চেখে গিলে তখন
ঈষৎ ঘোলাটে, কিন্তু বাপরে বাপ্, ভয়ে
আমাদের গলা পেট জিভ আরও শুকিয়ে গেল
বুঝলুম এই আসছে ভূমিকম্প
আমরা আপনাপন মদের ভিস্তি কাঁখে
ঘর ছেড়ে বাইরে শীতকাতর আকাশের তলায়
এসে দাঁড়ালুম, বালক যীশুর শরণ নিলুম।
মাতা মেরীর স্তুতি গাইলুম কিন্তু বাপ্
মারে খৃষ্ট রাখে কে গুমগুম করে
পাহাড়ে পাথরে এল দাঁতকপাটি ঢকাঢকাঢকা
শব্দে পেটের মধ্যে গুড়গুড়োচ্ছে ভয় ও
স্থানীয় চোলাই, শিশু ও ছাগল আঁকড়ে ধরছে
আমাদের শীত পেণ্টালুন গাছ ভাঙছে কাঠের
চৌচালা ভাঙছে ভাঙছে শীতের কাচঘর দেয়ালঘড়ি
ও ঘণ্টার শব্দে দূর প্রিয়বনে সেগুন পাইন
আমাদের ভয়ের পাঙাশ দেখে আকাশ
শুধরে নিল মেঘখেলা। দুধভ্রান্ত চাঁদে যেন
গ্রহণ ও যুগপৎ রাহুগ্রাস ফলে বৃষ্টিই বা
বাকি থাকে কেন এবং কাঠের গির্জের
চুড়ো লাফিয়ে নামলে পথে যা দেখে
কঁকিয়ে উঠল আমাদের প্রবীণেরা,
বড়ো যাজক ও ছোটো যাজক হাঁটু গেড়ে বসে
বুকে আঁকতে লাগলেন যোগ চিহ্ন, বিযুক্ত গির্জে
তাতে জোড় খেলো না

আর ঠিক তার দু মিনিট কি তিন মিনিট বাদেই
দেখছি চাঁদ হাসছে ক্যা ক্যা করে শীততীক্ষ্ণ
বাতাস বইছে ঝাঁইঝাঁই শব্দে—সব কিছু যেন
রুমালে মুখ পুঁছে যেমনটি তেমন
খালি একুশটা বাড়ি খাচ্ছে ভুঁয়ে গড়াগড়ি,
ছাগল ভেড়া বাচ্চা ও কিছু রমণীর তখনও ফোঁপানি
থামে নি যেন ভূমিকম্প জীবনে দেখিস নি—
ওই ন্যাকরা ছিচকিনি দেখে ভারী রাগ হয়—
ভিত্তি থেকে শুষে নিই আরও মদ ও কয়েকটি
যা আস্ত পোক্ত বাড়ি তার মধ্যে ঘেঁষাঘেষি করে
আমরা সব রাত্তিরটার মতো ঘুমিয়ে যাই

পরদিন, সেটা গত রবিবার আমরা কেউ
গির্জেয় যেতে পারি নি।

বুড়ো যাজক চাঁদা চাইতে এসেছিলেন গির্জে
গড়বার, আমরা যথাসাধ্য দিলুম
আমাদের আকাশে এখন ঝলমলে রোদ,
ঝকমক করছে পাইন গাছ, রঙীন উপত্যকা,
এবং ধ্বংসে অগোছালো এই ছবিগ্রাম
পর্যটনকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয়
হয়ে উঠেছে
আমরা পরস্পরের চালা বাঁধছি
ঘর সারাচ্ছি। কেটে আনছি নবীনতর কাঠ
আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরছে নাচছে প্রিয়
ছাগলেরা। সন্তানসন্ততি
আমাদের মহিলারা বুনছেন উলের একটা
বিশাল স্কার্ফ এই বিরাট শীত-
উপত্যকাকে ওমে ঢেকে রাখবেন বলে
আর আমরা পৃথিবীর ভিতটাকে আর একটু
শক্ত করে গাঁথবার জন্যে — যাতে ভুঁইকাঁপে
বারবার লড়বড়ে না হয়ে ওঠে এই
তিনকেলে উপত্যকা — ঢুকিয়ে দিচ্ছি
পৃথিবীর এই পশ্চাদ্দেশ থেকে কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত—
দীর্ঘ ও পোক্ত একটি আচাঁছা শালবল্লা।

শব্দের পরিপূর্ণ অভিষেক

খালেদা এদিব চৌধুরী

কখন ছুঁয়ে যায় সর্বশরীর রিক্ত করে একটি কুসুম
যেখানে নীলাভ আকাশ, নীহারিকা
ঘোলাটে স্বপ্নের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়
যেখানে পোড়াগন্ধ ভেসে ওঠে প্রপঞ্চের হাত ধরে
সেই দৃশ্যের বন্ধনে ঘটে যায়
এত কিছু বিবিধ বিষয়।
ইন্দ্রিয়ের রজ্জুতে বেঁধে রাখি প্রাজ্ঞ বিবেচনা
কখন সেই নক্ষত্র হাতছানি দেবে ?
কখন সেই দীর্ঘতম স্বপ্ন ভেঙে যাবে
আর সংক্ষিপ্ত সুতোয় টেনে ধরে
রাখা যাবে নৈশ আয়োজন।
আহা, কখন ছুঁয়ে যায় রূপালি নক্ষত্র
কেউ কি জানে সেই অবগাহনের পরে
কেমন করে জেগে ওঠে শিলার স্তর—
স্বপ্ন ভেঙে যায় — সংক্ষিপ্ত ভালবাসা
বুকে নিয়ে এত কিছু ঘটে যেতে পারে।
সর্বশরীর রিক্ত করে একবার শুধু প্রবঞ্চনায়
হাত ধরে শুরু হবে নতুন প্রক্রিয়া..
সর্বস্ব উজাড় হয়ে যাবে
ফিরিয়ে দেবার কিছুই থাকবে না
মানুষের খুব কাছে সরে আসি
একটু আশ্রয় এবং আতিথ্য গ্রহণ করি—
একটি কুসুম ফোটে প্রতিকূল ভালবাসায়
এবং এইভাবে নীরন্ধ্র শূন্য ঘরে
শব্দের পরিপূর্ণ অভিষেক হয়।

ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে

গৌতম নিয়োগী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশে ঘোষিত দু'টি স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল খুব সহজ এবং সরল : 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) এবং 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (Do or Die)। অথচ ঐ সামান্য ধ্বনির মধ্যে ছিল কী অসামান্য শক্তি, কী প্রবল প্রতাপ, কী সম্মোহনী যাদু এবং ভারতবাসীর মনের ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষার কী সুদূর প্রতিফলন, তা বোঝা গেল যখন দেখতে দেখতে ঐ উচ্চারণ ধ্বনিত হয়ে উঠল এক থেকে শত কণ্ঠে, শত কণ্ঠ থেকে তা রাজনৈতিক স্লোগানে রূপান্তরিত হয়ে উদ্দীপ্ত করল সহস্র কণ্ঠ আর সহস্র কণ্ঠের প্রবল ইচ্ছাশক্তি রূপ পেল লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের উদ্বেলতায় ও অটল সংকল্পে, মনের সাহসিকতা ও বীরত্বে, কর্মের সংগ্রামী চাঞ্চল্য ও তৎপরতায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ের ইতিহাস যাঁদের অধীত তাঁরা সকলেই জানেন, ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রপাত উনিশশো বিয়াল্লিশের অগস্ট মাসে—সেই কারণে এই আন্দোলন 'অগস্ট বিপ্লব'(August Revolution) নামেও সমধিক পরিচিত—সেই অগস্ট বিপ্লব তথা ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি বর্তমান রচনাটির উপলক্ষ। সমসাময়িক নানা দলিল-নথি-আকরের নিরিখে এবং সাম্প্রতিক নানা ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে জনগণের অংশ গ্রহণ, আন্দোলনের নানা স্তর ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, জনতার সক্রিয়তার স্বরূপ (Nature of Mass-participation) অনেকটাই জানা গেছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে জনগণের ভূমিকার প্রকৃতি বিচারই বর্তমান রচনাটির লক্ষ্য।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্যাপ্তিতে, তীব্রতায়, বিশালতায়, বৈচিত্র্যে এবং বিস্ফোরণে তুলনারহিত। পরাধীন জাতির মুক্তির দাবিতে এবং আকাঙ্ক্ষায় এটাই ছিল শেষ এবং তীব্রতম লড়াই ; আগেকার সমস্ত আন্দোলনের চেয়ে, এমনকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহের' (1857) চেয়েও এর ঝাঁঝ অনেক বেশি।[১] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গায়ে এটা ছিল এমন এক মরণ-কামড়, যার ফলে পাঁচ বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকেরা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ইতিহাসকার ফ্রান্সিস হাচিনস্ ঠিকই বলেছেন, "ভারতবাসীরা ব্রিটিশদের ভারতে থাকা অসম্ভব ক'রে তুলেছিল।"[২] বলা বাহুল্য এই তীব্রতা কোনও এক ব্যক্তি বা একক দলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খুব সুন্দর বলেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী :[৩]

> ১৯৪২-এ ক্রিপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার পর সারা দেশে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব প্রায় বিস্ফোরণের পর্যায়ে এসেছিল, ভারত ছাড়ো আন্দোলন তাকে একটা নিষ্কাশনের পথ করে দেয়। এখানে গান্ধী যতটা নেতা, ততটাই জনগণের ইচ্ছার দাম।..পরবর্তী প্রত্যেক নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ আসনে যে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করে তার ভিত্তি রচনা করেছিল শত শত অখ্যাত, অজ্ঞাত দধীচির অস্থি, শত শত লাঞ্ছিত রমণীর অশ্রুজল, সর্বস্ব নাশের শুষ্কে ক্রীত শত শত দরিদ্র কৃষকের অনমনীয় সংগ্রাম। তাদের সবাই মারে নি, অনেকেই করেছে ও মরেছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের নেতা তারাই।

একদিকে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সূচনাকারী গান্ধী, এবং তাঁর সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস। আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাশ করে তারা এগিয়েছেন ; অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন যদি শেষবারের মতো সরকার আলোচনায় ডাকেন, কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সরকার তা করলেনই না, বরং নয়ই অগস্ট ভোরবেলা থেকে শুরু করে দিলেন ব্যাপক ধরপাকড়-গ্রেফতার।[৪] ফলে শুরু হয়ে গেল অগস্ট বিপ্লব। আবার অন্যদিকে আন্দোলনের দ্বিতীয়, বিশেষত শেষ পর্বে

তৃতীয় স্তরে বহু অঞ্চলে, বহু প্রদেশে এমন জনগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যাঁরা আদৌ গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী ও পন্থা থেকে সহস্র হাত দূরে, এমনকি কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গেও অনেকের যোগ ছিল না। দীর্ঘদিনের অত্যাচারের ফলে তাঁরা জ্বলে উঠেছিলেন। জাতীয় এবং প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই তারা কেবল গর্জে উঠেছিলেন সে-কথা ভাবলে ভুল হবে।

আর একটি কথা। গান্ধী ভাবতেন, অন্তত মুখে বলেছিলেন, আন্দোলনে প্রত্যেকেই হবে প্রত্যেকের প্রভু। আটই অগস্ট ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতায় তিনি বলেন[৫]

> When I raised the slogan of 'Quit India' people in India who were feeling despondent felt that I had placed before them a new thing. If you want real democracy you will have to come together and such coming together will create a true democracy. ...My democracy means that everyone is his own master.

আর তাই যদি হয়, তাহলে জনগণ একবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলে, যে যার নিজেই নিজের নেতা হলে, তখন তারা অহিংস কি সহিংস, তাদের পদ্ধতি-প্রকরণ-পন্থা নিয়ে কোনো তর্ক বা দ্বিমত চলে না।

'ভারত ছাড়ো'র চরিত্র বিশ্লেষণ করলে যে দুই ধারা লক্ষ করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডঃ ডেভিড আর্নল্ড লিখেছেন :[৬]

> Quit India has a dual perspective. It can be seen as contributing to the weakening of the British capacity or resolve to hold on to India, so bringing independence measurably nearer. But Quit India was also revealing of tensions, conflicts and contradictions within the nationalist movement and the Congress party. It was an important interval crisis—of indentity, method and purpose—as much as an episode in the continuing contest between the Congress and the Raj.

জনগণের কাজের মধ্যেও দ্বিধা, আত্মদ্বন্দ্ব, নিজেদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য এবং অঞ্চল বিশেষে ভিন্নতা থাকলেও জওয়াহরলাল নেহরু তাঁর *Discovery of India* গ্রন্থে যখন লেখেন যে 'It was essentially a spontaneous mass upheaval' তখন ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সঠিক চরিত্র অনুধাবন করেন। আন্দোলনের একদিকে ছিল গান্ধী, কংগ্রেস, সমাজের উচ্চস্তরের নেতৃবর্গ, অন্যদিকে জনগণের উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মেজাজ, আবেগ এবং সেই সঙ্গে সরকারকে যেন তেন প্রকারেণ আঘাত দেওয়ার চেষ্টা।

প্রসঙ্গটি এবার গুটিয়ে নেওয়া যাক। সম্প্রতি প্রকাশিত *The Indian Nation in 1942* গ্রন্থের সম্পাদক ইতিহাসবিদ ডঃ জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :[৭]

> Quit India might be fairly summed up as a popular nationalist upsurge that occurred in the name of Gandhi but went substantially beyond any confines that Gandhi may have envisaged for the movement. In this respect it revealed tensions that prevailed widely even in the earlier nationalist campaigns of Non co-operation and civil disobedience. But 1942 showed them up in starker relief. Gandhi as the undisputed leader of a movement over which he had little command. This paradox has a good deal to tell us about the relationship between the congress and the people and also helps to explain the remarkable ambivalence displayed by the congress leadership in its response to Quit India in the minds and years after August 1942.

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ইতিহাসের নানা সূত্র ও আকর থেকে যে চরিত্রটি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে, তাতে দেখা যায়, গান্ধীর নামে হলেও আন্দোলন সর্বদা গান্ধীবাদী থাকে নি। অসহযোগ বা আইন অমান্যের যুগ শেষ, বিয়াল্লিশ থেকে যে গণ-আইন অমান্য শুরু হয়, তাতে 'গণ' চরিত্রটি মুখ্য। গান্ধীর নাম ও চরিত্র-শক্তি, তাঁর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব এবং কংগ্রেসের শক্তিশালী সংগঠন যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি open rebellion-এর ডাক দেওয়ার পর অসংগঠিত অথচ জনগণের ভূমিকা। কংগ্রেসের দলিলেই প্রমাণ আছে যে জনজাগরণে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অপছন্দের কথা ; নেতাদের আচরণেও ছিল স্ব-বিরোধিতা। জওয়াহরলাল নেহেরু তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া'তে

ভারত-ছাড়ো আন্দোলনকে 'স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান' আখ্যা দিয়েও গণ জাগরণকে বলেন 'impromptu frenzy of the mob' (জনতার তাৎক্ষণিক উত্তেজনার প্রকোপ)[৮] এবং পট্টভি সীতারামায়া 'হিস্টরি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস' বইতে লেখেন 'People grew insensate and were maddened with fury' (প্রচণ্ড ক্রোধে পাগল এবং চেতনাহীন)।[৯]

॥২॥

বিয়াল্লিশের বিপ্লবের পিছনেও একটা ইতিহাস আছে, জনগণের ভূমিকা বিচার বিশ্লেষণ করার আগে সেই পটভূমিকাটি সংক্ষেপে একটু বলা দরকার।

1939-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল এবং 3 সেপ্টেম্বর লিনলিথগাও একতরফাভাবে ভারতকে ব্রিটেনের সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন কোনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা বা প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে (যারা 1937-এর নির্বাচনে জিতেছিল) আলোচনা পরামর্শ না করেই। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ যে জর্মনির (তখনো জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি) বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্যে অরাজি ছিলেন তা নয়, তবে তাঁরা চাইছিলেন যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা দান বা ক্ষমতার হস্তান্তর বিষয়ে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিক। স্বাভাবিক। কারণ এটা না দিলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে গণতন্ত্রকে বাঁচানো এবং জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, মিত্রপক্ষীয় এই প্রচারটাই যে মিথ্যে এবং অসার হয়ে যায়। প্রতিক্রিয়াশীল ভাইসরয়ের মদতদাতা হলেন রক্ষণশীলচূড়ামণি উইনস্টন চার্চিল। এ ব্যাপারে চার্চিল-লিনলিথগাও গোষ্ঠীর চিন্তাধারা লেবার দলের ক্লিমেন্ট অ্যাটলি-স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ গোষ্ঠীর মতের বিপরীত।[১০] বলা বাহুল্য ভাইসরয়ের 8অগস্ট 1940 এর ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্-এর অফার ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই বা মানবে কেন? সুমিত সরকার তাই মন্তব্য করেন:[১১]

> Linlithgow's attitude was not an aberration, but part of a general British to take advantage of the war to regain for the white-dominated central Goverment and bureaucracy the ground lost to the Congress from 1937 or earlier.

সেই সঙ্গে ভারত সরকারের সঙ্গে মুসলিম লীগের বোঝাপড়া ও নৈকট্য বাড়তে থাকে।[১২] যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ রাজনীতি এবং কৌশলের তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বৈশিষ্ট্য লীগ দাবিগুলিকে ইন্ধন যোগানো।

1940-41-এ অবশ্য ব্রিটিশ সরকার লীগের অধিকাংশ দাবি মানতে রাজি ছিল না। জিন্না 'অগস্ট অফার' মানেন নি, ভবিষ্যৎ দর-কষাকষির ভিত দেখেই সন্তুষ্ট রইলেন। আর কংগ্রেস? হরিপুরা ত্রিপুরী-র পর তারা ডান-বামে বিভক্ত। গান্ধী এবং দক্ষিণপন্থী হাইকম্যাণ্ড চাইছিলেন আপোস—সরকারী প্রতিশ্রুতি। আর বামপন্থী (যার পিছনে কংগ্রেস সমাজবাদী, এমনকি কমিউনিস্টরাও ছিলেন) চাইছিলেন যুদ্ধকালীন সরকার বিরোধী তীব্র সংগ্রাম। ভাইসরয়ের একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রী-সভাগুলি পদত্যাগ করল। রামগড় (বিহার) অধিবেশনে (মার্চ 1940) আইন অমান্যের কথা বলা হল, যা1940-41-এ সামান্য 'জেল ভরো'তে সীমাবদ্ধ রইল। মানবেন্দ্রনাথ রায় গোষ্ঠী যুদ্ধের গোড়া থেকেই এটাকে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধ মনে করত এবং ব্রিটিশ সরকারের নিঃশর্ত সমর্থনের পক্ষপাতী ছিল।

রামগড় অধিবেশনেই বামপন্থীরা গান্ধীর নিষ্ক্রিয়তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। পালটা সভা হয়। বামপন্থীদের প্রধান ব্যক্তিত্ব সুভাষচন্দ্র বসু মনে করতেন ইয়োরোপে ব্রিটেন যুদ্ধে বিপদে পড়েছে—ব্রিটেনের বিপদ ভারতের সুযোগ—এই সুযোগে আঘাত কর। জয়প্রকাশ নারায়ণ বা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতারাও তাই ভাবতেন। কমিউনিস্ট পার্টিও তাই মনে করত। কিন্তু তাদের ব্রিটেনের বা যুদ্ধের বিরোধিতা 1941-এর 22 জুন হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের ফলে রাতারাতি উল্টে যায়।

1941-এর জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্রের 'মহানিষ্ক্রমণ'। 1940-এর মার্চ থেকে 1941-এর শেষ পর্যন্ত কোনো অঞ্চলে আন্দোলন করলেও দেশব্যাপী সংগ্রাম করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিব্রত করতে পারেনি বামপন্থীরাও। ডান-বাম উভয়বিধ জাতীয় আন্দোলনের এই দুর্বলতার আরও একটি কারণ আছে। কংগ্রেস বা লীগের পিছনে মদতদাতা এক শ্রেণীর ভূস্বামী-ব্যবসায়ী সংঘর্ষে যেতে চাইলেন না, বরং উৎসাহী ছিলেন যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়ার ফায়দা লুটতে।

1941-এর শেষ দিকে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ যেমন ভারতের কমিউনিস্টদের দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপানের আক্রমণ কংগ্রেসকে। ব্রিটেনকেও। কংগ্রেসের কথা পরে আসবে, আগে ব্রিটেনের কথা বলি। ফ্রান্স-ব্রিটেন-রাশিয়ার মিত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট চার্চিলকে ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের কথা বলেন। 1942-এর প্রথম তিনমাসের মধ্যেই জাপান দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ায় হুড়মুড় করে দখল নিয়ে নেয়। ব্রিটেনেও একশ্রেণীর মানুষ নীতি পরিবর্তনের কথা বলেন, যেমন ক্রিপস্, অ্যাটলি, বেভিন প্রমুখ শ্রমিক দলের সদস্যগণ, ইণ্ডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপ যার নেত্রী আগাথা হ্যারিসন প্রমুখ। চাপ দেন চিয়াং-কাই-শেক। ফলে ভারতীয় জনমতকে নিজ পক্ষে টানার জন্য অবশেষে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধোত্তর প্রতিশ্রুতি দিতে চিন্তা করে এবং তারই ফল ক্রিপস্ দৌত্য।[১৩]

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর 'মিশন' ভারতে আসে 1942-এর মার্চ মাসের 23 তারিখে। মিশনের ছিল গোড়ায় গলদ। চার্চিলের ওয়ার ক্যাবিনেট ঢোঁক গিলে শাসন সংস্কার বা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ইত্যাদি আলোচনা মেনে নিলেও মনে মনে রক্ষণশীল দল 1940-এর প্রতিশ্রুতির বাইরে যেতে আদৌ রাজি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ভারত সচিব এমেরি আর ভারতের বড়লাট লিনলিথগাও—সবাই এ ব্যাপারে মাসতুতো ভাই। চার্চিল 10 মার্চ লিনলিথগাওকে তো লিখেছিলেন: ''দুর্ভাগ্যজনক গুজব এবং প্রচারের কারণে এবং সাধারণভাবে আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সম্পূর্ণ নেতিবাচক মনোভাব নেওয়া অসম্ভব হবে। আমাদের উদ্দেশ্য যে সৎ তা প্রমাণ করার জন্য ক্রিপস্ মিশন অপরিহার্য.... যদি ভারতীয় দলগুলির দ্বারা (প্রস্তাব) প্রত্যাখ্যাত হয়....জগতের সামনে আমাদের সাধুতা প্রমাণ করা যাবে।''[১৪] কী ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজি ভাবুন। এমন প্রস্তাব দেব যা কংগ্রেস মানবে না, তারপর কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে সাধু সাজব, এই ধান্ধা। বাস্তবেই তাই ঘটেছিল। গোপন দলিলপত্র-চিঠি ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়াতে এই ধাপ্পাবাজির স্বরূপ আজকাল ঐতিহাসিকরা ধরে ফেলেছেন। শুধু ভারতীয় ঐতিহাসিকরা নন, বিদেশীরাও। উদাহরণ দিচ্ছি। টমলিনসন জানাচ্ছেন যে চার্চিলের কাছে ''কিছু একটা করতে হবে এটা তেমন বড়ো কথা ছিল না, কিছু করতে চাইছি এমন (লোক দেখানো) ভাব করতে হবে যাতে সবাই দেখে।''[১৫] মন্ত্রিসভায় পাশ হওয়া খসড়া ঘোষণা (draft declaration)-এর মধ্যে থেকে কথা-বার্তা চালানোর জন্য গণ্ডি কেটে ('utmost limit') ক্রিপস্‌কে পাঠানো হলো, তৎসত্ত্বেও লিনলিথগাও যে তাঁকে সহযোগিতা করেন নি, বরং দুজনের সম্পর্ক যে তিক্ত ছিল তার প্রমাণ মিলবে অস্ট্রেলিয় ঐতিহাসিক রবিন জেমস মূর-এর লেখায়।[১৬] ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পরেও চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ডকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন (11 এপ্রিল) ''একটা বোঝাপড়ায় আসতে ব্রিটিশ প্রচেষ্টা যে কতখানি আন্তরিক ছিল'' তা তো বুঝিয়ে দেওয়ানো হয়েছে।[১৭] এই সব চরিত্র জানার পর সুমিত সরকারের কথা মানতে বাধা নেই: ''It is difficult not to suspect an element of bluff and double-dealing here so far as the British were concerned, though opinions may well differ as to whether Cripps himself was a willing or unconsious agent in this game.''[১৮] যাই হোক ক্রিপস্ ব্যক্তিটি প্রধানমন্ত্রী-বড়লাট-ভারতসচিব (চার্চিল-লিনলিথগাও -এমেরি) চক্রের মতো ধাপ্পাবাজ নন, বরং তুলনায় উদার, তবু দৌত্য সফল হল না।

হাত-পা বাঁধা ক্রিপস্ বেশি কিছু করতে পারেন নি। লিনলিথগাও ভারতকে স্বশাসনের উপযুক্ত মনে করতেন না (চার্চিলও তাই) এবং তাঁর ব্যাপারে কেউ নাক গলাক তাও চাইতেন না।[১৯] ক্রিপস্ যে সব প্রস্তাব দিলেন ভারতীয়দের কাছে তা গ্রহণীয় মনে হল না। হবেই বা কেন? 'জাতীয় সরকার'-এর প্রতিশ্রুতি দিলে তাকে সর্বপ্রকার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সহ দিতে হয়, না হলে কেই বা মানবে? কিছু প্রদেশের নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরে যাবার অধিকার থাকবে সেই বা কী রকম কথা? এ তো ভবিষ্যতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির নতুন শাসনতন্ত্র বা নতুন সরকার না মেনে বাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ। কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং পণ্ডিত নেহেরু সঙ্গত কারণেই দৌত্য মানলেন না। আর গান্ধী তো নাকি বলেই ফেললেন ক্রিপস্ মিশন প্রস্তাব দেউলিয়া ব্যাঙ্কের পোস্টডেটেড চেক্।[২০] বিস্ময়কর হল মিটমাট ব্যর্থতার দায় চাপানো হল কংগ্রেসের এবং গান্ধীর কাঁধে।

1942-এর 11 এপ্রিল যেদিন ক্রিপস্ দোষটা কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপালেন বেতার ভাষণে, সেদিনই স্বকারিভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। গান্ধী এবং অন্যদিকে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য আগেই জানতেন সব ভেস্তে যাবে; নেহরু ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে সমর্থনের জন্য সমজোতা চাইছিলেন, তিনিও বুঝলেন সংঘর্ষ ভবিষ্যতে অনিবার্য। এপ্রিল থেকে জুলাই—এই চার মাসের মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সেই সংঘর্ষের প্রস্তুতিতে এগিয়ে গেল। কংগ্রেসের মধ্যেও অনেক ওলট-পালট, চিত্র পরিবর্তন দেখা গেল। সমঝোতাপন্থী, অক্ষশক্তির প্রবল বিরোধী, ফ্যাসি-বিরোধী 'র‍্যাডিকাল' নেহরু ব্রিটেনের সঙ্গে মিটমাট চাইলেও দেখলেন মার্কামারা নরমপন্থী, প্রায় স্তাবক, রাজাগোপালাচারি (যিনি আবার মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিতে পর্যন্ত রাজি) এবং মডারেট

ভুলাভাই দেশাই ছাড়া তাঁর দিকে তেমন কেউ নেই; ফলে গান্ধীর কঠোর মনোভাব তাঁকে গিলতে হল। গান্ধীর পিছনে বরং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা, যেমন প্যাটেল, কৃপালনি, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সীতারামায়া প্রমুখ একদিকে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী নেতারা যেমন নরেন্দ্র দেও, অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ। সমঝোতাকামী আজাদও এ পক্ষে চলে এলেন। দাবি উঠতে লাগল ইংরেজদের ভারত ছাড়তে হবে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে হবে না, ক্রিপস্ দৌত্যও ব্যর্থ। অতএব উপায়? অনেক মতদ্বৈধ, তর্ক, বিচারের পর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত—ভবিতব্য যা হবার তা হবে, ইংরেজদের ভারত-ত্যাগ করতে হবে। এর অর্থ হল পরিণতি যাই হোক বিদেশী শাসকদের তাড়াও। ব্যাপক গণবিদ্রোহ হতে পারে, হোক। আওয়াজ তুলে দাও। অগস্ট মাসে গান্ধী তুলে দিলেন সেই আওয়াজ: 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

॥৩॥

এ যেন এক অন্যরকম গান্ধী। 1942-এর গোড়া থেকেই। ক্রিপস্ দৌত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ, স্যার স্ট্যাফোর্ড চলে যাওয়ার পর তাঁর প্রস্তাবকে বললেন 'Ill-fated'।[২১] বড়লাট, ভারতসচিব, প্রধানমন্ত্রী গোষ্ঠী আরো অসহ্য। যুদ্ধ চলাকালীন বুঝলেন ব্রিটেন নিজেদের বাঁচাতে পারবে না, ভারতকেও নয়। এক সাহেবকে ভারত-ছাড়োর আগেই জানিয়েছিলেন: "ব্রিটেন যা করতে পারে তার সব চাইতে ভালো হল ভারতের ভাগ্য ভারতের হাতে ছেড়ে দেশত্যাগ।"[২২] শুধু তাই নয়, গান্ধীর কণ্ঠে গরম গরম কথা, কলমে স্বভাব-বিরোধী সংগ্রামী চেতনার কথা। প্রভূত প্রমাণ সমসাময়িক 'হরিজন' পত্রিকায়, বক্তৃতায়, চিঠিতে, সাক্ষাৎকারে। গান্ধী কখনো বলেছেন এই শেষ সংগ্রাম হবে 'ফাইট টু দ্য ফিনিশ', কখনো ডাক দিয়েছেন 'ওপেন রিবেলিয়ানের'। এমন কথাও শুনি তাঁর মুখে 'মানব-চরিত্রের অন্তর্লীন শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করা আমার চরিত্র', তাই সারা ভারত অহিংস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে একথা আমি বিশ্বাস করি, তবে যদি অহিংস না-ও থাকে, 'I shall not swerve. I shall not flinch."[২৩] ভাবা যায়! নৈরাজ্যের ঝুঁকি নিতেও তিনি রাজি। গান্ধী জানতেন সরকারের দমননীতি এবার হবে কঠোরতম, তাঁর প্রস্তাব ছিল একই রকম কঠোরতম। ব্যাপক গণসংগ্রাম, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট, খাজনা ও করবন্ধ, সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপক অসহযোগ, মানুষের সার্বিক আইন অমান্য, এমনকি রাজন্যবর্গ, জাগিরদার, জমিদার, মালিক ও বণিক শ্রেণীর প্রতি হুঁশিয়ারি। মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশারকে জানাচ্ছেন 'আমি আর আগের মত চলব না।'[২৪] হরিজন পত্রিকায় 14 জুন সংখ্যায় লিখলেন: 'What I am hoping and striving for is an irresistable mass urge on the part of the people.'[২৫] আমরা পরে দেখব 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে জনগণের প্রকৃত প্রতিরোধ হলে আন্দোলন কিন্তু আর গান্ধীর হাতে থাকে নি, তাঁর নেতৃত্ব অতিক্রম করে সারাদেশে ব্যাপ্ত হয়।

জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের যে অন্তিম রূপ দিল তাই আলোচনা সাপেক্ষে গৃহীত হল 7-8 অগস্ট বোম্বাইতে এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনে। 8 অগস্ট গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল:

> The All India Congress Committee has given the most careful consideration to the reference made to it by the working committee in their resolution dated July 14, 1942 and to subsequent events, including the development of the war situation, the utterances of responsible spokesman of the British Goverment and the comments and criticisms made in India and abroad. The Committee approves of and endorses that solution, and is of opinion that events subsequent to it have given it further justification, and have made it clear *that the immediate ending of British rule in India is an urgent necessity.*

গান্ধী প্রস্তাব গ্রহণের পর দিলেন যাদুমন্ত্র: ডু অর ডাই। স্মরণযোগ্য যে 'হরিজন' পত্রিকায় 22 জুন গান্ধী লিখেছিলেন, "People must everywhere learn to defend themselves against misbehaving individuals no matter who they are. The question of non-violence does not arise". একই পত্রিকায় 2 অগস্ট জানালেন, "I have no false notions of prestige, no personal considerations make me take a step that I know it sure to push the country into a confrontation." এই কনফ্রনটেশন অর্থাৎ ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়ে গেল 9 অগস্ট সরকারের পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। গান্ধী চাইলেও আন্দোলন

নিরামিষ থাকে নি, তাই বলে বড়লাট লিনলিথগাও হিংসাত্মক ঘটনাবলির জন্য গান্ধীকে দায়ী করলে গান্ধীও সিধে প্রশ্ন তুললেন: 'Was not the drastic and unwarranted action of the government responsible for the reported violence?'[২৬] জনগণের রুদ্র রোষ তো শতাব্দীর বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণের ফলে পুঞ্জীভূত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। 'Leonine violence'-এর জন্য দায়ী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার, যারা 'goaded the people to the point of madness'.[২৭]

॥৪॥

জনগণ সত্যি অসহনীয় অবস্থায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। 'Largely spontaneous popular outburst'. এর ব্যাখ্যা অবশ্যই শুধু 9 অগস্ট গ্রেফতারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর ব্যাপ্তি যে এমন হবে কংগ্রেস কি আগে অনুমান করতে পেরেছিল? মনে হয় না। সরকারও বোঝেনি অগস্ট মাসের শেষ তারিখে বড়লাট প্রমাদ গুনে লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রীকে তার করে জানালেন যে শুরু হয়ে গেছে 'by far the most serious rebellion since that of 1857'। হিটলারের বিষাক্ত নাগিনীর নিঃশ্বাস মানবসভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলেছিল সত্য, পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার অস্তিত্ব হয়েছিল বিপন্ন, রাশিয়ার দিকে মিত্রতার হাত বাড়িয়েছিল ব্রিটেন—সব সত্য। তবু আদর্শ-তত্ত্বে যতই সাফাই গাওয়া হোক বাস্তবে দেশীয় পরিস্থিতি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন রজনীপাম দত্ত ও তাঁর দোসর সি. পি. আই। প্রবীণ নেতা ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ সম্প্রতি প্রকাশিত এক গ্রন্থে লিখেছেন,

> The essence of the mistake committed by the party was that, as opposed to the Marxist-Leninist stand that the question of nationalities should be dealt with not abstractly but as part of the class political question (India's freedom struggle in this case), the CPI failed to take due account of the real class and national situation in the country.

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনি তুলে দিলে কী ভয়ানক রূপ পেতে পারে গণবিদ্রোহ, হয়তো আঁচ করেছিলেন গান্ধী। কিন্তু আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, রূপরেখা, কর্মপন্থা কোন দিকে যাবে তিনিও বোঝেন নি।

জনগণ অনেক সময় শ্লোগান দিয়েছে মহাত্মাজি কি জয়, শহরাঞ্চলে করেছে ধর্মঘট, পুড়িয়েছে ট্রাম-বাস, ক্ষিপ্ত হয়েছে পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে, আর গ্রামাঞ্চলে নষ্ট করেছে সরকারি সম্পত্তি, ধ্বংস করেছে ডাকঘর, থানা, রেলস্টেশন। কোথাও কোথাও ভূস্বামী জোতদারদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নিয়েছে আন্দোলন। কাদের দ্বারা? 'যে গরিব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই', সেই জনতা, জানাচ্ছেন 'জাগরী' উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী। অনবদ্য সেই 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ীর সংবেদনশীলতা ও মমত্ববোধ যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল। দু'টি উপন্যাসের দু'টি অংশ উদ্ধার করি। 'জাগরী'তে নীলু বলছে:

> এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশসুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও মনে হইতেছে যেন পাগলা-গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না।...রেলস্টেশন, খাসমহল, কাছারি, সব্ রেজেস্ট্রি অফিস ও থানার পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। যেখানেই তাহারা দল বাধিয়া যাইতেছে সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তম্ভগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে ও অত্যাচারের প্রতীকগুলি মাথা নত করিয়া লইতেছে।

ঢোঁড়াই-তে গরিব উপজাতীয় কিষাণ বড়কা মাঝির গান:

> রেল পথ উঠিয়ে ফেললে
> তো পা ভেঙে দিলে সরকারের।
> তার কেটে দিলে
> তো কান কেটে দিলে সরকারের।
> থানা জ্বালিয়ে দিলে
> তো চোখ গেলে দিলে সরকারের।

আর শহুরে ভদ্রলোক, দুখে ও তামাকে সমান আসক্তিকে ব্যঙ্গ করতে সিদ্ধহস্ত, কবি সমর সেন লিখলেন বন্ধু চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জবাব দিতে গিয়ে 'খোলা চিঠি' কবিতা:

> ...সাম্রাজ্যবাদের এই নাভিশ্বাস মুহূর্তে
> প্রতিবিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাহিনী
> দেশে দেশান্তরে নতুন সাম্রাজ্য প্রয়াসী।
> তার প্রতিরোধ এ দেশে—আমাদের প্রতিজ্ঞা।

'ভ্রান্তি' কবিতায় লিখলেন

পথে আজ লোক নেই, জবাবী হামলা হল শুরু
কারাগার অবারিতদ্বার, গ্রামে গ্রামে বিপর্যয় ;
রাস্তায় নিরস্ত্র লোক হৃৎপিণ্ডে আহত, সন্ধ্যা
রক্তফরা।
....আজ ছত্রভঙ্গ জনতা, ধীরে ধীরে রুদ্ধ করে
অরাজক ক্রোধ,
সংহত পাখসাটে চূর্ণ হবে শতাব্দীর আপদ।

1942-এর বিদ্রোহে জনগণ সর্বত্র না হলেও এগিয়ে আসে অনেক প্রদেশে—বাংলা, বিহার, পূর্ব ইউ পি, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের কথা আগে জানা ছিল, আজকাল দেখা যাচ্ছে আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে এবং মাদ্রাজেও। সমসাময়িক দলিল থেকে সাম্প্রতিক গবেষণা এ কথাই বলছে।

অধ্যাপক সুমিত সরকার 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের স্তর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায় : "The first, massive and violent but quickly suppressed, was predominantly urban, and included hartals, strikes and clashes with the police and army in most cities."[২৯] এই শহরগুলির মধ্যে ছিল বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতা, পাটনা, লখনৌ. কানপুর, নাগপুর এবং আমেদাবাদ। অংশগ্রহণকারী জনগণের দিকে তাকালে আমরা সহজেই লক্ষ করি মুখ্য ভূমিকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে, যার পুরোভাগে ছাত্রসমাজ। জামসেদপুরে ইস্পাত কারখানায় বা আমেদাবাদের সুতাকলগুলিতে ধর্মঘটে অবশ্য শ্রমিকরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নিয়েছে।

অগস্ট মাসের শেষ দিকে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল এবং তখন থেকেই আন্দোলন শহর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামাঞ্চলে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ক'রে সংগ্রামী রূপ দেখা গেল, যা সুমিত সরকারের ভাষায় "Leading a veritable peasent rebellion against white authority strongly reminiscent in some ways of 1857."[৩০] এই পর্বে উত্তর এবং পশ্চিম বিহার, পূর্ব ইউ পি, বাংলার মেদিনীপুর, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের কিছু এলাকা ছিল আন্দোলনের পটভূমি। অনেক জায়গায় 'জাতীয় সরকার' স্থাপিত হয়।

সেপ্টেম্বর 1942 থেকে সূত্রপাত হল আন্দোলনের তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়। এই পর্বে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি, সংখ্যাধিক্য এবং কর্মের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে উঠে এসেছেন বহু অজ্ঞাতকুলশীল চরিত্র ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে। অনেক ক্ষেত্রে নায়কের আসনে। এতদিন প্রচলিত ইতিহাসে মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত নেতারা পূজিত হতেন। তাঁদের জীবনী-সাহিত্য বাজারে বেরুত, স্কুলে-কলেজে সেই ইতিহাস পড়তাম, পড়াতাম। আন্দোলনের নেতৃত্বের (leadership) দিকে নজর ছিল ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য। আজ ইতিহাসচর্চায় নতুন ধারা যুক্ত হয়েছে, সমাজের নিম্নবর্গের দিকে দৃষ্টি পড়েছে, রচিত হচ্ছে জনগণের ইতিহাস (popular history কিংবা people's history) কিংবা ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা (crowd in history)। আমাদের দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই কাজ ও গবেষণা যে শুধুমাত্র তথাকথিত 'সাবঅলটার্ন' গোষ্ঠীয় মধ্যে সীমাবদ্ধ তা আদৌ নয়। যাই হোক এই আধুনিক গবেষণার ফলেই প্রাক্-স্বাধীনতার শেষ দশকে কত অজানা শহীদ, কত বীরগাথা, কত গণনায়ক ইতিহাসে স্থান পাচ্ছেন। 1942-এর-বিপ্লব বা ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের পর্বেই গান্ধী-নেহরু-আজাদ-প্যাটেল-সরোজিনী-পন্থ-আসফ আলি-রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা জয়প্রকাশ নারায়ণ-সতীশ সামন্ত-অজয় মুখোপাধ্যায়ই সব নন, তাদের অনন্য ভূমিকা সত্ত্বেও।

এই আন্দোলনে জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাই তিনটি সূত্র মনে রাখা দরকার। প্রথমত বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে জনতার মধ্যে থেকেই নেতা তৈরি হয়ে যায়। যেমন বিহারের মজঃফরপুর জেলার বান্দগাঁও-এর রামফল ধনুক, যে কুখ্যাত থানেদার (পুলিশ অফিসার) অর্জুন সিংকে মারতে গিয়ে দলবল নিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে এক এস. ডি. ও. ও তার সঙ্গীদের। সীতামারিতে কোর্ট-এর সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সে বলেছিল (10 সেপ্টেম্বর 1942) 'জানতাম সাহেব অফিসারদের বোমা ও বন্দুক থাকবে। তাতে কি, আমাদের তো থাকবে ইঁট-পাটকেল, লাঠি, তলোয়ার, বল্লম।' বিচারে ফাঁসি হয় তার। বিচারে ফাঁসি হয়েছিল উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার মালকানগিরি-র লক্ষ্মণ নায়েকেরও (29 মার্চ 1943)। রামফলের মতো সে-ও কিষাণ। বিয়াল্লিশে সে সংগঠিত করেছিল সংগ্রামী কৃষক আন্দোলন। কিংবা ধরা যাক মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় আন্দোলনের নেতা[৩১] নানা পাতিলের কথা—স্বাধীনতা-উত্তর সাতারার কংগ্রেসী নেতা ওয়াই. বি. চ্যবন-এর চাইতে 1942-এ যাঁর দান ছিল শতগুণ বেশি। কিংবা গুজরাটের ছোট্টভাই পুরানি ও বি. কে. মজুমদারের কথা। অথবা আমাদের বাংলার মেদিনীপুরের তমলুক পরগণার নন্দীগ্রাম থানার বেয়াপাড়া গ্রামের রবি

গিরি এবং খোদামবাড়ি গ্রামের গুণধর মণ্ডলকে কি ভোলা উচিত? এমন বহু অঞ্চলের বহু নেতার কথা মনে রাখতে হবে। আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে তাই প্রথম স্মর্তব্য সূত্র : শুধু উপরতলার বা এলিট নেতাদের দিকে নয়, তাকাতে হবে নিচুতলার নেতাদের দিকেও এবং তবেই হবে ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণ।

দ্বিতীয় সূত্র এই, শুধু নিচুতলার জনতার মধ্যে থেকে উঠে-আসা নেতাদের দিকে নজর দিয়ে তাদের ভূমিকা স্মরণ করলেই ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না, আরও বড়ো কথা হল ভুলে যাওয়া উচিত নয় সাধারণ কর্মী (rank and file) যাঁরা দধীচির মতো অস্থি দান করেছেন, লড়াইতে তাঁরাই পিলসুজ। একটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। বিয়াল্লিশের মেদিনীপুরের কথা অনেক শুনি, তুলনায় বিয়াল্লিশের অগ্নিগর্ভ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের কথা ক'জন জানেন? চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অসামান্য দানের কথা বা বীরেন দে সরকারের মতো যুব নেতাদের কথা যদি বা অনেকে জানেন, শহর কলকাতায় থেকে ক'জন ইতিহাসানুরাগী জানেন ফুলচাঁদ মণ্ডল, পীতাম্বর মণ্ডল, এটা ওরাঁও, চৈত বর্মণ, রঘুনাথ বর্মণ, গাজুরাম ওরাঁও, পূর্ণেশ্বর বর্মণ, বুন্দেও ওরাঁও, গণেশ বর্মণ, বৈদ্যনাথ ওরাঁও, বসন্ত মণ্ডল, জটাধর বর্মণ প্রমুখদের কথা?

জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে তৃতীয় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল গণ-ক্রিয়াকর্ম (mass action) এবং গণ-চৈতন্য (mass-psychology) সম্পর্কিত। সেই সঙ্গে অপরিহার্য আন্দোলনের নেতাদের কর্মিবৃন্দের সামজিক ভিত্তি আলোচনা। নতুবা ইতিহাস বিকৃত হতে বাধ্য, কারণ নিচের তলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক কিছু—ধর্ম, বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি, জাতিভেদের বঞ্চনা, শ্রেণী-শোষণ। কংগ্রেস-পন্থী ইতিহাসবিদ গোবিন্দ সহায় দুম ক'রে মন্তব্য করে দেন যে নানা পাতিলের নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্রের আন্দোলনে 'criminal elements of the district took advantage'.[৩২] আশ্চর্য! কৃষকরা বিদ্রোহ করলে বা অহিংস না থাকলেই তারা ক্রিমিনাল? 'সাতারা প্রতি-সরকার' নিয়ে শ্রীমতী গেল ওমভেটের সাম্প্রতিক গবেষণা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। সাতারায় আন্দোলন ছিল একাধারে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, জাতিবৈষম্য-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। মন্তব্য করার আগে চরিত্রটি বুঝে নেওয়া দরকার মনে করেন নি গোবিন্দ সহায়। ম্যাক্ষ হারকোর্ট, স্টিফেন হেনিংহ্যাম প্রমুখের গবেষণায় প্রমাণিত যে দরিদ্র জনগণ বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে সহিংস হয়েছিল তার কারণ এই নয় যে তারা 'গুণ্ডা, বা 'অপরাধপ্রাণ জাতির লোক'। তাদের চৈতন্যে কাজ করেছে একাধারে শাসক ও পুলিশ অত্যাচারে প্রতিক্রিয়া, উচ্চবর্ণের লোকদের অত্যাচারে স্মৃতি এবং জাতীয়তার আবেগ। আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করবেন অনেকেই যে উচ্চফলনশীল কৃষিসমৃদ্ধ প্রদেশগুলিতে 'ভারত ছাড়ো' ছড়ায় নি, যেমন পাঞ্জাব, পশ্চিম ইউ.পি ; দু'-একটা পকেট ছাড়া গুজরাট, তামিলনাড়ুতেও নয়। সুমিত সরকারের টীকা : '....in 1942, nationalist militancy probably blunted to some extent the edge of social radicalism.'[৩২] নানা ঘটনায় সেই চিত্র পাই। দেশীয় ধনী-জোতদার-জমিদার বা ব্রিটিশ দালালদের গণ-ক্রোধ যতই পুঞ্জীভূত থাক, কিছুক্ষেত্রে টাকা-আদায়, ডাকাতি, গরিব কৃষককে জমি ফিরিয়ে দেওয়া, ধর্ষণকারী ও পুলিশের সংবাদদাতাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া সবই হয়েছে ঠিক, তবে পাইকারিহারে সম্পত্তি-সম্পর্ক পালটে ফেলা হয়নি, তা সম্ভবও ছিল না। অমলেশ ত্রিপাঠীর তমলুকের সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতাই থাক, জনসাধারণ সর্বত্র ভয়ে কাজ করেছে, একথা ভাবার সঙ্গত কারণ নেই।

আর দু'টি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আলোচনায় ইতি টানব। প্রথম কথা ভদ্রলোকদের লেখা ইতিহাস, তার চর্চা, ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্যায়ন এক জিনিস আর জনমানসিকতা বা লোক-মানসিকতা ভিন্ন জিনিস। তাই দেখা যায় প্রচলিত ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা সর্বদা স্থান না পেলেও, তা বেঁচে থাকে লোক-ঐতিহ্যে, স্মৃতিতে, সংগীতে, বীর-গাথায়, মুখে-মুখে। আজ পঞ্চাশ বছর পরেও তমলুক-কাঁথিতে যান, আজমগড়-বালিয়া-বেনারসে যান, মালকানগিরি-কোরাপুট-বালেশ্বরে যান, যান সাতারার পাহাড়ে-জঙ্গলে বা বিহারের গ্রামাঞ্চলে — দেখবেন সেই স্মৃতি জীবন্ত। 'গান্ধীবাবা'র স্মৃতির মত গণ-নায়কদেরও অনেকে ভোলেন নি। জনগণের অপূর্ণ স্বপ্ন তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গণ-রাজ, গান্ধী-রাজ এবং স্বরাজ মিলেমিশে যে 'মিথ' তৈরি করে—তার বাস্তব ভিত্তি হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল না—তাই অধিকাংশ বা সব ব্রিটিশ-রাজ বিরোধী আন্দোলনের মত ভারত ছাড়ো আন্দোলনও সাফল্য পায় নি। তবে অস্বীকার করা চলে কি এই মিলেমিশে গিয়েছিল বলেই ঐ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও বিশালতা? সেই অচ্ছেদ্যবন্ধনে বিধৃত থাকে জনমানসের লোকায়ত বিশ্বাস ও স্মৃতি, জাতি-গোষ্ঠী কৌম-সমূহের চেতনা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কোনো বিশেষ 'আর্কেটাইপ' দিয়ে তা ব্যাখ্যা করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না কি?

হেনিংহ্যাম 'কুইট ইণ্ডিয়া'কে 'দ্বৈত বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে বলেছেন :[৩৩]

> One insurgency was an elite nationalist uprising of the high caste rich peasants and small landlords who dominated the Congress. The other insurgency was a subaltern rebellion in which the initiative belonged to the poor, low caste people of the region.

এটি আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা। অসত্য নয়। তবে যে ব্যাপারটিতে অস্ট্রেলিয়াবাসী ইতিহাসবিদ বা তাদের গোষ্ঠী-পিতা রণজিৎ গুহদের আরো বোঝা দরকার, সে কথা সবিনয়ে অথচ স্পষ্টভাষায় বলি। বিপ্লবে দ্বৈত চরিত্র থাকলেও সর্বত্র ভেদরেখা ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে তা একাকার হয়ে গিয়েছিল। একদিকে সমান্তরাল বা পরস্পর-বিরোধী-সংগ্রাম, অন্যদিকে ঐক্য ও বিদেশী শক্তি উচ্ছেদ-কল্পে মিলিত আন্দোলন। 'Popular militancy'র সঙ্গে 'restrained political actions'র মধ্যে টেনশন, ভিন্ন-পন্থা ইত্যাদি থাকতেই পারে। জর্জ রুদে অষ্টাদশ শতকের লণ্ডন-প্যারিস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন ভিন্ন বা বাইরে থেকে আসা আদর্শকে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে পপুলার প্রোটেস্টকারী ব্যক্তিরা মোচড় দিয়ে নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিত।[৩৪] 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও তা-ই ঘটেছিল। চেতনার প্রসার ও গণসংগ্রাম। তবে গান্ধী বা কংগ্রেসের কাছে যার উদ্দেশ্য 'স্বরাজ', নিম্নবর্গের কাছে তা ছিল হারিয়ে যাওয়া অধিকার এবং মাথার উপর চেপে থাকা জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন।

সূত্রনির্দেশ ও টীকা :—

1 পি .এন. চোপড়া (সম্পা.), কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট: ব্রিটিশ সিক্রেট রিপোর্ট, ফরিদাবাদ, 1976, পৃ 1. ব্রিটিশ সরকারও যে একই রকম মনে করতেন তার প্রমাণ পাই 1942 এর 31 অগষ্ট ভারতের ভাইসরয় লিনলিথগাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার ভাষায়—এই আন্দোলন ছিল 'by far the most serious rebellion since that of 1857, the gravity and extent of which we have so far concealed from the world for reasons of military security' (দ্র, ম্যানসারগ (সম্পা.), দ্য ট্রান্সফার অফ পাওয়ার: 1942-47, দ্বিতীয় খণ্ড, 'কুইট ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, 1971, পৃ 853)

2. এফ. জি. হাচিনস্, দ্য স্ট্যানট্যানিয়ান রেভোলিউশন: দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট, নতুন দিল্লী, 1971, পৃ 1.

3. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. 343. বিশেষ পংক্তিতে গুরুত্ব আরোপ বর্তমান লেখকের।

4. নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণের আগে বোম্বাইতে এক সাক্ষাৎকারে গান্ধী বলেন "I have definitely contemplated an interval between the passing of the Congress Resolution and the starting of the struggle. ..But a letter will certainly go to the Viceroy, not as ultimatum but an earnest pleading for avoiding conflict." অপরপক্ষে 8 অগষ্ট কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করার পরদিনই সরকার নেতাদের গ্রেফতার শুরু করে। ঐ 9 অগস্ট রবিবার দিন লর্ড এমেরি (দ্য সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) এক বেতার ভাষণে সরকারী কাজকে সমর্থন করে বলেন "But bitter experience has shown us how exact non-violent activities excite crowd and lead to riot and bloodshed. The success of this campaign would paralyse India's entire war efforts... In view of this challenge, the goverment must take swift and sane action before the campaign gathered momentum." বলা বাহুল্য, sanity র নমুনা সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। উদ্ধৃতি দুটির জন্য

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পা.), ইণ্ডিয়া ইন রিভোল্ট 1942, প্রথম খণ্ড, হিন্দুস্থান বুক ডিপো, কলকাতা, 1946 দ্রষ্টব্য।

5. চোপড়া, পূর্বোক্ত, পৃ 365।

6. ডেভিড আর্নল্ড, 'কুইন ইণ্ডিয়া ইন ম্যাড্রাস,'' দ্র জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (সম্পা.), দ্য ইণ্ডিয়ান নেশন ইন 1942, কে. পি. বাগচী, কলকাতা, 1988, পৃ. 207.

7. জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, তদেব, দ্র ভূমিকা, পৃ. 5

8. জওয়াহরলাল নেহরু, দ্য ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া, (1946, পুনর্মুদ্রণ, বোম্বাই 1969), পৃ. 489.

9. পট্টভি সীতারামায়া, দ্য হিস্টরি অফ দ্য ইণ্ডিয়া ন্যাশানাল কংগ্রেস, দ্বিতীয় খণ্ড, বোম্বাই, 1947, পৃ. 3731

10. পার্থসারথি গুপ্ত, ইম্পিরিয়ালিজম্ অ্যাণ্ড ব্রিটিশ লেবার মুভমেন্ট, লণ্ডন, 1975, পৃ. 257-59. অপিচ, ম্যানসারগ, টি.পি., ১ম খণ্ড (লণ্ডন, 1970) দ্রষ্টব্য।

11. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. 376

12. জেড. এইচ. জাইদি, "অ্যাসপেক্টস্ অফ দ্য ডেভেলাপমেন্ট অফ মুসলিম লীগ পলিসি, 1937-47" দ্র, সিরিল হেনরি ফিলিপস্ ও মেরী ওয়েনরাইট (সম্পা.), দ্য পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া: পলিটিকস্ অ্যাণ্ড পারস্পেটিভস্, লণ্ডন, 1970; চৌধুরী খালিকুজ্জামান, পাথওয়ে টু পাকিস্তান, লাহোর, 1961; উমা কৌরা, মুসলিমস্ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালইজম, দিল্লী, 1977।

13. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. 385; অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. 293-95 । অপিচ দ্রষ্টব্য ডেভটরামাজি ও শ্রীবাস্তব, পূর্বোক্ত।

14. ম্যানসারগ, টি.পি., ১ম খণ্ড, পৃ. 394-95।

15. বি. আর. টমলিনসন, দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য রাজ 1929-42, লণ্ডন, 1976, পৃ. 156

16. আর. জে. মুর, চার্চিল, ক্রিপস্ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া 1939-45, অকস্‌ফোর্ড, 1979, পৃ. 81।

17. ম্যানসারগ, টি.পি, ১ম, পৃ. 739

18. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত 388

19. এর বিবরণ মিলবে রবিক জেমস্ মুরের বইতে।

20. পিনেলের ডায়েরী, 30 মার্চ, 1942 এর ক্যাপল্যাণ্ডের ডায়েরী 31 মার্চ, 1942, উদ্ধৃত ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. 297।

21. হরিজন, 19 এপ্রিল, 1942।

22. হোরেস আলেকজাণ্ডারকে গান্ধী, 22 এপ্রিল

23. উইকেনডেন রিপোর্টে উদ্ধৃত। চোপড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. 63.

24. গান্ধী রচনাবলী (কালেকটেড ওয়ার্কস), 76 খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ. 427-51; অপিচ, লুই ফিশার, এ উইক উইথ গান্ধী

25. হরিজন, 14 জুন, 1942। ইটালিকস্ বর্তমান প্রাবন্ধিকের।

26. গান্ধীকে লিনলিথগাও-এর পত্র (13 জানুয়ারি 1943)। গান্ধীর জবাব (29 জানুয়ারি 1943)। দ্র, গান্ধী রচনাবলী, 76 খণ্ড, পৃ. 396-401

27. তদেব।

28. নাথুদ্রিপাদ, রেমিনিলেন্সেস অফ অ্যান ইণ্ডিয়ান কমিউনিস্ট, নতুন দিল্লী, 1987, পৃ. 394।

30. তদেব, পৃ. 395

31. সহায়, পূর্বোক্ত, পৃ. 118, 133.

32. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. 403

33. হেনিংহ্যাম, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

34. জর্জ রুদে, প্যারিস অ্যাণ্ড লণ্ডন ইন দ্য এইটটিনথ সেঞ্চুরি: স্টাডিজ ইন পপুলার প্রোটেস্ট, লণ্ডন, 1974, পৃ. 32-33., অনুরূপ গবেষণা আছে হিলটন, হবস্‌ব্যাম, টমসন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, প্রাবন্ধিক এবং সমালোচক এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ডঃ গৌতম নিয়োগী বয়সে উত্তর-চল্লিশ, শিক্ষা কলকাতায়, কর্মসূত্রে বর্তমানে উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগের রীডার। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতিতে ছিলেন বহু বছর। ব্যক্তি জীবনে উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং যুক্তিবাদী। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই লেখেন। লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ। ডঃ নিয়োগী একজন সুবক্তা এবং তাঁর অনুরাগের প্রধান বিষয় : সমাজ ও মানুষ।

সাদা ঘরে ভোমরার গান

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

মায়া জালে বন্দী হইয়া বৃক্ষরূপ হৈনু। একা। চরাচরের মাঝখানে গাছের মতো বসে মাটির সঙ্গে কথা বলছিল মুকুন্দ। মাটির গভীরে তার শিকড়। সে নিজেই একটা গাছ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ফুল ফুটল। বাতাস বিচিত্র গন্ধ নিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে মানুষের হৃৎপিণ্ডের চারপাশে জড়ো হচ্ছিল। ঘুমন্ত শিশুটি জেগে উঠলে দেখবে, সে এক অদ্ভুত গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে!

উঠে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মুকুন্দ। এ এখন তার নিত্যকার ঘটনা। শুরু হয়েছিল গোকুল মরবার পর থেকে। গোকুল মরে যাওয়ার সময় একটা হাত ডালপালার মতো বা চারাগাছের মতো মুকুন্দর দেহে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যা আজ আট ন' বছর ধরে কেবলই নড়া চড়া করছে। এলোমেলো কান্ড করছে। গোকুল বন্ধু মানুষ। হাসপাতালে মরবার সময় বলেছিল, সব কিছু রইল মুকুন্দ — আমার সব কিছু — কিছুই হলনি, তুই দেখবি।

মুকুন্দ অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। তার সাধ্য কি? গোকুল ছিল লোকশিক্ষায় শিক্ষিত। সে যা পারত মুকুন্দ তা পারবে কী করে? তবু ও এই রকম হল। ব্রাহ্মণ মুকুন্দ পড়ল ঝামেলায় — যেন জ্বরে পড়ল, যেন পাগলামিতে পেয়ে বসল।

কী যে হয় মনের ভেতর? ইচ্ছে এবং না পারার দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত মুকুন্দ মুশকিলে পড়েছে। অথচ সে লোভী; ঠিক এই শতকের এই সময়ের একশো ভাগ মানুষের মতোই। তার মাথায় সংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছে লোভের বীজ। যে বীজ ঘোষণা করে গন্ধ দিয়ে, সম্পদ বাড়ালেই জীবনের সার্থকতা। কী করবে এখন কমলপুরের মুকুন্দ সিংহটাল?

একটা দ্বন্দ্ব তাকে সুতরাং করে তুলেছে জটিল। সে অনেক কিছুই পারে না। অথচ জানে, শ্রমকাতর সাধারণ চাষী মানুষের কাছে ধান তোলা, পান করা, মাছ ধরা, মদ মারা সব সমান। সব সমান জানে। অথচ হাঁটতে গেলে হোঁচট খায়। হেঁটে যেঁতে শুরু করলেই কুয়াশায় জড়িয়ে ধরে। ভাবে চোখের দোষ। নন্দীগ্রামে ডাক্তার দেখাতে গেলে বলে, চোখে কোনো অসুখ নেই মুকুন্দর। সুতরাং ধোঁয়া আর কুয়াশার ভেতর দিয়েই হেঁটে চলতে হয়। হাঁটছে মুকুন্দ। এগিয়ে চলেছে। চোখ কর্‌কর্‌ করছে। সঙ্গে আছে মুকুন্দর দেবতা — তার আত্মবিশ্বাস, বিমূর্ত রূপ — অলৌকিক ভঙ্গিমা। হাঁটতে হাঁটতে ছটফট করছে মুকুন্দ। গাড়ডায় পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে। তপ্ত রুক্ষ ঊষর পৃথিবীতে সবুজ গাছ একটি দাঁড়িয়ে পড়ল। পাখিরা ডানা ঝেড়ে এখানে বিশ্রাম করবে। মাঠে লাঙল নামাবার প্রস্তুতি নেবে ধান-চাষীরা। আর গাছটা হাসবে। শরীর তরুবর — চেতনা তার ফুল — ফুল ফোটায় আত্মিক বিকাশ, — মনুষ্যত্বের সক্রিয়তা ডালপালা — এক নতুন জীবনধারার বীজ উন্মুখ প্রকাশের অপেক্ষায়। মস্তিষ্কে রক্তে তাই অসহায় যন্ত্রণা। সঠিক আলো-উত্তাপ-বাতাস না পেলে এই বীজ মরে যেতে পারে।

গোকুল বলত, আমার অনেক সাধ ছিল খুড়া, সাধ্য বলতে কিছু নাই। কথার সূত্র ধরে কুসুম বলেছিল, বামুন ঠাকুর, তুমি ভোটে দাঁড়াও না কেনে — তোমার সাঙাতের মতন!

মুকুন্দ হাসছিল। ভোটে দাঁড়ালে গোকুলের মতো মাথাটি যদি পরিষ্কার না রাখতে পারে লোভী মুকুন্দ সিংহটাল? তাহলে তখন কী হবে? কী হত আজ? কেবল কি হুজুগ আর ক্ষমতার জন্য পাগলামিতে শেষ হয়ে যেত না সারাটা জীবন? তাই এটা বড় বিপদের সময়।

সন্ধ্যা তখন ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে বিড়ি বাঁধছিল। মুকুন্দর দিকে একখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, ও সব ছোটলোকেদের কারবার — কুসুমকে দেখলে যে মোর বমি পায়—

ছোটোখোকার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল মুকুন্দ। শিশুটি ঘুমিয়ে কাদা। সে বলে, ও সব তো কথা নয়। কথা হল, পয়সা সম্পদ সম্পত্ত। এ সব থাকলে পরিচয় দিতে অসুবিধা নাই। গ্রামের বাইরে পা দিলে মুকুন্দ ঠাকুরকে কি চিনে?

মাঝে মধ্যে মুকুন্দর এইসব কথাবার্তার ধরন বা কিছু কিছু অনাচারকে আদৌ সহজভাবে নেয় না সন্ধ্যা। সুতাহাটা থানার গোবিন্দপুরের মুখুজ্জ্যেদের মেয়ে সে! এ সব কি ভুলে গেছে মুকুন্দ? চোখ তুলে সে বলে, গোকুল হাঁড়োলের বিধবার সাথে অত মিলা-ঘেঁসা ক্যানে?

মুকুন্দ বলে, বন্ধুর আবার জাত কী? তাছাড়া যাদের সাথে থাকব তাদের ঘিন্না করব ক্যানে? ওদের দৌলতেই তো মোর এত! আরো হবে! যেখানে থাকব তাদের সাথে তাদের মতোই থাকব।

বিড়ি বাঁধার কুলোটাকে সশব্দে মাটিতে রেখে ঝাঁঝিয়ে ওঠে সন্ধ্যা। তবে থাকো — তুমি থাকো — আমি বাচ্চাকে নিয়ে বাপের ঘরে যাই—

অবোধ মেয়ে মানুষের ওপর অসন্তুষ্ট হল মুকুন্দ। কিন্তু পাতলা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সে বলে চলে কুসুমের কথা। যে ব্যবসায় কুসুম পয়মন্ত। নিজের হাতের জোরে মামুলি ক্ষেতমজুর ও পরে ক্ষুদ্র জোতের মালিক গোকুলকে কুসুম উঠিয়ে নিয়ে এলো কত উঁচু জায়গায়। জাত বংশের মুখে পেচ্ছাব করে দিয়ে আশপাশের সবাই দৌড়ালো পয়সাআলা গোকুল হাঁড়োলের দিকে। পাঁচ বছর পঞ্চাৎও ছিল গোকুল। তাই দিনকালের বদলে জাত-ফাত টং-এ তুলে রাখো — ধম্ম-কম্ম টং-এ তুলে রাখো—

সব শুনে বিরক্ত সন্ধ্যা বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে শুতে গেল। সন্ধ্যা উঠে যেতে পারে, কিন্তু মুকুন্দ অস্বীকার করবে কী করে কুসুমের হাতকে? তার হাতের গুণকে? সে তাই তার নিজস্ব দর্শনে অটল থেকে বিড়ি ধরাল আর একটা...

কুসুমই বিড়ি বেরে করে দিলো। ধর ঠাকুরের পো। তুমি যে মেচেদা যাও — সিংহবাহিনী সারবে কে?

পাটাতনে পা ঝুলিয়ে সাইডে এতক্ষণ বসেছিল দু'জন। পাশাপাশি। মুকুন্দর সামনে পাটাতনের ওপর দু'মোট পান। ভোরের ভুটভুটি প্যাসেঞ্জার ঠাসা। জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। ইঞ্জিনের শব্দ আর ভাটার জলের স্রোত। সূর্য এখনো ওঠেনি। ধোঁয়াশায় আবছা চরাচর। ঘাসে ধানগাছে শিশিরের মুক্তোদানা। জলের শব্দ মুকুন্দ শরীরের ভেতরেও বেজে চলছিল। জোয়ার এলে বুকটাও ফুলে উঠত খালের মতো। এখন শব্দ তুলে জল নেমে যাওয়ার দাগ! মহা রহস্য এক। সেই রহস্যের খোলসের ভেতর জড় সড় কুসুম। দু'জনে প্রায় কানে কানেই কথা বলে চলছিল থেমে থেমে। নিজেদের সমস্যা ঝামেলা সংসারের সুখ-দুঃখের কথা। রোগ আর ওষুধ — এ দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে জান কাহিল মুকুন্দর। চিথলা ফরসা আঙারি এক দিকে, অন্য দিকে রুসার হিন্ডন ব্রাইটস্ন হিণ্ডুসান। সারা বছর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। রোগের দাপটে পান চাষীর পাছার কাপড় মাথায় ওঠে। আবার ঘরে বৌ-বাচ্চার ঝক্কি। সন্ধ্যা আজ কত দিন শয্যাশায়ী। ছোটখোকার পেটের অসুখ। সবুজ ধান ক্ষেতে চোখ বসিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল মুকুন্দ। তারপর খালের জলে তাকিয়ে বুঝতে পারল কুসুমের প্রশ্নের উত্তর দিতে অযথা এত দেরি করে ফেলেছে! —সারবে আর কে? উদ্ধার করেই বারাতে হল। আর ডাল্লাগেনি মোর!

কুসুম যেন চমকে উঠে। ও কথা কয়োনি ঠাকুর, মা রাক করবেন। পূবে বাশুলীচকের মাথার ওপর উঁকি মারা লাল সূর্যের দিকে কুসুম তাকিয়েছিল — মায়ের তরেই তো এ গাঁয়ের লোক তমাকে সম্মান করে?

তা কুসুম বলেছে ঠিক। এই ঠাকুরের সেবায় তিন বিঘা জলজমি, কিছুটা কালাবাড়ি, পুকুর আর বাস্তু দিয়ে ব্রাহ্মণ এনে বসিয়েছিল পীতাম্বর বর্মণ। কমলপুরে বামুন বলতে একা মুকুন্দই। তিন পুরুষের বাস। এখন আর শুধু পিতৃ জেলে প্রতিষ্ঠিত মা সিংহবাহিনীর সেবাইত নয় মুকুন্দ সিংহটাল। মস্ত সংসার। বাবা হরিপদ শুরু করে গেছে কিছুটা। বাকি সব মুকুন্দর নিজের হাতে। এ দিক থেকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ কোথায় সে নিজেই জানে না! চাষ-বরোজ — গরু-বাছুর — নিত্যপূজা—বৌবাচ্চা! গৃহস্থের কত কাজ কত ঝামেলা। এই মায়ের জোরে আজ কী না পেয়েছে মুকুন্দ? মান-সম্মান-খাতির-জমি জোত ধন সম্পদ সবই। তবুও কি একটা চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় সারাক্ষণ। উঠতে বসতে শুতে ঘুমোতে শান্তি নেই। খোঁচা মারে মগজে। ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাইরে বেরোতে যজমানি ধুতির ওপর মোটা হাফসার্ট। তাও উল্টো হয়ে যায় পরতে গেলে। ধুতির পাড়ের কাছে ছেঁড়ার দিকে নজর পড়ে না। এতই ব্যস্ততা। লক্ষ্য কী মুকুন্দ জানে না।

খালের গড়িয়ে যাওয়া জলে ভুটভুটির এক টানা শব্দে একটা তাল ছিল। মুকুন্দ ঠায় তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সারা রাত জেগে পান করা গেছে। একটা উত্তেজনাও ছিল। নতুন বরোজের নতুন মাল। আড়াই কাঠা জমিতে আইমাল বসিয়েছিল আড়াই হাজার চারা। অনন্ত হাজলের পুকুর থেকে পাঁক পেয়েছে বিস্তর। তার ওপর খইল আর রাসায়নিক সার। আযাঢ়ে লাগানো চারা কার্তিকে প্রথম ফলন দিলো। বাজার কেমন হবে কে জানে! খরচে তো দম বেরিয়ে গেছে! প্রতি কাঠাতে প্যান্ডেল দিতে হাজার টাকা। এক কাহন খড়িই দেড়শো টাকা, পাকাটি চল্লিশ টাকা! তার ওপর গতর। 'রো'-এর মাঝখানে ইঁদুরের মতো বসে বসে হাত-পা কোমরের রগে টান ধরে। তা সত্ত্বেও চারবার তো মাটি দিতেই হয়েছে।

গতর প্রসঙ্গেই জ্বালার জায়গাটা খোঁচা খায়। সন্ধ্যার গতর! কলসী কলসী জল দিয়েছে বউটা। সেই মানুষ আজ ন'দিন শয্যাশায়ী। রক্তে শাড়ি সায়া বিছানা ভেজা। খোদামবাড়ির কিষ্ট বেরার ওষুধ ফেল। এখন ভরসা শহর। ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় কোথায় মুকুন্দের? কত দিন বাদে কেবল ব্যবসার তাগাদায় বেরোনো।

শক্তি নেই ভিন্ন কথা। কিন্তু এই অবস্থায় সন্ধ্যা বরোজের ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না। পাকা পানের মতো সাদা চামড়ার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে সারা রাত একাকেই পান করতে হল। মড়ার মতো পড়েছিল সন্ধ্যা।

অথচ সন্ধ্যা না হলে মুকুন্দ দাঁড় করাতেই পারত না বরোজটাকে। মাল তোলা তো দূরের কথা। শুধু বরোজ কেন, আজ সংসারের যা কিছু। পাকাটি খড়িকে ধরে যেমন বেড়ে উঠেছে পান। সন্ধ্যাকে ধরে মুকুন্দ আর মুকুন্দকে ধরে সন্ধ্যা আজ সংসারের এই বিশাল কারবার বাড়িয়েছে। যত্নে পরিচর্যা করতে হয় নরম কোমল পানের মেয়েমানুষ শরীরকে। না হলে রোগে ধরে। কিন্তু সন্ধ্যা! মুকুন্দর অবহেলাতেই কি বৌটার এই হাল?

মন খারাপ হয়ে গেল মুকুন্দর।

ভুটভুটি হলদিয়াগামী লেবার আর কদমতলা পুলের প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে বাশুলীচকের দিকে পুবমুখো এগিয়ে চলেছে খাল বেয়ে। কুসুম মাল নামাবে বাশুলীচকে। ওখানে হলদি নদীতে অন্য ভুটভুটি সেই মাল ওপারে হলদিয়ায় পৌঁছে দেবে। মুকুন্দ নেমে যাবে কদমতলা পুলে। সেখান থেকে বাসে করে তেরোপেখ্যা। তারপর নদী পেরিয়ে বাস ধরে মেচেদার আড়তে। সেখানে ব্যবসা হবে।

কিন্তু কুসুমের বাণিজ্যে তাকায় টাকা লাভ। টাকা যার আছে সুখ তো তারই। পাশে বসে থাকা কুসুমকে আড়চোখে একবার দেখে নেয় মুকুন্দ। একটু কাছ ঘেঁসে বসে। তারপর অজানতেই চমকে চার পাশ দেখে নেয়। না, মুকুন্দ ঠাকুর কারোর খেয়ালে নেই!

যেন মুকুন্দ পানের গায়ে দাগ বা গটি পচা বা পান পচার কথাই ভাবছিল। ওষুধের পর ওষুধ ঢেলে বরোজকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। শুচিতা বজায় রাখতে হয়। কমনীয়তা নমনীয়তাকে ইজ্জত দেখাতে হয়। নরম তুলতুলে শরীর বরোজের — একটু ছোঁয়া বা অনাচারে যে ভড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে।

সন্ধ্যা বলেছিল, কাজ সেরেই চলে আসবে — মোর হাল বেদম খারাপ — আর কোথাও যেওনি কিন্তু!

কোথায় আর যাবে মুকুন্দ? কমলপুর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। পশ্চিমে নিজের দেশটা দেখবার সৌভাগ্যও তার হলনি এখনো।

সাত পাঁচ কত কথা যে মনে আসে চুপচাপ বসে থাকলে। লোকে তো কেবল লাভ আর পয়সাই দেখে। যেমন কুসুম। বলে কি, ঠাকুর তুমি তো ইবার লালে লাল!

— ঠাকুর ভাবো কী?

— চায়ের কথা। ছোটখোকার কথা। বৌটার কথা — দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কুসুম। — তোমরা বেশ সুখেই আছ —

— তুমি আর কমটা কিসে? একটু শ্লেষ যেন ছিল মুকুন্দর গলায়।

হ্যাঁকা খেয়ে কুসুম বলে, ক্যান? তোমার আবার কী? স্ত্রী-পুত্র, ক্ষেতে ধান, বরোজে পান, মাছ, দুধ — বামুন মানুষ — মান সম্মান!

বারবার মান সম্মান আর জাতের প্রসঙ্গ তোলায় হয়তো ভড়িত ছিল কুসুমের, খোঁচা কিংবা ঈর্ষাও। তবু গুরুত্ব না দিয়ে মুকুন্দ বলে, ও সব কথা রাখো কুসুম, তমার ব্যবসায় টাকায় টাকা লাভ। আর সংসার? সুখ নাই — আমেলা আছে ষোলো ছটাক। কী আছে সংসারে? তমার নাই, তুমি বুঝনি — থামে মুকুন্দ। আরো কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল রাগের জ্বালায়। কিন্তু এটা তার ঠিক হয়নি। মানুষের দুর্বল জায়গায় ঘা দেওয়া কি মানুষের কাজ?

— তা কইতিছ ঠিক ঠাকুর। কিন্তু— কথা না শেষ করেই কুসুম একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার মনের কথাগুলোকে আড়াল করতে চায়। মুকুন্দ সে সব বুঝতে পারে। কুসুমের কথা ভেবে নিজের আজ কেমন কেমন লাগে সব কিছু। অথচ তার কারণ ঠাওরে উঠতে পারে না।

এ সুযোগে যাত্রীদের চোখের আড়ালে মুকুন্দ আরো কিছুটা সরে যায় কুসুমের দিকে। আড়চোখে কুসুম তা দেখে নিয়ে বরং আরো বেশি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিসফিসিয়ে বলে, বড়লোকদের ভদ্রলোকদের মোর দিবার কী আছে বল দিকিন ঠাকুর? তুমি তো জ্ঞানী-গুণী — কত বড়লোক।

তা ঠিক। মুকুন্দর বংশের সুখ্যাতি আছে। চাটুজ্জে রাঢ়ী বামুনকে মহিষাদলের রাজারা সিংহবাহিনীর সেবাইত হিসেবে সিংহটাল পদবী দিয়েছিল। সে বেশ কয়েক পুরুষ আগের কথা। মুকুন্দর ঠাকুরদার বাবা কবরেজী শিখে চলে গিয়েছিল পশ্চিমে। সেখানে ঠাকুরদার বড় ভাই এবং তার বংশধরেরা এখনো সেই ব্যবসা চালাচ্ছে। ঠাকুরদা চলে এসেছিল পীতাম্বর বর্মণের আমন্ত্রণ পেয়ে। সুতরাং বড় ঘর বা ভদ্রলোকের সংজ্ঞা মুকুন্দর জানা। এ গ্রামে ভদ্রলোক

বলতে গেলে মুকুন্দ তো একাই। আর সব জেলে বর্মণেরা — মণ্ডল হাল্ডল নবশূদ্ররা। কিন্তু বড়লোকের সংজ্ঞাটা মুকুন্দর জানা নেই। পয়সা থাকলে বড়লোক। সেই হিসেবে তার চেয়ে একশো গুণ বেশি পয়সা কুসুমের। তবুও কুসুম এ কথা বলে কেন? কুসুমের অতর্কিত অপ্রাসঙ্গিক কথায় থতমত খেয়ে গিয়ে কোনোক্রমে নিজেকে সামলিয়ে নিল মুকুন্দ। কী? কয়ে দও — আন্দাজ করতে পারতিছিনি—

মুকুন্দর ঘুমে কাতর চোখ-জোড়ার ওপর অপর দুটো চোখে সাপের খেলা! — ভোট আর গতর। এই তো মাথার উপর থিকে ছাউনিটাও গেল!

ছাউনি আজ যায়নি। ন'বছর আগে গোকুল হাল্ডল মরে যাওয়ায় তার বিধবা কুসুমের মাথায় এখন পুরুষ মানুষ নেই। তবুও ও এখনো বলে একই কথা।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মুকুন্দ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।— মোকেও কি তাই ভাব? ওসব কথা তুলো কেন তুমি?

—ফিরতিছ কখন?

—দেখি, এই তো যাব। তমলুকে কাজও সারব কিছু। কত দিন ঘরের বাইরে পা দিইনি!

— তবে রাত হবে কও?

— ক্যানে? দরকার আছে যদি বল—

— হুঁ। আইস ত একটিবার রাতে। তবে তুমি যদি আসতে চাও। একটা দরকার ছিল।

কুসুমের দরকার এর আগে অমন বহুবার ছিল। পাশাপাশি বসে বিড়ি ফুঁকা আর সময় গড়ানো। মুকুন্দ তাই বলে, দেখি—

কদমতলা পুলে ভুটভুটি দাঁড়ালে মুকুন্দ নেমে গেল। সঙ্গে আরো অনেক বাসযাত্রী। কেউ যাবে দক্ষিণে নন্দীগ্রাম। কেউ উত্তরে তেরপেখ্যা। বাকি জনা পনেরো লেবার আর কুসুমকে নিয়ে পোলের তলা দিয়ে ভুটভুটি এগিয়ে গেল পুবে।

খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তি লুকিয়ে মুকুন্দ ঘাড় ঝোঁকালো খুশি খুশি মুখে। বিড়িতে সুখটান দিয়ে একটা কষ্টও অনুভব করল কুসুমের সুখের কথা ভেবে।

তারপর বাসের দুলুনিতে রাতের ঘুমগুলো দিনের আলোয় পেয়ে বসল। গোকুল কুসুম সন্ধ্যা অসুস্থ ছোটখোকা — সব এক একটা আলোর ফুলকি হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকল।

আচমকা জেগে ওঠে মুকুন্দ। তেরোপেখ্যা থেকে আসা নন্দীগ্রামগামী এক প্যাসেঞ্জার ভর্তি অটোরিক্সাকে সাইড দিতে গিয়ে মুখোমুখি ব্রেক কষেছে বাস। অটো বাবলাগাছের জঙ্গল ঘেঁসে ফুরুৎ করে বেরিয়ে গেল। তখনই ঢেকুরের মতো বেরিয়ে এলো একটু বাতাস।— কুসুম!

মুকুন্দ ছাড়তে চাইলেও গোকুল-কুসুম ছেড়ে গেল না। এ বড় মুশকিলের কথা। বন্ধু গোকুল তো মরে ভূত! তবে আর অত কথার কী? অমন করলে সংসারী মুকুন্দর সংসারের হাল ধরবে কে? গৃহস্থালী সামাল দেবে কে? মা সিংহবাহিনীর সেবা করবে কে? পান বরোজের যত্ন করবে কে?

টানা বসে বসে মুকুন্দর কোমর ধরে গেছে। একার হাতে পান করা — গোছানো — সাজানো — গটি করা — শ'য়ে শ'য়ের হিসেব ধরে দশ হাজারের মোট করা। তারপর অন্ধকার থেকে সংসার গুছিয়ে, মা সিংহবাহিনীর সেবা করে এই যাত্রা। বাংলার সওদাগরের যাত্রা! কুসুমের বকবকানি। কুসুমই আছে ভালো। মুকুন্দও বসাবে একবার? না, কুসুমকে দিয়েই কাজ সারবে?

এখন আর বাস ব্রেক কষে না। তবুও চমকে ওঠে মুকুন্দ! মা সিংহবাহিনীর সেবাইত। পঞ্চাৎকে বাদ দিলে গোটা গ্রামের মাথা!

প্যাঁচের মতো জড়িয়ে পেঁচিয়ে কোনো একটা ফন্দি কি সত্যিই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে মুকুন্দকে?

না। তার এখন ঘুম পেয়েছে। তার ওপর কিছুটা দৌড়ে ভুটভুটিতে নদী পেরিয়ে ওপারের বাসে সীট ধরতে হবে।

পান করা আর মদ মারা — এ দুই নিয়ে কমলপুরা।

যে কোনো মানুষের মুখে এই একই কথা। নদী খাল জোয়ারভাটা জলা বাবলাগাছ ধানক্ষেত আর অফুরন্ত সবুজ গাছ নিয়ে এই এলাকা। গায়ে লাগা কমলপুর খোদামবাড়ি আমড়াতলা আমদাবাদ। কমলপুরে জেলে আর নবশূদ্রদের বাস। আগে ছিল জঙ্গল আর বাঘের ডেরা। এখন সে সব নেই। জেলেরা মাছ মারা ছাড়াও ধানচাষ আর বরোজ নিয়ে ব্যস্ত। গ্রামে খেতে না পাওয়া মানুষ সংখ্যায় আজ নেহাৎ কম। সে কেবল মদ মারার দৌলতে। তখনো মদ মারা চালু হয়নি গ্রামে। মুকুন্দর বউ সন্ধ্যার কথায় ''পাপ ঢুকেনি গ্রামে''। অবস্থাসম্পন্ন পীতু বর্মণ পুণ্যের জন্য বামুন এনে বসিয়েছিল গ্রামে। গাছ পুকুর আর সিংহবাহিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষ মুকুন্দ দেবতার মতো জায়গা পায় আজও। বামুন ঠাকুর আর বামুন গিন্নির ছায়া তখনও মাড়ায় না গ্রামের মানুষেরা। হতে পারে পঞ্চায়েৎ লীডার বা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার। নিয়ম সকলের জন্য একই।

কমলপুর বদলে গেল দেখতে দেখতে। এখন আর মানুষ আটা-ঘাটা বা কড়াইতে সেঁকে নেওয়া নুনা চিংড়ি খেয়ে কলেরায় মরে না। মদ মেরে সকলেই সম্পন্ন। যারা তাও করে না, তারা হলদিয়ার লেবার। মদ মারারা সবাই কুসুমকে সমঝে চলে। যারা মদ মারা নয়, তারা ট্যারা চোখে এদের দেখে, পেছনে নিন্দা করে, প্রয়োজনে হেসে কাছে আসে। এ ধর্ম মানুষের। মুকুন্দ তাই কাউকেই দোষ দেয় না।

মদ মারা একটি অপকর্ম্ম। তবে এ নিয়ে কেউ ট্যাঁ-ফোঁ করে না। পক্ষাৎ চুপচাপ থাকে। কারণ এতগুলি মানুষের পেছনে গেলে ভোট না পেয়ে স্বপ্নে যেতে চায় না। পরের বার তাহলে কুসুমের কথায় কোন নবশূদ্রই ভোট দেবে না।

আবগারি আর থানার জন্য মাসকাবারি বন্দোবস্ত আছে। হেঁড়িয়ার আবগারি অফিস থেকে কাঁচা রাস্তায় পনেরো মাইল জিপ ছুটিয়ে উত্তরে রেয়াপাড়া। তারপর পূবে নুনা খালপাড়ে কমলপুর দু'মাইল। বয়েই গেছে অফিসারদের ওসব ঝুট ঝামেলায়। তাও মাঝে মধ্যে হামলা হয়। জানান দিয়েই হয়। তখন পুলিশ আর অফিসারেরা পকেট ভর্তি করে ফিরে যায়। কত আর খাবে পুলিশ? এ ব্যবসায় টাকাতে টাকা লাভ না!

ছাব্বিশ-আঠাশ কেজি চিটেগুড়ের টিনের দাম নব্বই পঁচানব্বই টাকা। এ গ্রামে চিটে সাপ্লাই দিয়েই কত বেকার ফড়ে হপ্তায় পাঁচশ টাকা কামায়। সেই চিটে আট ভাগ করে আটটি কলসীতে রেখে 'পাওডার' মেশাতে হয়। তখন ভুটভুটি শব্দে গেঁজিয়ে ওঠার পালা ছ'সাত দিন ধরে। ভুট কমে গেলেই আগুনে মদ মারা। এক টিন চিটে থেকে প্রায় চল্লিশ লিটার মদ। পাইকারি রেটেই তো প্রতি পাঁচ লিটারের ব্লাডার ছত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা।

খাবে কে? হলদি নদীর ওপারে হলদিয়া বন্দর শহর। দিনে দিনে তার এলাকা বাড়ছে, বসতি বাড়ছে। দিনে দিনে কমলপুরের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাড়ছে।

আবছা কুয়াশার আস্তরণের মতো চাপা নিঃসঙ্গতার ওপর ভুটভুটিতে কুসুমের জড়-সড় বসে থাকার দৃশ্যটি মুকুন্দর অস্তিত্বকে ঘিরে ধরে নাড়া-চাড়া করতে থাকল এতক্ষণ পর্যন্ত। কেন তার কোনও কারণ জানা নেই। মুকুন্দ ভেবে কূলিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু কুসুমের ঐ যে ডাকাটি— ঠাকুর যদি পারো রাত্তিরে একটি বার আস—

সূর্য ডুবে গেছে। ক্লান্তির মতো মৃদু আলোর রেশ মানুষকে চিনিয়ে দেয় মানুষের চোখে। ব্যস্ত মানুষের ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। ঘরের জন্য উৎকণ্ঠা উদ্বেগ দুশ্চিন্তা।

মুকুন্দর ভাবনা সন্ধ্যা আর ছোটখোকা উভয়ের জন্য। ব্যবসায় তেমন লাভ হয়নি। পানের বিস্তর আমদানি গেল আজ। ভাটার নদীর কাদা জলে হাঁটু ডুবিয়ে এগিয়ে গিয়ে ভুট ভুটি ধরতে হয়। এ পারে পৌঁছেই মুকুন্দ শুনতে পেল শহীদ মাতঙ্গিনীর ফার্স্ট হুইসিল। নন্দীগ্রামগামী বাস। সীট পাওয়া গেল না আর।

রডে পাছা ঠেকিয়ে কিছুটা আরাম করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মুকুন্দ। তার পেশীবহুল টাইট চামড়া বেঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারার অস্তিত্ব জানান দেয়। ওদিকে আর একটা হাড্ডিসার ঠেলা মারছে। রস পেয়ে জেঁকে থাকলেও পায়ের লোম কুটকুট করছে নদীর লোনা জল শুকিয় গিয়ে।

কদমতলা পুলে নামলে অন্ধকার ঘাড়ের ওপর হাঁকিয়ে বসল। হলদিয়ার গ্যাস পোড়ানো আলোর মশাল পুব আকাশে। রেয়াপাড়াগামী জানার ভুটভুটি মাতঙ্গিনীর প্যাসেঞ্জার ধরতে দাঁড়িয়েছিল। কোনক্রমে উঠে পড়ল মুকুন্দ।

কমলপুরে কাঠের পুলের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকলে মুকুন্দ দেখলো সাদা কাপড় পরা কে এক জন এগিয়ে চলেছে। মুকুন্দ চেঁচায়, —কে?

—মোকে ছুঁতে পারবে খুড়া?

চমকে ওঠে মুকুন্দ। এ যে গোকুলের গলা!

মাথার ওপর তেঁতুলগাছ শিরীষ গাছের ডাল। দু'দিকে পান বরোজ। গা ছম ছম করে। ওটা গোকুলের ভূত!

নিজের পৈতায় হাত ছুঁয়ে রাখলে মুকুন্দ বুঝতে পারে, গোকুলের ভূত ঠিক একই দূরত্বে এগিয়ে। তারপর মায়ের থান পেরিয়ে মুকুন্দরই মিঠা পান বরোজটায় ঢুকে গেল। পান বরোজে দেবতা আর ভূতেরা থাকে।

এখন মনে পড়ল কুসুমের কথা। ডেকেছিল। একে বারে ঘুরে এসেই ঘরে ঢুকবে মুকুন্দ।

কুসুম বলে, — খোকাটা আছে কেমন?

—এখনো ঘর ঢুকিনি, তোমার কথা সারি আগে—

—সে কি? না ঠাকুর—ঘর যাও। মোর আর কী কথা? এমনিই—কে যেন কইল, বামুনগিন্নির শরীরটা বেজায় খারাপ!

এ কি খেলা কুসুমের? বিস্মিত মুকুন্দর রাগও হয়। তার চেয়েও বড় কথা, সন্ধ্যার কি তবে বাড়াবাড়ি?

এখন সে অন্ধকারে পড়িমরি দৌড়াতে থাকে। সত্যিই বাড়াবাড়ি সন্ধ্যার।

মাদুরের ওপর কাঁথা বিছানো। তার ওপর ডাঁই করা এক কাঁড়ি পাকা পান। আবছা অন্ধকারে ঘোর কাটতেই মুকুন্দ বুঝতে পারল শুয়ে আছে সন্ধ্যা। গুজি হাঁড়োলের বউয়ের কোলে ছোটখোকা কাঁদছে। সন্ধ্যা যেন এই মাত্র রক্ত থেকে ডুব দিয়ে উঠে এল। রক্তহীন শরীরে কোথায় ছিল এত রক্ত?

শুনল সব এলোমেলো। প্রতিবেশীদের কথাগুলো এককান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুপুর থেকেই এই যায় সেই যায় অবস্থা। সবাই মুকুন্দর অপেক্ষায়। রাত পুয়ালেই জেলা শহর না হলে অন্তত তমলুক তো নিয়ে যেতেই হবে।

ডাক্তার দেখে ওষুধ দিয়ে গেছে আপাতত। রাম হাস্তলের বেটা। কিছু দিন নন্দীগ্রামে এক ডাক্তারের কাছে থেকে, ওষুধ চুরির দায়ে বিতাড়িত হয়ে এখন কমলপুরের ডাক্তার। মাধ্যমিক ফেল। তারই ওষুধ চলছে।

চোখ খোলে সন্ধ্যা। ভূতের মতো চি চি শব্দ করে।

—কে?

—আমি। মুকুন্দ সন্ধ্যার চোখের কাছে মুখ নিয়ে যায়।

—তুমি আসস?

—হ্যাঁ—

—মোকে একটু মায়ের ফুল দও — ঠাকুর ঘরটা খুলে—নিহাৎ সময় নাই তাই — না-হলে এ অবস্থায় কি মায়ের ফুল ছুঁতে আছে?

পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই খালের ধারে পোড়ানো শেষ হয়ে গেল সন্ধ্যাকে।

কুসুম বলল, একা হয়ে গেলে ঠাকুর।

মুকুন্দর মাথা শূন্য। সব কেমন ফাঁকা। গিন্নি গেলে আর ঘরের থাকে কী? রাগ হল কুসুমের ওপর। অমঙ্গলের পাপের একটা জ্যান্ত স্তূপ ঐ গোকুল হাঁড়োলের বিধবা! ওর স্পর্শেই গোকুলটা মরেও মুক্তি পায় নি। ওর স্পর্শেই পাপ লাগল মুকুন্দর দেহে — সন্ধ্যা মরে গেল। এর পর পান বরোজগুলো যাবে একে একে।

সাত জনের সাত কথা এখন মুকুন্দর কানের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে পড়ে যেতে থাকে।

কুসুম বলে, ঠাকুর ভাব কী? তুমি বামুন গিন্নির কাজ ভালো করে কর। সমস্ত পয়সা মোর। পয়সা খাবে কে? বামুনগিন্নি স্বপ্নে গেলে মোর পুণ্য হবে। চারটা গ্রামের সব লোক খাবে। সমস্ত কাঙালি পাত পেতে খাবে। যাঁড় ছাড়া হবে।

বড্ড স্পষ্ট আর অহংকারি কণ্ঠস্বর কুসুমের। —কে, ঠাকুর? আসো, কপাট খুলা আছে—

মুকুন্দর পায়ে জড়তা ছিল। কিন্তু এড়িয়ে চলতে দশবার ইচ্ছে হলেও বারোবার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছে মুকুন্দ। নুনা খালের জোয়ার ভাঁটার মতো কোনো অনিবার্য এবং অদৃশ্য শক্তিতে যেন সে আজকাল ঘোরের ভেতর টলতে টলতে দিন কাটায়, রাত কাবার করে। কেমন একটা ধোঁয়াটে ইচ্ছে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। সন্ধ্যার কথা মনে হলে ফাঁকা মনে হয় সব কিছু। অনেক কিছু ছিল, এখন কিছু নেই। প্রত্যেকটি জিনিসে সন্ধ্যার যত্নের স্পর্শ।

মুকুন্দ দাঁড়িয়েছিল অন্ধকার উঠোনে। কেন তা সে নিজেই জানে না। হয়তো ইচ্ছেই ছিল না কোনও এখানে আসবার। বাচ্চার বিস্কুট বা টর্চের ব্যাটারি কিনতে বেরিয়ে দোকানে না গিয়ে এখানেই চলে এসেছে পায়ে পায়ে। মানুষ যে কখনও এমন গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেতে পারে, তা কি জানা ছিল মুকুন্দর?

—ছোটখোকা আছে কেমন?

মুকুন্দর বড় খোকা বছর পাঁচেকের বয়স নিয়ে জলে ডুবে মারা গেছে। সে আজ তিন বছর আগের কথা। দ্বিতীয় সন্তান গোপাল এখন একমাত্র সন্তান চার বছর বয়সের। ছোটখোকা হিসেবেই সে পরিচিত। তারই কথা জিজ্ঞেস করে এই ভাবে কথা শুরু করে কুসুম।

মুকুন্দ বলে, আর কোয়োনি। একটা শিশি পুরা ওষুধ খায়ে ফেলেছে দুয়্রে। মুই হাতের কাজ সারতেছিলি। রাম হাঁড়োলের ব্যাটা বাদল ফের দরে আসে ওষুধ দিয়ে গেল অ্যাককান কাটাইতে।

এ সব কথা যখন বলছিল মুকুন্দ, তখন সে ছিল পুরোপুরি অন্যমনস্ক। তাই নিজেরই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল। কেন কুসুমকে বলতে গেল এই সব এত কথা? দেওয়ালে কুসুমের ছায়া যেন অমঙ্গলের ঘূর্ণি তুলে অট্টহাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে। আলো আঁধারিতে কী একটা রহস্য জমাট বেঁধে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। চোলাই মদের বোটকা গন্ধ চত্বর জুড়ে। মুরগীর গুয়ের গন্ধ সাক্ষাৎ এই নরকে বসে ছটফট করতে থাকে মুকুন্দ—হঠাৎ।

কেন এমন হয়? সত্যিই কি মা সিংহবাহিনীর কোপ পড়েছে তার ওপর? না হলে কেন কাল-পেঁচার টেকুর তোলা ওক্-ওক্ শব্দ বুকের ভেতর বেজে চলেছে একটানা? কেন মনে হয় হাজার হাজার বছরের পুরোনো এই শব্দ? ব্রাহ্মণ মুকুন্দর শিশু সন্তান হাঁড়োলপাড়ায় ঘুরে ঘুরে বড় হচ্ছে কেন? কেন গুজি হাঁড়োলের বউ ছোটখোকাকে ভুলোতে ভুলোতে যেন মুকুন্দর কানে কানেই বলে, একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে দেন ঠাকুর, মায়ের কোপ পড়েছে আপনার উপর। এ যে বড় অনাসৃষ্টি!

এ আবার কী কথা? কিসের ইঙ্গিত দেয় গুজির বউ? ভীতু মানুষের মতো মুকুন্দ এখন সেই সব মনে করে এই রহস্যের ভেতর ঘন ঘন শিউরে ওঠে। আড়াই হাত দূরে কুসুম বসে বিড়ি বাঁধছে মুকুন্দর জন্য। বিড়ির মসলার কুলোর ছায়া লম্বা সরু হয়ে দেওয়াল ছুঁয়েছে।

—বিপদের ভয় নাই ত?

কুসুমের চোখ যেন কোনও শব্দ শুনে বাইরে অন্ধকারে কিছু খুঁজতে থাকে। কিছু নেই জেনেও। অদ্ভুত এই শারীরিক ভঙ্গি।

—না না। এখন তো ঘুমাইতিছে। মশারি খাঁটে দিয়ে একটু ঘরতে আইলি। তমার টাকাগুলা দিতে পারতিছিনি।

—তার জন্য আমি কি মরে যাতিছি? লও ধর— বিড়ি এগিয়ে ধরেছে কুসুম। কুসুম নয়, এক জীবন্ত রহস্য। কে এই কুসুম? কুসুম তুই কে?

মুকুন্দর বিড়ির ধোঁয়ায় ভারি বাতাস ভারি হয়। অন্ধকার ঘন হয়। কুসুম যেন বেশ কিছুটাই এগিয়ে এসেছে। সম্ভবত মুকুন্দর প্রায় গা ঘেঁসেই বসেছে। অথচ বামুন মানুষকে ছোঁবে না বলে বিড়িটা রেখে দিয়েছিল মাটিতেই।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে এবার কুসুম যেন চিমটি কাটে মুকুন্দর গায়ে। —মোর ভয় করে।

—কেন? কিসের ভয়?

—এই যে তুমি? বামুন মানুষ —মোদের সাথে এত উঠা বসা— লোকের চোখ মুখ দেখলে বুঝতে পারি — সব কি আর কয়ে দিতে হয়?

—কেন? সে কি আজ? গোকুল আমার বন্ধু ছিল, কে জানে নি?

—সে কি এখন আছে?

গম্ভীর গলা কুসুমের। গাম্ভীর্যে চোখ-জোড়া ভারি হয়ে লাল হয়ে ঝুলে পড়েছে। অদ্ভুত গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে সেখান থেকে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা নৈঃশব্দ্য। খেজুরের রসের মতো। রসের ভাণ্ড পূর্ণ হবে এভাবেই। এই স্তব্ধতা পরস্পর দুই নারী পুরুষের সঙ্গে দালালের এক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

কুসুমই মুখ ফোটাল। —তমার জন্য বেদম কষ্ট হয় মোর।

—কেন? মুকুন্দ তার ছোট্ট জিজ্ঞাসায় যেন অবোধ শিশু।

—একা হয়ে গেলে।

—কেন, তুমি তো আছো—

—না, আমি আর কী? ছোট কাজ করি—মদ মারি। লোকে ট্যারা চোখে দেখে — পাঁচ জনের সাথে মিলি— মান-সম্মান আর কী আছে মোর? সে কথা নয় গো, আসলে কী কইতিছি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ— বামুন গিন্নি—

মুকুন্দ চুপচাপ বসেই ছিল নিচের দিকে মুখ করে।

কুসুম দম নিয়ে বলে, ঠাকুর? ভাব কী?

—ভাবতিছি, আমো মদ মারব। বলেই চমকে উঠল মুকুন্দ। এ কী কথা তার মুখে? আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, না গো আসি, রাত হল—

ততক্ষণে দরজার বাইরে সে। উঠোন ডিঙোয় অন্ধকারে। যেন মুকুন্দর পেছনে ছড়িয়ে আছে কুসুমের প্যাঁচের হাসি। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখতে থাকে। না। কিছু না। কেবল চিটেগুড়ের মতো কদর্য-অন্ধকার!

শিশু আপন মনে খেলতে থাকে উঠোনে। কত বস্তু কত সামগ্রী তার। খেলতে খেলতে কাঁদে কখনো। কাঁদতে কাঁদতেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলে বাবাকে খোঁজে। না পেলে আবার খেলে। মুকুন্দ বুঝতে পারে সব কিছু। সেই রহস্য দেখবার সময় নেই তার। কাজের ফাঁকে নৈমিত্তিক কিছু পরিচর্যা ছাড়া।

বরং অন্তরের গহন অন্ধকারে বারবার কিছু একটা যেন ডোবে আর ওঠে। একটা গন্ধ, একটা জ্বালা গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করে। দুই রো-এর মাঝে বসে মুকুন্দ পান করে, কিংবা গাছের গোড়ায় মাটি দেয়। পানের পাতার ওপর ছড়িয়ে পড়ে আলোর কত রূপ। বাধা পেয়ে ধাক্কা খেয়ে ছাউনি ডিঙিয়ে গাছে গাছে ঘসা খেয়ে পৌঁছে গেছে এখানে। কেমন একটা মাদকতা — সবুজের সমারোহ। পানের বরোজ — তার সংস্কার — নিয়ম — রহস্যময়তা — কেমন নমনীয় শরীরের আকর্ষণ — সন্ধ্যার বিদেহী আত্মার উপস্থিতি — দেবভূমির ঐশ্বর্য — এ সবের সঙ্গে নিজের মগজের ভেতরের সেই ঘোরটা মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। তখন চাষ আর চাষীকে আলাদা করা যায় না।

পানের ভেতর হারিয়ে গেছে মুকুন্দ। বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কোনো প্রয়োজনে হয়তো কুসুম ডাকে, ঠাকুর কর কী?

নিশ্চয়ই শুনতে পায় না মুকুন্দ। কুসুমও তাকে খুঁজে পায় না। সে তখন মুকুন্দর ঘর দেখে। শিশুটির কাছে গিয়ে কোলে তুলে নেয়। কিছু খাইয়ে দেয় বা স্নান করিয়ে দেয়। আর অবাক হয়ে পুরুষ মানুষের একার গেরস্থালী দেখে — সবই অগোছালো।

কুসুম বারান্দায় জড়ো করা পানগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে যত্নে পান করে।

তেঁতুল গাছের আড়ালে গোবর ভর্তি হাতে দাঁড়িয়ে বা ছাগলটাকে টানতে টানতে মাঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় গুজি হাঁড়োলের বউ এ সব দেখে মুখ বাঁকায়। রাতে গুজি জন খেটে ফিরে এলে এসব অনাসৃষ্টি নিয়ে আলোচনা হয়। অথচ কোন এক রহস্যে সেই সব ফিস্‌ফিসানি ছেঁড়া মাদুর

চাটাই ও মাটির ওই চার দেওয়ালেই বন্দী থাকে। কানে কানে কমলপুর জাগতে চাইলেও জাগে না।

বরোজের বাইরে বেরিয়ে এসে কুসুমের ঐ সব কারবার দেখেও দেখে না মুকুন্দ। অথচ সেই মুকুন্দ রাতের অন্ধাকারে শিশু ঘুমিয়ে পড়লে পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হয় কুসুমের উঠোনে। তারপর না জানিয়েই সটান নিভু নিভু আলোর রহস্যঘেরা ঘরে। যেখানে বিছানায় নিশ্চয়ই ক্লান্ত কুসুম এই একটু আগে শুয়ে পড়েছে!

প্রথমটায় কিছুক্ষণ কোনও কথাই হয়ত হয় না। তারপর মুকুন্দ নিজেই বিড়ির কুলোটা টেনে বিড়ি বাঁধে। এগিয়ে ধরে কুসুমের দিকে।

বিড়ি ঠিক নিয়ে কুসুম। অথচ অযথা দেরি করে ধরাতে। কেন কে জানে! অবাক হয় মুকুন্দ। ইদানীং মাঝে মধ্যেই গিয়ে তার নিজস্ব সংসারের বেশ কিছু খুঁটিনাটি কাজ যে কুসুম সেরে দিয়ে আসে তা কি আর জানে না মুকুন্দ?

কুসুম ভাবে, এ কেমন মানুষ? একটু আধটু কৃতজ্ঞতাবোধও কি নেই পুরুষের?

এরই ফাঁক দিয়ে রাত অন্ধকার ঘাম শীত বর্ষা তাদের নিয়মে আসে যায়। একটা চাঁদ আকাশে উঠলে রাত গড়িয়ে গড়িয়ে বাড়তে থাকে গায়ের ওপর দিয়ে। চোখের ওপর দিয়ে। চাঁদের গায়ে — ফরসা সন্ধ্যার গায়ে—তিলের মতো বসে থাকে কালো কুসুম। কুসুম হাসে। হাসির রঙ নীল। চাঁদের নীল আলো। ঈশ্বরের আশীর্বাদের শব্দ বয়ে বেড়ায় বাতাস। মুকুন্দ আজকাল স্পষ্ট সে সব শুনতে পায়। হিমের গন্ধ পায়। আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পায় চাঁদের কলঙ্ক। কলঙ্ক আছে বলেই তো চাঁদ সুন্দর। কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে থেকে অবাক হয়ে বলে, বল দিকিন কুসুম, কুন কুন মাইনষের মরে গেলে মুক্তি নাই?

মদ না জিবে ছুঁলেও নিজেকে মাতাল মনে হয় কুসুমের। সেই ভাব বাইরে বেরোয়। গাল ঝুলে পড়ে—চোখ ভারি হয়—মাথা ফাঁকা হয়ে যায়। ওই গূঢ় প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজেই চলে। কিন্তু জানা নেই কোন উত্তর। কুসুম কেবল হাসে। হাসলে থলথলে শরীর কাঁপে। ঠাকুরটা হয়ত বৌয়ের শোকে পাগলই হয়ে গেছে।

মুকুন্দর চোখে-চেতনায় বড্ড বিকৃত আর অশ্লীল ওই হাসি। সে দিকে পেছন ফিরে সে বাঁশ ঝাড়ে সাদা ভূত দেখে। গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারে বন্ধু গোকুলের ভূত ওটা। গোকুল পাহারা দিচ্ছে আঁটকুড়ি বিধবা কুসুমকে? কুসুমকে না জগৎকে? জগৎকে না সময়কে না মুকুন্দকে?

পুকুর-ঘাটে নেমে পিছোল কাঠের ওপর বসে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে মায়ের মন্দিরে বসে মুকুন্দ। এ তার বিশ্বাস। তার জীবন ছড়িয়ে পড়েছে এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। সুতরাং জীবনকে শ্রদ্ধা করে মুকুন্দ। মানুষের জীবনকে। সেই অস্থিরতাটা কেটে গিয়ে নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস এখন তার। চোখ বন্ধ — হাত জোড়া — কানের দেহের চারপাশে মশাদের গান। অশখ্ত অবসরের এই সময়ে কান পেতে জীবনের সুরটাকে ধরতে ভালো লাগে। নতুন রাগ তৈরি হয়। মন রে আত্মতত্ত্ব না জানিলে সাধন হবে না। নিজস্ব সংস্কার থেকেই যা উজিয়ে আসে। মুকুন্দ ঠোটের মাথায় বুদ-বুদ তোলে: ক্ষমা ঘিন্না করে দিও মা — যদি কুনো দোষ করি — গোকুলটাকে আমি বিস্তর ভালোবাসতাম — শ্রদ্ধা করতাম — পঞ্চাৎ হিসাবে ওর যে নাম ছিল খুব। মানুষ না ভালোবাসলে কি কারোর নাম হয়? তুমিই বল—

প্রদীপের আলোয় মায়ের বরাভয় মূর্তির ছায়া পড়েছে পেছনের সাদা দেওয়ালে। বাতাসে কাঁপছে সেই ছায়া। গোকুলের বাকি কাজ আমি কতটা সারতে পারব মরবার পূর্বে? রাতে মুকুন্দর ভালো ঘুম হয়। অনেক দিন বাদে এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মুকুন্দ বারান্দায় বেঞ্চে বসেছিল। এরই মধ্যে মানুষ সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে যার মতো। পুব দিকে সবে উঁকি দিয়েছে সূর্য। শীত পড়ছে। গায়ের চামড়ার ওপর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। শিউরে উঠল মুকুন্দ। আগের দিন রাতে ঘুমের মধ্যেই এই রহস্যের জালটা ছিঁড়তে পেরেছে। এখানকার এইসব মানুষদের সঙ্গে প্রতি-নিয়ত উঠা বসা করেও, এদের সঙ্গে এদেরই মতো বেড়ে উঠেও কোন একটা ফাঁক বেশ থেকে যাচ্ছিল। সব কিছুতে থেকেও কাছে না পাওয়ার এই জ্বালাই এতদিন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঘুম বড় আরামের জায়গা। সেখানেই আবিষ্কার করা যায় যা কিছু সত্য। যে সত্য জীবনের মতো বা মৃত্যুর মতো অমোঘ। কে এমন মহা দিব্যি দিয়ে এই মাটিতে পাঠিয়ে তাকে বলে দিয়েছে, তুমি একটি ঘরের এক জন হয়ে থেকো।

একটা একরোখা জেদ পেয়ে বসলে মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল এক সময়। যা হয় হোক। নিজের ইচ্ছা ও বিশ্বাসই সব। সেখানে অটল থাকতে জানলেই ভারতীয় স্বর্গে পৌঁছুতে কষ্ট করতে হয় না। মুকুন্দ প্রতিজ্ঞা করল। চোখ চোয়াল গায়ের পেশী শক্ত ও স্থির হয়ে গেল মুহূর্তেই। পাগলের মতো চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল শিশু সন্তানের দিকে।

হলুদ ধানে ধানে মাঠ ভরে গেছে। মাছমারারা জাল কাঁধে খালুই হাতে এগিয়ে চলেছে ভাটার খালের দিকে। পান- করারা ঝুড়ি নিয়ে বরোজে ঢুকছে। চারপাশে সম্পদ।

ঘোরের ভেতর যেন টলতে টলতে ভারবাহী জন্তুর মতো, কুসুম বলে, কী চাও মোর থিকে?

মুকুন্দ বলেছিল, একটা জিনিস চাইব কুসুম?

মুকুন্দ বলে, সকলে যা চায় সে-সকল নয়। স্থির ভারি জড়ানো গম্ভীর কণ্ঠস্বর। যেন কোনো গভীর থেকে, আবহমানতার ভেতর থেকে সভ্যতার অগ্রগমনের ধাতুর পরিবর্তনসূচক শব্দ বাজতে বাজতে উঠে আসছে বাজনার মতো। বাজনার মতো এই কণ্ঠস্বর জোড়া দিতে চাইছে ভাঙনমুখী পৃথিবীকে। মুকুন্দর ভাবনা ধ্বনিত হচ্ছিল, তাই বাজনা। সে ভাবছিল, পৃথিবী ভাঙছে। ভাঙছে যুদ্ধে দাঙ্গায় দাদাগিরিতে প্রতিবাদে। গোকুল বলত, সামনে বড় দুর্দিন গো খুড়া।

তাই মুকুন্দর ভাবনার ধ্বনিত ব্যঞ্জনা মানুষকে বিস্মিত করে দিচ্ছে। বিস্ময়ে ডুবে গিয়ে কুসুম প্রশ্ন রেখেই উৎকর্ণ হয়ে থাকে। বলে, খুলে বল — বুঝতে পারিনি — মুয়া ছোট মানুষ। আসল কথাটা কী?

মুকুন্দ হাসছিল। হাসি অথচ অদ্ভুত। ভাস্কর্যের মতো মুখের পেশীগুলো ছিল অনড়। সবাই আসলটা চায়— মানুষ ছুটছে কেবল আসলের ধান্ধায়। অতিরিক্ত কিছুই তার চাই না! সে বলে, আমিও কি জানি কুসুম? জানলে তবু বুঝতে পারতাম। কেবল মনে হয়—

কী? কী? মনে হয়? মেয়েমানুষ কুসুম এখন বড্ড উতলা হয়ে পড়েছে।

নিচে মাটিতে মাটির গভীরে কাঙালি-চোখ ধরে রেখে মুকুন্দ বুদবুদ তোলে। —জানি নি।

এর পরমুহূর্তে অর্থাৎ পরবর্তী স্তরে তারা মুখোমুখি দাঁড়াল। মুকুন্দর মনে হল সে গভীর কোনও প্রদেশে ঢুকে পড়েছে। একটা পরিচ্ছন্ন ঘর। চারপাশে তার সাদা দেওয়াল। এই ঘর হল আত্মা। ধোয়া মোছা চকচকে। এবার ওখানে নতুন নতুন উপাদান-আসবাব ভরতে হবে। এক বিচিত্র জীবন-প্রবাহ তাকে টেনে এনেছে এইখানে। সে যে এসেছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল চোখ বন্ধ করতেই। এই আসা কেবল সম্পদের লোভ — মদ মারা বা সঙ্গমের কাঙক্ষাতেই সীমায়িত নয়। অন্য কিছু। ছড়িয়ে পড়া অন্য কিছু।

একটা কৌটো আছে এইখানে, এই জীবনের সান্নিধ্যে। তাকে ধরতে হবে। তার ভেতরে আছে ভোমরা। শৈশবের সেই ভোমরা। ভোমরার রঙ দেখলে জীবনের মানে বোঝা যায়। বোঝা যায় জীবনের মানে কী? সে এখন পূর্ণ। সম্পূর্ণ। অতৃপ্তিই মানুষকে অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ বাদে সব সৃষ্টিকে পূর্ণ করে পাঠাল প্রকৃতি; মানুষকে অপূর্ণ রাখল কেন?

এ সব কিছুর উত্তর জানা যাবে সাদা দেওয়ালের ফাঁকা ঘরে গুণ-গুণ গান গেয়ে বেড়ানো ভোমরার গায়ের গন্ধ মন প্রাণ দিয়ে টেনে নিলে দেহের ভেতরে।

কুসুম বলে, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? নাহলে তমার রঙ লাল হয়ে যাচ্ছে কেন ধীরে ধীরে?

মুকুন্দ নিশ্চুপ।

সে ভাবছিল অন্য কথা। তার অস্তিত্বের কথা। আজকের পৃথিবীর কথা। পূর্বের সব কিছুকে অস্বীকার করবার মতো জমি কোথায় পেল মুকুন্দ তা তার জানা নেই। তবে গোকুলের কথা মনে পড়ল। মনে হল সমতল থেকে উঠে এসেই গোকুল হাওলের বন্ধুর পৃথিবীতে চড়াই উৎরাই বেয়ে বেয়ে গ্রামীণ-বামুন ভারতীয় মুকুন্দ বড় নির্ভেজাল সত্যের কাছে পৌঁছে গেছে। শরীরের ভেতর গরম প্রবাহ বয়ে গেলেও তাকে নির্লজ্জের মতো কাজে লাগাল না এই মুহূর্তে। বরং অনুভবের এক জগৎ যেন খুলে গেছে। যে জায়গায় পৌঁছুতে না পারলে আজ এই শতকের অন্তিম লগ্নে মানুষকে আর মানুষ বলে চেনা যাবে না।

কুসুম অনেক কথা বলে চলছিল। বলল, ঠাকুর তোমার দেহে পাপ লাগবে!

হয়তো কুসুমের আগের কথাগুলো মুকুন্দর কানে আলাদা করে কোনও ব্যঞ্জনা না তুলে সেই ভোমরার গানের সঙ্গেই মিশে যাচ্ছিল। গড়ে উঠছিল রাজকুমারী আর পেঁচা-বাঁদরের জগৎ — এক বোধের ভুবন। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা আজকের স্থূল অশিক্ষিত মস্তিষ্কের রমণীর দেহ থেকে পানের অলৌকিক গন্ধ পাচ্ছিল মুকুন্দ। পেয়েই চলেছিল বরোজের ভেতরের সেই সবুজ গন্ধটা। সেই রকম আলো এখন জ্যোৎস্না হয়ে ছিটকে পড়েছে মানুষের রমণী-শরীরে। শেষের শব্দগুলো কানে বাজায় বাতাসের মতো বিদ্যুতের মতো নাটকীয় ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল মুকুন্দ। গোকুলের মুখে শুনে থাকা যেন অন্য কারোর বলে দেওয়ায় মুখস্ত, অথচ নিজের অনুভব ও বিচারের অকৃত্রিম সরল উচ্চারণই তার গলায়। চেঁচিয়ে উঠেছে মুকুন্দ, পাপ ফাপ নয় হে, পাপ নয়। পাপ না করে আমরা থাকতে পারি কি? যা না করলে জীবন চলে নি, বেঁচে থাকা যায় নি, তাকে পাপ বল কেন কুসুম? জীবন কও—

মুকুন্দর কণ্ঠস্বর এবার অস্পষ্ট। অস্পষ্ট শব্দ। মানুষ কাঁদলে যে রকম শব্দ হয়, অবিকল সেই রকম।

কুসুম কাঁদছে। বৃষ্টি ঝেঁপে এল। বাতাস বইছে। শিল পড়ছে। মেঘ ডাকছে। যেন একটা হাসির জগৎ। অথচ কুসুম কাঁদছে। আবেগে কাঁপছে কাঁদছে। —ছোটখোকার জন্য মোর প্রাণটা কাঁদে—কুসুম বলল।

তবে? তবে? তবে কও। মুকুন্দর হাতগুলো যেন দেওয়ালে। যেন, মানে আসলে কোথায় কারোর জানা নেই। সে বলে চলেছে, শব্দে বা নিঃশব্দে, মানুষে মানুষে ভেদ সম্পদ ছাড়া আর কোথায়? তবে সম্পদে কী কাজ? ধর্মে জাতে জাতিতে ভেদ ক্ষমতা ছাড়া আর কোথায়? তবে ক্ষমতায় কী কাজ?

অশ্রু ও বৃষ্টির আবরণের ভেতর সে-দিন চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে মুকুন্দ সিংহবাহিনীর মন্দিরের বারান্দায় গোকুলের বিধবা কুসুমের দুটি হাত সজোরে চেপে ধরলে, এক শীতল প্রবাহ দুরন্ত গ্রীষ্মের আর অস্থির স্বার্থান্ধতার প্রখরতাকে শান্ত করে দিল।

মুকুন্দ চোখ তুলল আকাশে। মাথার ওপর ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা থেকে সাদা বাদুড়টা শেষ বারের মতো উড়ে গেল।

মুকুন্দ মনঃসংযোগ করে তাকালে বুঝতে পারল, ওটা গোকুল। মৃত পঞ্চাৎ গোকুল হাঁড়োলের ভূত। গোকুলের ভূতটা তবে মুক্তি পেল আজ?

বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বাংলার শ্রমিক আন্দোলন

নির্বাণ বসু

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় তখন ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চলছে এক জটিল পরিস্থিতি। প্রথমতঃ ১৯৩৫ সালের নতুন ভারত শাসন আইনের দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। যদিও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগারোটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে সরকার গঠন করে এবং বাংলায় যুক্তভাবে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ ক্ষমতায় আসে। দ্বিতীয়তঃ, বামপন্থীরা, বিশেষতঃ কম্যুনিস্টরা এই সময়ে দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিল এবং ভেতর ও বাইরে থেকে কংগ্রেসের উপর শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রভাবশালী দক্ষিণপন্থী অংশ এই চাপ প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কে দু'টি প্রধান কালপর্বে ভাগ করা যেতে পারে: (১) ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের জুন মাসের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ যখন জার্মানি ও সোভিয়েট রাশিয়া ছিল একপক্ষে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল অন্যপক্ষে। (২) ১৯৪১-এর জুন থেকে ১৯৪৫ সালের অগাস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া ও পশ্চিমী দেশগুলির মহাজোট গঠিত হবার সময় থেকে জাপানে আত্মসমর্পণের ফলে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে আমরা দেখাব বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে সব রাজনৈতিক দলগুলি সক্রিয় ছিল তাদের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা।

১.১

যুদ্ধের গোড়ার দিকে যুদ্ধের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দ্বিধান্বিত। আইন অমান্য বা যুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক ধর্মঘট পরিচালনা করতে তারা ছিল অনিচ্ছুক।[১] বাংলাদেশের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য অবশ্য যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে বাংলার কংগ্রেসীদের কোন অসুবিধা ছিল না, যা অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে ছিল। তা সত্ত্বেও বাংলার কংগ্রেস 'সরকারী' ও 'বহিষ্কৃত' (সুভাষ বসু সমর্থক) দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবার ফলে গণ আন্দোলনে কোনও গোষ্ঠীই তেমন সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে নি। গোষ্ঠী কোন্দলে তারা জর্জরিত ছিল এবং আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র।

শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী উন্মাদনা সৃষ্টির অংশ হিসাবে কংগ্রেসী শ্রমিক এম.এল.এ ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আইনসভায় একটি প্রস্তাব এনে দাবি করেন যে প্রতিমাসে বেতনের ২৫ শতাংশ যুদ্ধকালীন বোনাস দেওয়া হোক। বাংলাদেশে গোঁড়া গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েশন শ্রমিকদের মধ্যে এই দাবির সমর্থনে ব্যাপক প্রচারপত্র বিলি করে।[২] তেমন কোন আন্দোলন অবশ্য সেই সময়ে গড়ে ওঠেনি।[৩]

১৯৪০ সালের জুন মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (সরকারী গোষ্ঠী) শ্রমিক উপসমিতির সম্পাদক ভূপেন দত্ত এক বিবৃতিতে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাদ দিয়ে স্থানীয় আর্থনীতিক দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘটের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে এই ধরনের বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে শ্রমিকদের শক্তিক্ষয় হবে। যদি কোনও স্থানীয় আন্দোলন হয়ও তাহলে তাকে পরিচালিত করতে হবে চূড়ান্ত সংগ্রামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এই সাধারণ নীতির অংশ হিসাবে তিনি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গঠনমূলক কর্মসূচির প্রস্তাব করেন। কিন্তু তা খাতায়-কলমেই থেকে যায়। ১৯৪০-এর মাঝামাঝি থেকেই গোঁড়া কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েশন (বি এল এ)-কে শক্তিশালী করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ব্যাপারে সক্রিয় আগ্রহ না দেখাবার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪]

শ্রমিকদের মধ্যে একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ডঃ সুরেশ ব্যানার্জির প্রস্তাব গান্ধী ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে অনুমোদন করেন। ১৯৪১-এর জানুয়ারি মাসের বাংলা সরকারের নথিতে অবশ্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কোন প্রভাব শ্রমিকদের উপর পড়ে নি।[৫] ঐ মাসেই ডঃ সুরেশ ব্যানার্জি গ্রেফতার হন। ১৯৪১ সাল বরাবর প্রায় সব পরিচিত বি.এল.এ. নেতা গ্রেফতার বা অন্তরীণ হওয়াতে শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠন মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। বি.এল.এ.র পুরানো শাখাগুলি নামমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

যুদ্ধের প্রতি কংগ্রেসের প্রাথমিক আচরণ দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে, কম্যুনিস্ট দলের সামনে দুটি বিকল্প খোলা ছিল। প্রথমতঃ, সরকারী কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে মৈত্রী চালিয়ে যাওয়া এবং তাদের যুদ্ধবিরোধী আঁতাতকে শক্তিশালী করা। দ্বিতীয়তঃ, ঐ আঁতাত ভেঙে বেরিয়ে আসা এবং কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ততার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন সৃষ্টি করা। সি.পি.আই. ক্রমশই এই দ্বিতীয় বিকল্পের দিকে ঝুঁকছিল।[৬]

ইতিমধ্যেই যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে ১৯৩৯-এর অগাস্ট মাসে সি.পি.আই-র পক্ষে বাংলা কমিটির সেক্রেটারি নৃপেন চক্রবর্তী যে নির্দেশ দেন তাতে চটকল, ট্রাম, রেলওয়ে, লৌহ ও ইস্পাত, ঝাড়ুদার ও বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে বলা হয় এবং সাধারণ মানুষও অংশ নিতে পারে এমন যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে বলা হয়।[৭] যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সি.পি.আই ঘোষণা করে যে জনসাধারণের সামনে আশু কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিকভাবে কাজে লাগানো। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সি.পি.আই 'প্রলেটারিয়ান পাথ্' নামে যে নতুন নীতি নির্দেশিকা ঘোষণা করেন তাতে বলা হয় যে এই উদ্দেশ্যে প্রথম কার্যসূচি হবে সমস্ত প্রধান শিল্পে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট এবং দেশব্যাপী কর ও রাজস্ব বন্ধ আন্দোলন। এর ফলে জাতীয় আন্দোলন সশস্ত্র গণবিস্ফোভের স্তরে উন্নীত হবে।[৮]

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে সারা ভারতের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে বেশ কয়েকটি ধর্মঘট হয় যাদের অধিকাংশই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এর মধ্যে বাংলার চটকলগুলিও ছিল। এই সব ধর্মঘট শুরু হয়ে যাবার পরে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে বেশ কিছু দাবি দাওয়া আদায় হবার পরেই কেবলমাত্র কম্যুনিস্টরা ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত হয়।[৯]

কম্যুনিস্টদের জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন নীতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সি.পি.আই-র বাংলা প্রাদেশিক কমিটির তরফে প্রকাশিত ''যুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর'' শীর্ষক সাইক্লোস্টাইল করা লিফলেট থেকে। রেল, ট্রাম, বন্দর, স্টিমার ও চটকল কর্মীদের উদ্দেশে অনুরূপ লিফলেট বিলি করা হয়। এগুলির মূল বক্তব্য ছিল—গোপন কমিটির মাধ্যমে কর্মীদের সংগঠিত করা; গোপন সভা করা; বর্ধিত বেতন, মহার্ঘ ভাতা এবং যুদ্ধকালীন বোনাসের জন্য আন্দোলন করা, এবং সর্বোপরি যুদ্ধে অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ শিল্পকে স্তব্ধ করে দেওয়া।[১০]

যুদ্ধ বিরোধী প্রচারের পাশাপাশি সি.পি.আই. প্রতিটি শিল্পে শ্রমিকদের মহার্ঘভাতা দাবি প্রচার করতে থাকে। বেতনের ২৫ শতাংশ হারে যুদ্ধকালীন বোনাসের দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাবে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য কঠিন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়।[১১]

স্বভাবতঃই যুদ্ধের সময় এই জাতীয় সোচ্চার কার্যকলাপ সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের উপর কঠোর আক্রমণ নেমে আসে। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা সরকার নয় জন বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের উপর ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেন।[১২] এরপর ১৫ই জুলাই চটকল অঞ্চলে অবস্থিত যোলজন কম্যুনিস্ট শ্রমিক সংগঠকের বাড়ি একসঙ্গে তল্লাশি করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।[১৩] কিন্তু দমনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা কম্যুনিস্টদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। অবশ্য পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে সক্রিয় কর্মীদের বহিষ্কার ও অর্থাভাবের দরুন বাংলার শিল্পাঞ্চলে এই সময়ে কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ হ্রাস পায়। এমনকি সি.পি.আই-র কলিকাতা জেলা কমিটির ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসের রিপোর্টে শ্রমিক ফ্রন্ট

সম্পর্কে বলা হয় যে চটকল ও কাশিপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরির এবং কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকরা দলের প্রতি সহানুভূতিহীন এবং কলকাতার একমাত্র কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ইউনিয়ন ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সমস্ত কর্মকর্তা গ্রেফতার হয়ে রয়েছেন।[১৪]

সরকারের দমন নীতির ফলে অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি যেমন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আর.এস.পি) বেঙ্গল লেবার পার্টি (বি.এল.পি) বলশেভিক পার্টি, কম্যুনিস্ট লীগ (বা আর.সি.পি.আই), ওয়ার্কার্স লীগ প্রভৃতিরও ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। সমস্ত বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একমাত্র এম.এন.রায়ের লীগ অফ র‍্যাডিকাল কংগ্রেস মেন ফ্যাসিশম্-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রয়াসকে সর্বাত্মক সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর যুদ্ধ সমর্থক নীতির জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হবার পরে রায় র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (আর.ডি.পি) গঠন করেন (ডিসেম্বর, ১৯৪০)। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে রায় কলকাতাকে তাঁর মূলকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। কিন্তু এই সময়কার একটি রিপোর্ট থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে রায় তাঁর দলীয় সমর্থকের সংখ্যা বাড়াতে পেরেছেন বা যুদ্ধ প্রয়াসের সমর্থকদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছেন।[১৫] সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে অন্যান্য কয়েকটি সরকারী সমর্থক গোষ্ঠীর সাহায্যে রায় গঠন করেন ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার (নভেম্বর ১৯৪১)।

১.২

একমাত্র রায়-বাদীদের বাদ দিলে, যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে জড়িত সবকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীই ছিল যুদ্ধ বিরোধী। যদিও সরকারী দমননীতির জন্য তারা সক্রিয়ভাবে তেমন কিছু করতে পারে নি। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষের দিক থেকে এক সম্পূর্ণ নতুন পর্ব শুরু হয়। নাৎসি জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের ফলে (জুন, ১৯৪১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায়। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নীতির উপর স্বভাবতই এর প্রভাব পড়ে। এরই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে ভারতের কম্যুনিস্টরা যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা থেকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতিতে সরে আসে। এই পরিবর্তন অবশ্য দ্রুত ঘটমান কয়েকটি পর্বের মধ্য দিয়ে এসেছিল।

জার্মানি আক্রমণের পর রাশিয়া যখন ব্রিটেনের মিত্র দেশে পরিণত হয়, তখন সি.পি.আই-র প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল যে তারা রাশিয়ার যুদ্ধ প্রয়াসকে সমর্থন করবে, ব্রিটেনের নয়, কেননা ব্রিটেন লড়ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ন্যায় যুদ্ধ। এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্র সহ সর্বত্র কম্যুনিস্ট কার্যকলাপে মন্দা দেখা দেয়।

নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা ত্যাগ না করে কীভাবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সামিল হওয়া যায়, সেটি ছিল ভারতের কম্যুনিস্টদের কাছে একটি বড় সমস্যা।[১৬] অনেক চিন্তাভাবনার পর ১৯৪১-এর শেষের দিকে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীগুলি, যাদের কিছু ছিল কারান্তরালে এবং কিছু গুপ্ত অবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। নতুন নীতিতে এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা হয় যে যদিও ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রয়াসে সাহায্য করা উচিত, সেটি নির্ভর করবে এই শর্তসাপেক্ষে যে ভারতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হবে, গণতান্ত্রিক অধিকার দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে।[১৭] কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও পরিবর্তন লক্ষ করা যায় যখন নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'দ্য কমিউনিস্ট' ডিসেম্বর, ১৯৪১ জানুয়ারি ১৯৪২ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে [১৮] ''যুদ্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃশর্ত সমর্থনের। সাম্রাজ্যবাদীরা যাই করুক না কেন, এটা এখন আমাদের যুদ্ধ।'' এই নতুন নীতি অনুযায়ী সি.পি.আই ঘোষণা করে যে [১৯] শ্রমিকদের মধ্যে তারা নিজেদের প্রভাবকে কাজে লাগাবে শিল্পে উৎপাদন বাড়াতে এবং সরকারকে আশ্বস্ত করে তারা এটাও জানায় যে যে-সব ক্ষেত্রে কম্যুনিস্টদের কিছুমাত্র হাত আছে সেখানেই সরকারের ধর্মঘটের ভয় পাবার দরকার নেই।

'জনযুদ্ধে' র প্রতি প্রবণতার একটি সুফল হল যে তা কম্যুনিস্টদের ভারতীয় রাজনীতিতে আইনসম্মত স্থান পেতে সাহায্য করেছিল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে সরকার ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিকে বৈধ বলে ঘোষণা করে। একদিকে নিজেদের বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়া, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা এই দুটি মিলে কম্যুনিস্টদের সামনে বিরাট সুযোগ এনে দিল।

অবশ্য 'জনযুদ্ধে'র তত্ত্বে পৌঁছনোর ব্যথাটি কম্যুনিস্টদের কাছে তত সহজ ছিল না এবং অনেক দ্বিধার মধ্য দিয়ে তাদের এগোতে হয়েছিল। ১৯৪২-এর গোড়ার দিকেও দেখা যাচ্ছে যে সি.পি.আই একদিকে যুদ্ধ প্রয়াসে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, অন্যদিকে শ্রমিকদের ক্ষোভ দূর করার জন্য ডাক দিচ্ছে। বঙ্গীয় সরকারের ১৯৪২ সালের

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় বৈধ পাক্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে[২০] যে ধর্মঘটের সংখ্যা কমার অন্যতম কারণ হতে পারে ধর্মঘটে গিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদ বিরোধী দলগুলির আহ্বান।

১৯৪২ সালের মে মাসের দুবার ও জুলাইয়ে একবার কলকাতার ট্রাম কোম্পানিতে হঠাৎ ধর্মঘট শুরু হলে তা আটকাতে কম্যুনিস্টরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পুরো জুন ও জুলাই মাস ধরে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সমাবেশেই প্রধান বক্তব্য ছিল—ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থকদের সব কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও শ্রমিকদের দাবি পূরণের আহ্বান এবং যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দান। সরকারী রিপোর্টে অবশ্য বলা হয়,[২১] যেহেতু রাজনৈতিক বিষয়ে শ্রমিকদের বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না, সভার বক্তারা শ্রমিকদের আর্থনীতিক দাবি দাওয়ার উপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং তাতে সরকারের সমালোচনাই বেশি থাকত।

জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে (অগস্ট, ১৯৪২) সি.পি.আই এক কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়ে। গোড়ার দিকে কংগ্রেসের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছেদ এড়াতে তারা সচেষ্ট ছিল এবং সেই সঙ্গে এই আশঙ্কাও কাজ করেছিল যে কংগ্রেসের ডাকা গণআন্দোলন সফল হলে তাদের দলীয় প্রভাব কমে যাবে। একই সঙ্গে আবার কম্যুনিস্টরা এই আন্দোলন সমর্থনযোগ্য মনে করতেন না, কেননা তা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটাবে। বাংলায় অগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্পে বেশ কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট হয়, যাদের অধিকাংশ ছিল স্বল্পস্থায়ী। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্য এগুলি কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে শুরু হয় নি, হয়েছিল আর্থনীতিক কারণে যার সুযোগ নিয়েছিল কংগ্রেসী আন্দোলনকারীরা। যখনই কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্যদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল, তখনই শ্রমিক অসন্তোষ কমে যায়। সি.পি.আই-র বাংলা প্রাদেশিক কমিটি ১৯৪২-এর অগস্ট এক সার্কুলারে বলে যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে একদিনের প্রতীক শ্রমিক ধর্মঘট সমর্থন করা যেতে পারে কিন্তু অনির্দিষ্টকাল ধরে কোনও ধর্মঘট চালাবার চেষ্টা হলে দল তা রুখবার সব চেষ্টা করবে। বাংলার লেবার কমিশনার নিজেই স্বীকার করেন যে[২২] এই সময়ের ধর্মঘট নিষ্পত্তির ব্যাপারে তিনি কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে প্রচুর সহায়তা পেয়েছেন।

এই সময়ে সি.পি.আই-র প্রকাশ্য প্রচারের ধারা ছিল এইরকম: শিল্প শ্রমিকদের, বিশেষতঃ বৃহত্তর কলকাতার শিল্পাঞ্চলে, মূল্যসূচকের প্রচণ্ড বৃদ্ধিই ছিল শ্রমিক অসন্তোষের মূল কারণ। এর সুযোগ নিয়ে কিছু বিভ্রান্ত জাতীয়তাবাদী এবং পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের উত্তেজিত করছে। বহু ক্ষেত্রে মালিকরা নিজেরাই কিছু দুষ্কৃতকারীর সাহায্যে অশান্তি সৃষ্টি করে উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছে। যেসব মিল মালিকরা এই সব ষড়যন্ত্রের শরিক নয়, তারাও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির প্রতি উদাসীন থেকে পরোক্ষভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করছে। শ্রমিকদের অভিযোগ ও চেতনাকে ঠিক পথে কাজে লাগানোর জন্য সি.পি.আই শ্রমিক ঐক্য ও সংগঠনের প্রতি জোর দেয়। এর জন্য যে দাবিগুলি তারা তুলে ধরে তার মধ্যে ছিল ২৫% বেতন বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মহার্ঘভাতার বৃদ্ধি, শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতি, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক মালিক সহযোগিতা এবং ধর্মঘট ভাঙার জন্য ভারত রক্ষা আইন বা বিশেষ কোন শ্রমিক অর্ডিন্যান্স ব্যবহার না করা।[২৩] কারখানা ও শ্রমিক বস্তিতে প্রচার চালানোর সময়ে কম্যুনিস্টরা এই দাবিগুলির উপরই জোর দিত। ১৯৪২ সালে অনুষ্ঠিত তাদের প্রথম প্লেনামে অর্থনীতির উপর নেওয়া প্রস্তাবে, সি.পি.আই ঘোষণা করে যে ধর্মঘটের সংখ্যা তারা যথাসম্ভব কমাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর এই অধিকার একেবারে ত্যাগ করতে তারা রাজি ছিল না। পরিস্থিতি একেবারে বাধ্য করলে তাদের ধর্মঘট ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।[২৪]

১৯৪২ সালের শেষের দিকে সি.পি.আই বাংলাদেশে শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জোরদার চেষ্টা চালায়। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে[২৫] কম্যুনিস্টরা নিজেরাই এই সময়ে স্বীকার করে যে শ্রমিকদের উপর তাদের সাংগঠনিক প্রভাব নাম মাত্র। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। তাদের মুখপাত্র জনযুদ্ধে বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে কম্যুনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধির এই রকম হিসাব দেওয়া হয়েছে[২৬]:— ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে, সি.পি.আই. নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নগুলির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ২,০০০-এর বেশি ছিল না এবং ট্রামওয়ে, লোহা কারখানা, পাট ও সুতাকলের মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৮,০০০ এবং ইউনিয়নের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫তে। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে এটা বেড়ে দাঁড়ায় বড়শিল্পে ৩৩টি ইউনিয়নের ১২,০০০ সদস্য এবং মাঝারি ও ছোট শিল্পের ২০টি ইউনিয়নের প্রায় ৮,০০০ সদস্য। ১৯৪৩ সালের

১লা এপ্রিলের মধ্যে বড় ও মাঝারি শিল্পে কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন ইউনিয়নের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪টি, যাদের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ২৮,২০০। এর মধ্যে বৃহৎ শিল্পেই ছিল ২১,৭০০ জন সদস্য।

দলীয় রিপোর্টে স্বভাবতই অতিরঞ্জন থাকে এটা ধরে নিয়েও এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে এই পর্বে কম্যুনিস্টদের শ্রমিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনার কিছুটা ব্যাখ্যা দরকার। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নীরবে, কিছুটা সবার অলক্ষ্যে কম্যুনিস্টরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলি তাদের অধিকাংশ কর্মী বন্দী বা অন্তরীণ হওয়ার ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে কম্যুনিস্টদের চ্যালেঞ্জ করার কেউ ছিল না। অন্যদিকে যুদ্ধ সমর্থক নীতির জন্য কম্যুনিস্টদের সরকারের কাছ থেকে বিরোধিতার কোনও আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু মনে রাখা ভাল যে কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ইউনিয়নের বিপুল সদস্যভুক্তি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি বা তাদের মার্কসবাদে দীক্ষা সূচনা করে না।

১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি ''সম্মানজনক সমর্থনের'' আবরণটিও প্রত্যাহৃত হল, কম্যুনিস্টদের মুখে শোনা গেল নিঃশর্ত সমর্থনের কথা। ১৯৪৩ সালের মে মাসের সি.পি.আই-র এক প্রস্তাবে বলা হয়—''মালিক বা আমলারা কী করল তার দিকে না তাকিয়ে আরও উৎপাদন ও সুষ্ঠু পরিবহনের ব্যবস্থা করা এবং কাজ বন্ধ প্রতিহত করা দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে শ্রমিকদের জাতীয় দায়িত্ব। ...কম্যুনিস্টরা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবে, কেননা উৎপাদন ব্যাহত করলে তা দেশের প্রতিরক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।'' সি.পি.আই-র প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে বি.টি.রণদিভে ঘোষণা করেন যে[২৮] উৎপাদনের প্রতি শর্তাধীন সমর্থন এক বাম-জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি। উৎপাদন হচ্ছে এক পবিত্র দায়িত্ব। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির দাবি তখনই সমর্থনযোগ্য যখন তা বর্ধিত উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। শিল্প বিরোধ মেটানোর জন্য রণদিভে প্রস্তাব করেন যে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বোর্ডের মত একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলা হোক। এম.আর.মাসানী যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন যে[২৯] যে দল সর্বদা ধর্মঘট, ধর্মঘট ও আরও ধর্মঘটের ডাক দিত তারা এখন দাবি তুলল কাজ, কাজ এবং কোন ধর্মঘট নয়। তাদের শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভুলে থাকতে বলা হল।

অবশ্য ধর্মঘট বাদ দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কম্যুনিস্টরা কাজ চালিয়ে যায়। বাংলাদেশে কম্যুনিস্টরা শ্রমিক অসন্তোষকে নিরুৎসাহিত করার মূলনীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে, বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার মত নির্দিষ্ট দাবিতে আন্দোলন করে।[৩০] প্রশাসনের তরফ থেকেও শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য অন্ততঃ আংশিকভাবে তাদের দাবি দ্রুত মেনে নেওয়ার এক প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে, জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন এড়ানো গিয়েছিল। যেমন ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে কম্যুনিস্টরা সপ্তাহে ৫ সের খাদ্যাশস্য শ্রমিকপিছু রেশনে দেবার যে আন্দোলন করে, ৩-½ সের থেকে বাড়িয়ে ৪ সের করার সরকারী ঘোষণার পরে সেই আন্দোলন অনেক কমে যায়।[৩১] ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বর্ধিত নগদ মহার্ঘভাতা ও বেশি পরিমাণে ও উন্নততর মানের খাদ্যশস্য রেশনে সরবরাহের দাবি কম্যুনিস্টদের প্রচারের প্রধান ভিত্তি ছিল। অনেক প্রস্তুতির পর প্রায় ২০টি কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন ২৫শে মে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে এক দাবি সনদ প্রস্তুত হয়। এই প্রচারের অঙ্গ হিসাবে, বর্ধিত মহার্ঘভাতার দাবি সম্বলিত প্রচার পুস্তিকা শিল্পাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়। এই দাবিতে বিশেষতঃ চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক স্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়। কিন্তু জুলাই মাসের পর থেকেই দেখা যায় যে বর্ধিত নগদ মহার্ঘভাতার দাবির জোর কমে আসছে এবং রেশনে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানোর দাবিটি নীরবে পরিত্যক্ত হয়েছে।[৩৩]

পুরো ঘটনাক্রম থেকে প্রধান যে বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে তা হল সি.পি.আই. তীব্র মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাবের ফলে উদ্ভূত শ্রমিক অসন্তোষকে শান্তিপূর্ণ প্রকাশের পথে নিয়ে যাবার সর্বতোমুখী প্রয়াস চালিয়েছিল, যেমন স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, স্মারকলিপি দেওয়া বা সম্মেলন করা যাতে ধর্মঘট তথা অন্য কোন হিংসাত্মক আন্দোলন দানা না বাঁধে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অভাব অভিযোগের নিষ্পত্তি না হলে শ্রমিকরা চঞ্চল হতে বাধ্য। ১৯৪৪ সালের তৃতীয় পক্ষে পরিষ্কার বোঝা যেতে শুরু করে যে যুদ্ধ সমর্থক প্রচার কম্যুনিস্ট দলের কাছে তার উপযোগিতা হারিয়েছে। যুদ্ধ সমর্থক প্রচারের জোর কমতে থাকে। ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পার্টির অনুসৃত নীতির প্রতি বিরোধিতা দলের ভিতরেই বিভিন্ন মহল থেকে, বিশেষতঃ শ্রমিক ফ্রন্ট থেকে, আসতে থাকে।[৩৪] অবশ্য দল তার পরিচিত পথ ত্যাগ করে নি। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে দল বাংলাদেশে ৪৮টিরও বেশি রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের উপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করে যাদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৮৫,০০০।[৩৫]

এমনকি বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরেও সি.পি.আই. সগৌরবে ঘোষণা করে যে[৩৬] ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের

সময়েও যে তারা ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে ধর্মঘটের পথ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পেরেছিল এটা শুধু শ্রমিকদের উপর দলের নিয়ন্ত্রণের পরিমাণই সূচনা করে না, জাতীয় স্বার্থকে যে শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থ বলে ভাবতে পেরেছিল তাও প্রমাণ করে। কিন্তু এই উচ্চকণ্ঠ দাবির অসারতা যুদ্ধ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেকে হঠাৎ দেখতে পায় বিভ্রান্ত, বিহ্বল এবং যুদ্ধের সময়ে অ-জনপ্রিয় নীতির জন্য প্রকাশ্য জনবিরোধিতার সম্মুখীন অবস্থায়। জনযুদ্ধে জেতা গিয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিস্টদের সেজন্য মারাত্মক মূল্য দিতে হয়।

যুদ্ধের সময়ে কম্যুনিস্টরা শ্রমিকদের সংগঠিত করার নিয়মিত প্রয়াস চালিয়ে গেছে; জাতীয়তাবাদীরা সেখানে মাত্র একবার শ্রমিকদের ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছে। সেটি হল ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় যখন সরকারী কংগ্রেস কমিটি ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল সকলেই এক উদ্দেশ্যে এক সঙ্গে কাজ করছিল।

১৯৪২ সালের অগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের নানা জায়গায় ধর্মঘট করাবার চেষ্টা হয়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটগুলির মধ্যে ছিল মেটিয়াবুরুজে বিড়লার কেশোরাম কটন মিলে ধর্মঘট, হুগলির বহু সুতাকলে (যেগুলি ছিল প্রধানত ভারতীয়দের হাতে) ধর্মঘট, হাওড়ায় বহু ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, বার্ণ এণ্ড কোং (হাওড়া) কারখানা যেখানে প্রায় ৮,০০০ শ্রমিক কাজ করত এবং কলকাতার হুকুমচাঁদ এবং ম্যাকিনটোশ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ধর্মঘট। বাংলার গভর্নর তাঁর গোপন পাক্ষিক রিপোর্টে নিজেই স্বীকার করেন যে[৩৭] যদিও শ্রমিকদের ন্যায় সঙ্গত দাবি মেটানোর সর্বতো প্রয়াস চলছে, তাহলেও সন্দেহ নেই যে শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য আছে। আন্দোলনকারীরা সেসব স্থানে সফলও হয়েছিল যেখানে আর্থিক দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট হয়। এইসব জায়গায় মীমাংসা সহজসাধ্য ছিল। সাধারণতঃ দু'একদিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকঘন্টার মধ্যেই পারস্পরিক আলোচনা বা বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির মাধ্যমে ধর্মঘটের সমাধান হয়ে যায়।[৩৮] সেপ্টেম্বর মাসেও কিছুটা চাঞ্চল্য ছিল। কিন্তু মাসের শেষ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি শ্রমিক ফ্রন্টে সম্পূর্ণ স্থিতাবস্থা ফিরে আসে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পর পরিচিত প্রায় সমস্ত কংগ্রেস নেতা গ্রেফতার বা বহিষ্কৃত হবার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, কিছু জাতীয়তাবাদী কর্মী তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। ঐরকম এক দুর্বল প্রয়াস ছিল যুগান্তর গোষ্ঠীর (যা তখন কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি নিয়ন্ত্রণ করছিল) বিশিষ্ট নেতা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কর্তৃক কলকাতা শ্রমিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা (মে, ১৯৪৩)। এই সঙ্ঘ সাংগঠনিক দিক দিয়ে তেমন এগুতে পারে নি।[৩৯] অনুরূপ আর একটি প্রয়াস ছিল কংগ্রেসে সোশ্যালিস্ট পার্টির সভ্য ও সমর্থকদের কাউন্সিল অফ লেবার অগানিজেসন (সি.এল.ও.) অথবা ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪)। সি.এল.ও. শ্রমিকদের আর্থনীতিক দাবি দাওয়া তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল তাদের রাজনৈতিক কর্মপন্থার প্রতি শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার কৌশলমাত্র।[৪০] এটিও খুব কার্যকরী হয় নি।

মূল কংগ্রেস সংগঠন ছাড়া অন্যান্য জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীগুলি যেমন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি, আর.সি.পি.আই, ওয়ার্কার্স লীগ তাদের যুদ্ধ বিরোধী কার্যসূচি অব্যাহত রাখে। তাদের সকলকেই সরকারী দমনাদির শিকার হতে হয় এবং এর ফলে তারা স্বাভাবিক ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাট এবং তাদের শ্রমিক শাখা ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার, যারা যুদ্ধের প্রথম পর্ব থেকেই যুদ্ধ সমর্থক নীতি নিয়েছিল, তারা ছাড়া মাত্র দুটি ছোট বামপন্থী সংগঠন বলশেভিক পার্টি ও ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডস কম্যুনিস্ট পার্টির অনুসরণে 'জনযুদ্ধ' সমর্থন নীতি গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীগুলির কোনটিরই অবশ্য সমর্থকের পরিধি বেশি বড় ছিল না।

২

যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পে আলাদা আলাদা ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের কী রূপ ছিল তা আমরা সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করব।

চটকল—১৯৩৬-৩৭ সালের স্বল্পস্থায়ী জোয়ার বাদ দিলে ১৯২৯ সালে মহামন্দার সময় থেকে চটশিল্পে যে ভাঁটা চলছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর সময়েই চটশিল্প তা থেকে মুক্ত হয়। বন্ধ 'লুম'গুলি আবার খোলে, হেসিয়ান ও ম্যাকিং ডিপার্টমেন্টে পুরোমাত্রায় কাজ শুরু হয়। চটকলগুলি প্রভূত লাভ করতে শুরু করে। স্বভাবতঃই শ্রমিকরা আগে যে মজুরি ছাঁটাই করা হয়েছিল তা পুনরায় দেওয়ার দাবি জানায়। গোড়ায় সরকার যুদ্ধকালীন বিশেষ ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অনমনীয় মনোভাব দেখায় এবং

উৎপাদনে কোন রকম বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সতর্ক করে দেয়। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই বিচ্ছিন্ন ধর্মঘট শুরু হয় এবং ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে তা ব্যাপক জোয়ারের রূপ নেয়। চটকল মালিকরা বোঝেন যে দাবি দাওয়া অংশতঃ মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন শতকরা ১০ভাগ বেতনবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে। এটা আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে কোন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এই ধর্মঘটগুলি হয়েছিল।[৪১]

পুরো যুদ্ধের সময়টাই সরকার ও আই.জে.এম.এ. যুগপৎ নরম ও গরম নীতি নিয়েছিল। একদিকে যুদ্ধকালীন দমনমূলক আইনের সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক সরকার কঠোর হস্তে শ্রমিক আন্দোলনকারীদের দমন করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, আই.জে.এম.এ. শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখার সব রকম চেষ্টা করেছিল কিছু কিছু সুযোগসুবিধার ছাড় দিয়ে যেমন নগদ মহার্ঘভাতা, বাধ্যতামূলক কর্মহীনতার সময় 'খোরাকী' ভাতা, রেশন দোকানের মাধ্যমে কম দামে খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ এবং যে কোন ভাবে ব্যাপক ছাঁটাই রদ। তবুও এই সব রকমের ছাড় মিলিয়েও প্রকৃত জীবনযাত্রার মূল্যবৃদ্ধির সমতুল হয় নি। তা ছাড়া যুদ্ধকালীন নানা ধরনের পরিস্থিতিও চটকলের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করেছিল যেমন যুদ্ধ ভীতি ও বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কলকাতা ত্যাগ, সামরিক কারণে বহু সংখ্যক মিল অধিগ্রহণ, তীব্র কয়লা সংকটের ফলে মিল বন্ধ। বন্ধ মিলের শ্রমিকদের নিছক 'খোরাকী ভাতা' নিয়ে তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও আই.জে.এম.এ নিজেই বারবার স্বীকার করেছে যে চট শিল্প যুদ্ধের সময় গুরুতর কোন শ্রমিক অশান্তি থেকে মুক্ত ছিল। এর জন্য অংশতঃ দায়ী ছিল সরকার ও মালিকপক্ষের কঠোর অথচ চতুর নীতি এবং অংশত দায়ী ছিল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের কর্মনীতি। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৪০ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমে যায় ও ঐ বছরে অগস্ট মাসের পর আর কোন ধর্মঘট হয় নি। ১৯৪২ সালের অগস্টে জাতীয়বাদী ও র‍্যাডিকালদের বিপুল হারে গ্রেফতার ও ১৯৪১-এর শেষের দিক থেকে কম্যুনিস্টদের 'জনযুদ্ধ' সমর্থন নীতি গ্রহণের ফলে পরিস্থিতি আরও শান্ত হয়ে পড়ে। তবে এ কথাও মনে করা ভুল যে যুদ্ধের বছরগুলিতে চটকলে কোনও ধর্মঘট হয় নি।[৪২]

বস্ত্রশিল্প— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হল তখন কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলে একটি ধর্মঘট চলছে। টেকনিকাল কারণে এই মিলের তৃতীয় শিফট বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কয়েক শ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়লে শ্রমিকরা নিজেরাই ধর্মঘট শুরু করে দেয়। পরে, ইউনিয়ন ধর্মঘটের দায়িত্ব নেয়। কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা থাকলেও মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হত কম্যুনিস্টদের দ্বারা। এই দীর্ঘমেয়াদী ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় (অগস্ট—অক্টোবর, ১৯৩৯)। এই একই দাবিকে কেন্দ্র করে আবার ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্মঘট শুরু হয়। এবারেও ধর্মঘট সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় (এপ্রিল, ১৯৪০)। শ্রমিক আন্দোলনের বারংবার ব্যর্থতায় স্বভাবতই টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। এরপরে সি.পি.আই. 'জনযুদ্ধ' পর্বে যুদ্ধ সমর্থক ও ধর্মঘট বিরোধী নীতি গ্রহণ করলে পর ইউনিয়নকে পুনর্জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়।

ঢাকায় ঢাকেশ্বরী কটন মিলে (১ ও ২ নং) ১৯৪০ সালের ২০শে জানুয়ারি ধর্মঘট শুরু হয়। ৩০৫০ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে ও ১,৫৫০ শ্রমিক পরোক্ষভাবে এতে জড়িত ছিল। ধর্মঘটীদের দাবির মধ্যে ছিল কিছু বরখাস্ত শ্রমিকের পুনর্বহাল, বেতনবৃদ্ধি, যুদ্ধকালীন বোনাস ও ইউনিয়নের স্বীকৃতি। ইউনিয়নের অকম্যুনিস্ট অংশ কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর ইচ্ছাকে পাশ কাটিয়ে এক দ্রুত নিষ্পত্তিতে পৌঁছায়। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুনরায় কাজ শুরু হয়।[৪৩]

১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলনের সময় ঢাকার, হুগলির ও কেশোরাম মিলের ধর্মঘট ছিল রাজনৈতিক ও সুসংগঠিত। এই সব জায়গাতেই জাতীয়তাবাদীরা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই অবস্থায় কম্যুনিস্টরা হস্তক্ষেপ এবং আর্থনীতিক দাবি তুলে আন্দোলনগুলিকে আর্থনীতিক রূপ দেবার চেষ্টা করে। যে সব আর্থনীতিক দাবি শ্রমিকদের আন্দোলিত করেছিল তার মধ্যে ছিল নির্দিষ্ট দামে ও যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিকদের খাদ্যশস্যর, বিশেষতঃ চালের নিয়মিত সরবরাহ, মূল্য স্তরের সঙ্গে মানানসই হারে বর্ধিত মহার্ঘভাতা, বোনাস, শ্রমিকদের রোজগার ব্যাহত করতে পারে এই ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি ও খারাপ কাপড়ের থান (ইয়ার্ন) সরবরাহের বিরুদ্ধে আগেই উপযুক্ত সতর্কতা গ্রহণ। মালিকপক্ষ পঞ্চাশ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি ও কমদামে খাদ্যশস্য সরবরাহের মত কিছু দাবি মেনে নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয়। কাজেই, এটা স্পষ্ট যে জাতীয়তাবাদীরা আন্দোলন শুরু করলেও কম্যুনিস্টরা কিছু আর্থনীতিক দাবি তুলে ধরে সেগুলির নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে, তারপরে যুদ্ধের সময় শিল্পে শান্তির নাম করে আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়ে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুকৌশলে পরাভূত করে।[৪৪] জাতীয়তাবাদী

রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার ও' জনযুদ্ধ' সমর্থক কম্যুনিস্টদের উৎপাদন অব্যাহত রাখার প্রয়াসের ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বস্ত্রশিল্পেও শ্রমিক আন্দোলনে স্তব্ধতা আসে। তবুও, বিচ্ছিন্নভাবে কিছুকিছু ক্ষেত্রে এই সময়ে ধর্মঘট হয়েছে এবং কম্যুনিস্টরা যত দ্রুত সম্ভব সেগুলি মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

কয়লা খনি— খনি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ গোড়া থেকেই কঠিন ছিল ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ফলে তা আরও দুরূহ হয়ে পড়ে। মালিকপক্ষ ও সরকারের দমননীতির দ্বারা আন্দোলনের যে কোনও চেষ্টাকেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিত। কেবলমাত্র ১৯৪৪ সালের পর কম্যুনিস্ট প্রভাবিত বেঙ্গল কোল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পুনঃ রেজিস্ট্রি-করণের পর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তাদের কাজ শুরু করার কিছুটা সুযোগ পায়। কিন্তু কম্যুনিস্ট বা রায়বাদীদের মত যুদ্ধ সমর্থক গোষ্ঠীগুলিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে উল্লেখযোগ্য কোন সংগঠন বা আন্দোলনের ছাপ রাখতে পারে নি।

চা-বাগিচা— যুদ্ধের সময়ে তীব্র খাদ্য সংকট সত্ত্বেও দার্জিলিং-য়ের চা শ্রমিকদের মধ্যে কোনও সংগঠিত আন্দোলন হয়নি। জেলায় কম্যুনিস্ট সংগঠনের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৯৪৩ সালে। প্রথম জেলকমিটি গঠিত হয় কেবলমাত্র ১৯৪৫ সালে এবং যুদ্ধ শেষ হবার পরেই তীব্র আন্দোলনের সূত্রপাত। ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিও যুদ্ধের সময় শান্ত ছিল। সেখানে আন্দোলন শুরু হয় দার্জিলিংয়েরও পরে।

একমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা-বাগানেই যুদ্ধের সময়ে আন্দোলনের কিছু চিহ্ন দেখা যায়।[৪৫] এখানে সংগঠক সর্বপ্রথম শুরু করেন কল্পতরু সেনগুপ্ত, নগেন দের মত কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন কিছু যুবক যাঁরা তখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসেরই সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁরা গঠন করেন চট্টগ্রাম চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন। মালিকদের সৃষ্ট অসম্ভব বিঘ্নের মধ্যে গোপনে বাগানে বাগানে ঘুরে তাঁদের কাজ করতে হয়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে বুলিয়ন কোম্পানি পরিচালিত ৬টি বাগানের ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কে সরকারী অ্যাওয়ার্ড রূপায়ন প্রভৃতি দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। দীর্ঘকাল চলার পর এই আন্দোলন অবশ্য ভেঙে যায়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর স্থানীয় লেবার ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মানেক হোমী, যিনি যুদ্ধ সমর্থক ছিলেন, কুলটি-বার্নপুরের ইস্পাত ও লৌহ কারখানার শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ভাবে থেকে ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোসের মাধ্যমে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু লেবার ফেডারেশনের বাহ্যতঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের পর শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। ১৯৪০ সালের এপ্রিলে ইসকো কর্তৃপক্ষ ৬$\frac{১}{৪}$% হারে যুদ্ধ বোনাস ঘোষণা করলে শ্রমিকেরা তাকে পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করে। শ্রমিদের মধ্যে হোমী বিরোধী গোষ্ঠীরা প্রচার শুরু করে। সম্ভবতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলির চ্যালেঞ্জের সামনে শ্রমিকদের উপর নিজের প্রভাব বজায় রাখতে হোমীও কিছুদিন বাদে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন করেন।

এই সময়ে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি, চাকুরির নিরাপত্তা বাসস্থান প্রভৃতি দাবিতে অনেকগুলি আকস্মিক (lightning) ধর্মঘট হয়। অবশ্য সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী [৪৬] ধর্মঘটগুলির প্রকৃত কারণ ছিল হোমী ও অন্যান্য কয়েকজন লেবার ফেডারেশন নেতার বিরুদ্ধে বার্নপুর অঞ্চলে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। শ্রমিকদের প্রকৃত অভাব অভিযোগের কারণ, যার সুযোগ বহিরাগত নেতারা নিতে চেয়েছিলেন, কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের দৃষ্টি একেবারেই এড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কাছে শ্রমিক অশান্তি সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল আরও বেশি করে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৯৪১ সালের পর থেকে এমনকি বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ও কুলটি বার্নপুরে কোনও বড় ধরনের আন্দোলন বা ধর্মঘট হয় নি। এর কারণ হল অংশত সরকারের দমন নীতি ও অংশত এই যে লেবার ফেডারেশন, রায়বাদী ও কম্যুনিস্টরাই এখানের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে প্রয়াসী ছিল এবং তারা সকলেই ছিল যুদ্ধের সমর্থক। কাজেই শ্রমিক পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটুক এমন কিছু করা থেকে তারা নিবৃত্ত ছিল।

বন্দর ও ডক— যুদ্ধ স্বভাবতই বন্দর ও ডকের আর্থনীতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যাতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলে তা দেখা, অন্যদিকে সরকারকে বিব্রত করার জন্য সরকার বিরোধীরা বন্দরে অচলাবস্থা আনতে চেয়েছিল। যেমন, তখন নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির কলকাতার জেলা কমিটির নামে ১৯৪০ সালে জাহাজী বন্দর ও ডক কর্মীদের উদ্দেশে এক আবেদন পত্রে বলা হয়,[৪৭] ''আন্দোলন চালিয়ে যাও, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত কর।'' কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে গুরুতর আর্থনীতিক দাবি দাওয়া থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময়ে কলকাতা বন্দরে কোনও জঙ্গি বা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন হয় নি।

১৯৪১ সাল থেকে নেপাল ভট্টাচার্যের (ওয়ার্কার্স লীগ) নেতৃত্বাধীন ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েসন (সি. পি. টি. ই. এ.) এবং সি. এম. পি. নেতা শিবনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন সদ্য প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (সি.পি.টি ডব্লু. ইউ.) যুদ্ধকালীন আর্থনীতিক সুযোগ সুবিধা—সাধারণ বেতন বৃদ্ধি ও উচ্চতর মহার্ঘভাতার—দাবি জানাতে থাকে।[৪৮] ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে এই দুটি ইউনিয়ন বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্য জোর চেষ্টা চালায়। ৫ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা মহার্ঘভাতার দাবিতে পোর্ট কমিশনারের পাঁচ হাজার শ্রমিক ১৯৪২-এর ৩১শে অগস্ট ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে এক সম্মানজনক নিষ্পত্তি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা শীঘ্রই কাজে ফিরে যায়। পোর্ট কর্তৃপক্ষ মহার্ঘভাতা ৮ টাকায় বাড়ান হবে বলে ঘোষণা করলেও তা শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করে না।[৪৯] তিনটি পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন—সি.পি.টি.ই.এ, সি.পি.টি. ডব্লু. ইউ এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ যুক্তভাবে ঘোষণা করে যে তাদের দাবি মানা না হলে ১৬ই অক্টোবরের পর যে কোন দিন তারা ধর্মঘট শুরু করবে।[৫০]

ইতিমধ্যে নেপাল ভট্টাচার্য ও শিবনাথ ব্যানার্জি সরকারী দমন নীতির শিকার হয়েছেন। কম্যুনিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হল ওয়ার্ডার সাইড ওয়ার্কার্স ফেডারেশন নামে একটি নতুন সংগঠন। বর্ধিত মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য যে সব দাবি ছিল বন্দর শ্রমিকদের সেগুলি আদায় করাই এই সংগঠনের লক্ষ্য বলে বলা হয়। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের অবশ্য এই রিপোর্ট ছিল যে[৫১] আশু ধর্মঘটের কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা বন্দর শ্রমিকদের দাবি নিয়ে বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে তখনও আলোচনা চলছে। পরবর্তীকালে গোয়েন্দাদের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণ হয়েছিল।

পোর্ট ইউনিয়নগুলির যুক্ত কমিটি ২৯শে অক্টোবর থেকে ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করে, কিন্তু বাংলা সরকার ভারত সরকারের কাছে তাদের দাবিগুলি বিচারের জন্য একজন এডজুডিকেটর নিয়োগের সুপারিশ করলে ধর্মঘট পিছিয়ে দিতে রাজি হয়। এমনকি বাংলার গভর্নর তাঁর গোপন রিপোর্টে বন্দর শ্রমিকদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন।[৫২] কিন্তু বছর যখন শেষ হল তখনও কোন এডজুডিকেশন বোর্ড গঠিত হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধ সমর্থক রাজনৈতিক নেতৃত্ব অস্থির শ্রমিকদের সংযত রেখেছিল।

কলকাতা ট্রামওয়ে— কলকাতার ট্রাম শ্রমিকরা যদিও সংখ্যায় বিপুল ছিল না, তবু সংগ্রামী ঐতিহ্যের জন্য বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রবর্তী অংশ বলে স্বীকৃত। ১৯৩৮-৩৯ সালে কলকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত থাকলেও রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিকদের যুক্ত মঞ্চ ও যুক্ত আন্দোলনের প্রতীক বলে পরিগণিত হত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর সরকারের দমন নীতি স্বাভাবিক ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপকে দারুণ ভাবে ব্যাহত করে। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি প্রায় সমস্ত ইউনিয়ন সংগঠক সরকারী আদেশে কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত হবার ফলে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অস্তিত্ব কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় ১৯৪২ সালে আড়াই মাসের মধ্যে তিনবার ট্রাম শ্রমিকরা কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের পরামর্শ উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট করে।[৫৩] মহার্ঘভাতা, ছুটির নিয়ম, সঞ্চিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলার সুযোগ, চাকুরির নিরাপত্তা প্রভৃতি দাবিতে ইউনিয়ন নেতৃত্বের সঙ্গে আগে কোন আলোচনা না করেই শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে দেয়। ধর্মঘটের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার আপোসের মনোভাব দেখায়। ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বও তাতে সাড়া দিতে উৎসুক ছিল।[৫৪] এর ফলে প্রতিবারই দ্রুত ধর্মঘটের মীমাংসা হয়ে যায়।

যুদ্ধকালে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ হলে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের খাদ্য, বাসস্থান ও পরিবারকে দেশে পাঠানর ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি নিয়ে শ্রমিকরা উত্তেজিত ছিল। যুদ্ধের সময়ে নিজেদের গরজেই কর্তৃপক্ষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্রমিকদের শান্ত করতে উদগ্রীব ছিল। একই সময়, ট্রাম শ্রমিক সংগঠনের উপর কম্যুনিস্টরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করে এবং সাংঘাতিক আর্থনীতিক দুরাবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের ক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথে সংযত রাখতে উদ্যোগী হয়। এই সময়ে যে কয়েকটি অকম্যুনিস্ট ইউনিয়ন গঠিত হয়, তাদের তেমন উল্লেখ করার মত কোনও শক্তি ছিল না।

উপসংহার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট বেরিয়ে আসে।

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ যা চিরকালই ছিল দুর্বল তা এই সময়ে ন্যূনতম পর্যায়ে পৌঁছয়। জাতীয়তাবাদীরা

তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকদের জড়ো করতে পারে নি; অন্যদিকে, শ্রমিকরা তাদের আর্থনীতিক দাবি দাওয়ার সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের সমর্থন পায় নি। কংগ্রেসের ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শিল্প শ্রমিকের কার্যত প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছিল শ্রমিককে নিজ ক্ষেত্রে টেনে আনতে ও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে কংগ্রেসের ব্যর্থতা। এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছিল কম্যুনিস্টরা। সরকারী দমননীতির ফলে জাতীয়তাবাদী শ্রমিকসংগঠকদের ক্ষেত্র থেকে অপসারণের ফলে কম্যুনিস্টরা আরও সুবিধা পেয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময়ে বিশেষত ১৯৪১-৪৫ সালের মধ্যে কম্যুনিস্টরা শ্রমিকদের মধ্যে দ্রুত সাংগঠনিক বিস্তার ঘটায়। কিন্তু এই সাংগঠনিক বৃদ্ধিকে শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসবাদী আদর্শ ও রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের সঙ্গে সমার্থক করে দেখা যায় না। যুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে অধিকাংশ শ্রমিক আসনে কংগ্রেসী প্রার্থীদের কাছে কম্যুনিস্টদের পরাজয় একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হবসবমের শ্রেণী ও আন্দোলন ও সংগঠন বা সংগঠনের নেতৃত্বকে এক করে দেখতে গিয়ে সামাজিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে উচ্চারিত সতর্কবাণী[৫৫] বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সর্বোপরি, জাতীয়তাবাদী সংগঠকদের অনুপস্থিতি ও সংগঠিত কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীগুলির যুদ্ধ সমর্থক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও, এরকম বহু উদাহরণ বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি যেখানে শ্রমিকরা নিজেরা তাদের আশু আর্থনীতিক সমস্যার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন বা ধর্মঘট শুরু করেছে। এগুলির অধিকাংশই স্বল্পস্থায়ী হয়েছে কেননা সরকার ও মালিকপক্ষ উভয়েই যুদ্ধের সময়ে দ্রুত সমাধানের জন্য উৎসুক ছিল। তাসত্ত্বেও এই আন্দোলনগুলি সংগঠিত রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ বৃত্তের বাইরে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের চিহ্ন বহন করে।

সূত্রনির্দেশ

১. পি.সি.যোশী— *আওয়ার রিপ্লাই টু কংগ্রেস চার্জেস* (বোম্বাই, ১৯৪৫) ভল্যুম ১, পৃ. ২৪
২. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, কলিকাতা পুলিশ বিভাগ, ফাইল নং ৫১৮/৪০, রিপোর্ট তাং ২৭/২/৪০
৩. *ফরোয়ার্ড* (সাপ্তাহিক)- ১/৬/১৯৪০
৪. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ফাইল নং ৫১৮/৪০ তাং ১১/৬,১৩/৬, ৬/৮/৪০
৫. গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, হোম (পলিটিক্যাল) ফাইল নং ৩/৭/৪০ (১৯৪০)-অ্যাপ্রিসিয়েশন্ ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অফ বেংগল তাং ২৭/২/১৯৪০, ৩/১/১৯৪১
৬. ওভারস্ট্রীট এণ্ড উইডমিলার- *কম্যুনিজম ইন ইণ্ডিয়া* (বার্কলে, ১৯৫৯) পৃ. ১৭৪
৭. স্পেশাল ব্রাঞ্চ-ফাইল নং ৫১৬/৩৯ রিপোর্ট তাং ১২/৮/৩৯
৮. ওভারস্ট্রীট এণ্ড উইডমিলার-প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১
৯. এন. পট্টভিরামণ- *পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস* (নয়াদিল্লী, ১৯৬৭) পৃ. ৮৯
১০. জি. ও আই হোম (পল) ১৯৪০, ফাইল নং ৩৭/১, ৩৭/৩৯, ৩৭/৫৫
১১. *দ্য কম্যুনিস্ট*—ভল্যুম ২, সংখ্যা ২, সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
১২. *অমৃতবাজার পত্রিকা*—১৫/২/১৯৪০
১৩. *অমৃতবাজার পত্রিকা*—১৫/৭/১৯৪০
১৪. ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আই. বি) বেংগল পুলিশ রেকর্ডস: রিভিয়্যু অফ রিভোল্যুশনারী ম্যাটারস তাং ২৯/১/১৯৪২
১৫. জি.ও.আই হোম (পল) ১৯৪১, ফাইল নং ১২৮/৪১
১৬. জি.ও.আই, হোম (পল) ১৯৪১, ফাইল নং ৭/১/৪১
১৭. আই.বি.রেকর্ডস—সেন্ট্রাল কমিটি পার্টি লেটার নং ৫৪, তাং, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১
১৮. *দ্য কম্যুনিস্ট*—ভল্যুম ৩, সংখ্যা ৯, ডিসেম্বর, ৪১-জানুয়ারী ১৯৪২
১৯. ওভারস্ট্রীট এণ্ড উইডমিলার-প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
২০. ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট বেংগল—এপ্রিল, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৪২
২১. ঐ—জুলাই, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৪২
২২. আই.বি. রেকর্ডস—রিভিয়্যু অফ রিভোল্যুশনারী ম্যাটারস তাং ২০/৮/১৯৪২, ১৪/১১/১৯৪২
২৩. *জনযুদ্ধ*—সম্পাদকীয় ১৪/১০/১৯৪২
২৪. *ওভারস্ট্রীট এণ্ড উইডমিলার*—প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
২৫. আই.বি.রেকর্ডস-রিভিয়্যু অফ রিভোল্যুশনারী ম্যাটারস তাং ১৪/১১/১৯৪২
২৬. *জনযুদ্ধ*—২৮/৮/ ১৯৪৩. সরোজ মুখার্জী- নূতন পথে শ্রমিক আন্দোলন
২৭. পট্টাভিরামন-প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

২৮. ওভারস্ট্রীট এণ্ড উইল্ডমিলার-প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭
২৯. এম. আর. মাসানী— *দ্য কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪) পৃ.৮৪
৩০. জি.ও.আই—হোম (পল) ১৯৪৪, ফাইল, নং ৭/৫/৪৪
৩১. ফোর্টনাইটলী রিপোর্ট, বেংগল- জানুয়ারী, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৪৪
৩২. ঐ -মে, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৪৪, জুন, প্রথমার্ধ, ১৯৪৪
৩৩. ঐ -জুলাই, প্রথমার্ধ, ১৯৪৪
৩৪. জি.ও.আই, হোম (পল) ১৯৪৪, ফাইল নং ৭/৫/৪৪
৩৫. আই.বি., রিভিয়্যু অফ রিভোল্যুশনারী ম্যাটারস, জুন ১৯৪৫
৩৬. এ. আই, সি. সি. -ফাইল নং জি ২৩ (পোর্ট-২) ১৯৪৫-৪৬ (নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম লাইব্রেরী)
৩৭. জি.ও. আই, হোম (পল) ফাইল নং ৩/১৬/৪২ পার্ট ১
৩৮. ফোর্টনাটইলি রিপোর্ট বেংগল অগস্ট, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৪২
৩৯. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ফাইল নং ৬৭৬/৪৩
৪০. আই.বি., রিভিয়্যু অফ রিভোল্যুশনারী ম্যাটারস তাং ৪/১/৪৫
৪১. *ন্যাশানাল ফ্রন্ট*—৩১/১২/৩৯
৪২. ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৩৮-৪৫
৪৩. ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট, বেংগল—মার্চ, প্রথমার্ধ, ১৯৪০
৪৪. *জনযুদ্ধ*—৬/৯/৪২
৪৫. স্পেশাল ব্রাঞ্চ—ফাইল নং ৫১৬/৪৪
৪৬. কোর্টনাইটলি রিপোর্ট, বেংগল—সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৪১
৪৭. গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, হোম (পল) ১৯৪০, ফাইল নং ৩৭/৩৯
৪৮. ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট, বেংগল-অক্টোবর দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৪০
৪৯. গভর্নমেন্ট অফ বেংগল, উইকলি রিপোর্ট অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস তাং ৫/৯/৪২, ১২/৯/৪২ ; ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট, বেংগল সেপ্টেম্বর, প্রথমার্ধ, ১৯৪২
৫০. জি.ও.বি.—উইকলি রিপোর্ট অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস, তাং ৩/১০/৪২
৫১. আই.বি.—রিভিয়ু অফ রিভোল্যুশনারী ম্যাটারস তাং ১৪/১১/৪২
৫২. লিনলিথগো পেপারস্ (নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম লাইব্রেরী) কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট, গভর্নর অফ বেংগল, নভেম্বর, প্রথমার্ধ, ১৯৪২
৫৩. বিস্তৃত আলোচনার জন্য নির্বাণ বসু -'চেঞ্জিং প্যাটার্নস অফ ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ইন দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ' (কোয়ার্টার্লি রিভিয়্যু অফ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, ভল্যুম ২৫, সংখ্যা ১)
৫৪. *জনযুদ্ধ*—৩০/৫/৪২
৫৫. হবসবম ই. জি.— ভূমিকা : জন ফস্টার—ক্লাস স্ট্রাগল এন্ড দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোল্যুশন : আর্লি ক্যাপিটালিসম্ ইন গ্রী ইংলিশ টাউনস্ (লন্ডন, ১৯৭৪)

জাত বৈষ্ণব কথা

অজিত দাস

দ্বিতীয় পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর

॥ এক ॥

মুর্শিদাবাদের চক ইসলামপুরের কাছে বড়দো (বড়দহ) গ্রাম। কৃষিজীবী মানুষ আর গোয়ালাদের বাস প্রধান। সেখানে আখড়া খুলেছেন শ্যামাদাস মহান্ত মশায়। জাত বৈষ্ণব। শিক্ষক ছিলেন, অবসর নিয়েছেন।

মনে প্রবল আগ্রহ। জাত বৈষ্ণব সমাজের আখড়া দেখব। বাবাজীর সঙ্গে কথা বলব, বৈষ্ণবী থাকলে দেখব। বৈষ্ণবীদের সম্পর্কে বাবাজীর কী বক্তব্য, তা জানার চেষ্টা করব। আখড়া বাবাজী আর সেবাদাসী বৈষ্ণবী নিয়েই তো যত কুৎসা আক্রমণ। নানা রকম মন মাতান রোমাঞ্চকর কাহিনীও পড়া যায়। কতটা সত্য? নাকি সবই লেখকের অবদমিত কামনার বিকৃত প্রকাশ? কেমন এদের জীবনযাত্রা? বাঙলার গ্রামে জাত বৈষ্ণব সমাজ গড়ে তোলায় এঁদের অনেক অবদান।

যোগাযোগ করলে মহান্ত বাবাজী জানালেন, কাল একাদশী ছিল। আজ দ্বাদশী। বেলা দুটোর পর আসতে পারেন।

যেতে তিনটে বেজে গেল। চক ইসলামপুর থেকে বহরমপুরগামী বাস-এ একটা স্টপ পরেই বড়দো স্টপ। মোটর গাড়ি থেকে নেমে ধুলো ভরা পথে অনেকটা হেঁটে গ্রাম পেরিয়ে আখড়া। প্রথমে একটা গোয়ালা বাড়ি, তারপর আখড়া—অনেকটা জায়গা নিয়ে। পূর্ব-দক্ষিণে ফসলের ক্ষেত, উত্তরে ফল বাগান। শান্ত নির্জন পরিবেশ। পুবমুখো আর দক্ষিণমুখো খানকয় নিচু চালা। পুবে একটি নির্মীয়মান পাকা ঘর। সেটা উনিশ-শ ছিয়াশি সাল। সমস্ত উঠোন নিকানো ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বেলগাছ উঁচু প্রশস্ত মাটির বেদী করে বাঁধান। পাশে নলকূপ। ছিমছাম, রুচিকর পরিবেশ। শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করা মানুষের চোখে বড়ই রমণীয় স্থান।

বাল্যকালে দেখা সে আখড়ার মত নয়। সেটা ছিল মন্দির বাড়ি। বিগ্রহ, পূজার্চনা, সন্ধ্যায় শাস্ত্রপাঠ, কীর্তনের আসর—কত কী হত। মুণ্ডিত মস্তক, মাথায় শিখা, গলায় কণ্ঠী, বহির্বাস পরিহিত বাবাজী — এই সব নিয়ে আখড়া।

এখানে শান্ত নির্জনতা। মহান্ত মশায় স্বাস্থ্যবান, শ্যামবর্ণ, মাথায় কাঁচা-পাকা দাড়ি, অনাবৃত দেহ উপবীত শোভিত, পরনে লুঙির মত গেরুয়া বহির্বাস। অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন। নিকান উঠোনে খেজুর পাতার পাটি পেতে দিলেন। সামনের চালায় এক মাঝ-বয়সী বৈষ্ণবী গৃহ কাজে ব্যস্ত।

বলুন কী জানতে চান? প্রশ্ন করলেন মহান্ত মশায়। কথা শুরু হল। কথায় কথা আসে। বললেন, না, না, আমি সে রকম বাবাজী নই। গৃহী মানুষ। স্ত্রী, পুত্র, পুত্র-বধূ সবই আছে। শিক্ষকতা করতাম। অবসর নিয়েছি এ বছরই। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে। পেনসন কবে পাব কে জানে। শিক্ষকতা করা এদেশে পাপ কর্ম। অসম্মানের চূড়ান্ত। আখড়া খুলেছি ক'বছর হল।

গৃহস্থ মানুষ হঠাৎ আখড়া খুললেন কেন?

গুরুগিরি আমাদের বংশগত ব্যবসা। বাবা করতেন। তিনি গত হয়েছেন। এখন আমি বংশধারাকে বজায় রাখছি। শিষ্য সেবক আছে। কীর্তন, মালসা ভোগ দেওয়া, বৈষ্ণব সমাজে পুরোহিতের কাজও করতে হয়। সংসারে থেকে এসব কাজ করা কঠিন। পড়া-শোনা, সাধন-ভোজন, শিষ্য সমাজের আসা-যাওয়া-থাকা—তাই এই আশ্রম খোলা।

ভেক দেন?

তা ত দিতেই হয়।

আমি বলছি—জাত বৈষ্ণব পরিবারের সন্তানদের ভেক দেওয়া হয়।

হয়! সংস্কারও করা হয়? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো ওটাকে অন্যায় কর্ম বলে!

কেন?

ডোর কৌপীন ধারণত সন্ন্যাস নেওয়া। তারপর সে আবার সংসারী হয় কেমন করে?

ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন হয় কেমন করে? সেও ত দণ্ড ধারণ করে। সন্ন্যাস নেয়। ভিক্ষা করে। বৈষ্ণবেরও এটা উপনয়ন দ্বিজত্ব প্রাপ্তি।

একটু থেমে দম নিয়ে মহান্ত মশায় বললেন, নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত সন্ন্যাসী থেকে আবার সংসারী হয়েছিলেন কেমন করে? ভূত যেমন আছে, তেমনি ভূত ছাড়াবার মন্ত্রও আছে। 'পুনর্মূষিক ভব'-মন্ত্র না থাকলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বৈষ্ণবদের কেউ উপবীত ধারণ করে, কেউ করে না কেন? ভেক-এর সময় উপবীত দেওয়া হয় সকলকেই। কেউ রাখে, কেউ রাখে না।

ব্রাহ্মণরা ত সবাই রাখে।

সেই ত কথা। আমাদের সমাজের কি মাথামুণ্ডু আছে? কে কার কথা শোনে? আজকাল অনেকে ভেকই নেয় না। বলি, বাবা, বামুনদের দেখ। ওরা নিজের সমাজকে ঠিক মান্য করে চলে। সে কারণে ওদের মান মর্যাদা আছে। যত অনাচারই করুক, তবু ওরা বামুন। সোনার আংটি। আর লোকে আমাদের হেনস্তা করে।

কিন্তু বৈষ্ণবের উপবীত কেন? তার কণ্ঠিই ত বড় চিহ্ন।

তা ঠিক। তবু বৈষ্ণব হচ্ছে ব্রাহ্মণের সমপর্যায়ের। বৈষ্ণব শূদ্র নয়। সমাজে পৈতের বড় কদর। ওটা না থাকলে লোকে মানে না।

কিন্তু ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করেই ত জাত বৈষ্ণবের সৃষ্টি। আবার তবে ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করা কেন?

অস্বীকার কোন্‌টা? তার শ্রেষ্ঠত্ব। তারা বলছে পূজাপাঠের, ধর্মচর্চার এক মাত্র অধিকারী। আমরা বলছি, না, আমরাও অধিকারী।

বিয়ে দেন?

দেব না কেন?

মালা চন্দনে বিয়ে হয়?

না। যজুর্বেদীয় মতে।

মালা চন্দনে বিয়ে হয় না?

এখন আর ওসব হয় না। লোকে হাসে। খুব যারা গরিব, মোটে খরচা করতে পারে না—তারা করে—তাও হয় না।

শ্রাদ্ধ কী ভাবে হয়?

শ্রাদ্ধ হয় না। বৈষ্ণবের পিণ্ডদান নেই। অশৌচ পালন করে। মহাপ্রভুর ভোগ দিয়ে শুদ্ধ হয়। আসলে কিন্তু বৈষ্ণবের অশৌচ ছিল না। খাওয়ার বিধি ছিল না। তেরাত্রি পালন করতে হত, সিদ্ধ পক্ক খেয়ে। কীর্তন দিয়ে বৈষ্ণব ভোজন করালেই সব কাজ শেষ হয়ে যেত। এটা অবশ্য আমার শোনা কথা।

হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে ত প্রশ্নই ওঠে না।

হ্যাঁ, তাদের অশৌচ আর কে পালন করবে। বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের মধ্যে বাস করার ফলে আমাদের সমাজের রীতি নীতিও পাল্টে যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের পাশে সংখ্যা লঘু থাকলে যা হয়।

বিকাল নেমেছে। বৈষ্ণবী উঠোনে ঘুর ঘুর করছে।

মহান্ত মশায় বলে উঠলেন, আমাদের একটু চা দিয়ো গো, মেয়ে।

মেয়ে! আমার উপন্যাস পাঠের মেজাজ ধাক্কা খেল। সেবাদাসী নয় তাহলে?

মহান্তমশায় সম্ভবত আমার মনোভাব বুঝেই বললেন, আমি ত এখানে সব সময় থাকিনে। ওই মেয়েই সব দেখে। বিধবা, বাপের বাড়িতে ছিল, ভাইরা রাখতে চায় না। আমার শিষ্যা। এসে বলল, কী করি এখন? বললাম, এখানেই থাক। তাই আছে। খুব দুঃখী। বাইরে থেকে সমাজকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না। গুরুগিরি করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। মানুষ তার হাজার সমস্যার কথা তুলে ধরে। মেয়েদেরই বেশি। সেকালে আখড়ায় অত মেয়েমানুষের ভিড় হত কেন? বিধবা আর স্বামী পরিত্যক্তারা প্রাণের দায়ে ছুটে এসে আখড়ায় আসত। তাতে কিছু এলোমেলো কাণ্ড হত বৈকি।

এখনও মেয়ে ওই ভাবে আসে?

নেবে কে? আখড়া খুলে একবার ডাক দিয়ে দেখুন। এখন ত নানা ধর্মীয় এবং সরকারী আশ্রম খোলা হয়েছে অনাথদের জন্য। তবু আখড়া খুলে ডাক দিয়ে দেখুন। আর সেকালে তো আখড়াই সম্বল ছিল। আখড়া ছাড়া হতভাগিনীদের আর কোন্ আশ্রয় ছিল? শুধু গাল মন্দ করলে ত হয় না।

বৈষ্ণবী চা দিয়ে গেল।

বসে ভাবছিলাম আখড়া আর সেবাদাসীর উৎস কি তবে বৌদ্ধ বিহার—ভিক্ষুণী সংঘ? আখড়া কি বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণ? জাত বৈষ্ণবের সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের কোথায় যেন একটা মিল আছে বলে মনে হল। হিন্দু কাঠামোর মধ্যে বৌদ্ধ সমাজের চাপেই বুঝি গড়ে উঠেছিল জাত বৈষ্ণব সমাজ।

মহান্ত মশায় এক সময় বলে উঠলেন, মহাপ্রভুর তত্ত্ব কী বলুন ত?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, আপনিই বলুন।

বলছি। পুঁথির কথা বলব না। নিজে যা বুঝেছি, তাই বলব।

হ্যাঁ। সেটাই শুনব।

রাজা সুবুদ্ধি রায়ের গল্প। হুসেন শাহর বেগম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কারাগারে বন্দী সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করল মুখে গো-মাংস ঠেকিয়ে। তারপর তাকে মুক্ত করে দিল। বৃদ্ধ রাজা বাইরে এসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগল—বিধান চেয়ে। হিন্দু হয়ে থাকতে চাই। কী করতে হবে, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত?

পণ্ডিতরা বিধান দিলেন—তপ্তগলিত কাঞ্চন গলাধঃ-করণ করতে হবে।

সে কী! সে ত নিশ্চিত মৃত্যু।

ওটাই বিধান। বিকল্প নেই।

নবদ্বীপ, কাশী—সর্বত্র পণ্ডিত সমাজের ওই একই বিধান।

কাশীতেই সুবুদ্ধি রায় দেখা পেয়ে গেলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর। বললেন, প্রভু, আপনি কী বলেন? আমি বাঁচতে চাই। আমার ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে থাকতে চাই।

মহাপ্রভু বললেন, গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে বল, হরি বোল।

সুবুদ্ধি রায় তা-ই করলেন। মহাপ্রভু বললেন, যাও, তুমি মুক্ত। পবিত্র।

কাহিনী থামিয়ে মহান্ত মশায় বললেন, ইনিই আমাদের মহাপ্রভু। এটাই তাঁর বাণী—তত্ত্ব। মানুষ বাঁচতে চায়, উঠতে চায়, সুন্দর হতে চায়। তাকে শাস্ত্রীয় তপ্তগলিত স্বর্ণ পান করিয়ে হত্যা করা হবে কেন? তাই মহাপ্রভুকে মাথায় নিয়ে জাত বৈষ্ণব সমাজ গড়া হয়েছে। মহান্ত মশায়ের কণ্ঠ আবেগে জড়িত।

প্রশ্ন করলাম, আপনার বাড়ি নদীয়া জেলায়। মুর্শিদাবাদের এই গ্রামে আখড়া খুললেন কেন?

তিনি হাসলেন। ভাবছেন, কোন শিষ্যর ঘাড় ভেঙে জমি দখল করে এসব করছি? না। এ জমিটা আমার মাতুল বংশের। এখানে বাইশ বিঘার একটা ফল বাগান ছিল তাদের। ছোটখাট জমিদার ছিলেন। তারপর যা হয়। গরিব হয়ে গেল। জমি প্রায় সবই বেহাত। পিছন দিকে খানিকটা বাগান আছে। লোকে দখল করে নিচ্ছে সব। আমিও এটুকু নিয়ে আখড়া খুলেছি। এরপরই তিনি মাতৃকুলের যিনি এই সম্পত্তির পত্তন করেছিলেন তাঁর নাম করলেন। পদবী চক্রবর্তী।

চমক লাগল শুনে। ব্রাহ্মণ পরিবার?

হ্যাঁ।

মনে মনে হাসলাম। জাত বৈষ্ণব সমাজের এই এক প্রবণতা। সবাই বলতে চায় তারা উচ্চবর্ণসম্ভূত। তথাকথিত ইতিহাস বলে অন্য কথা। সব নিম্ন বর্ণাগত। যারা উচ্চবর্ণের, সামাজিক সুযোগভোগী তারা জাত ছেড়ে উঁচু থেকে নিচু হবেই বা কেন? চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ ত বৈষ্ণবগুরু হয়ে চুটিয়ে শিষ্য করে জমিদারী ফাঁদব।

মহান্ত মশায় বললেন, এক শরিক বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তিনি আমার দাদামশায়ের ঠাকুরদা।

তাঁরা কেউ নেই?

আছে। গরিব হয়েছে। দুই শরিকই চক-ইসলামপুরে বাস করে। এক শরিক বামুন, আরেক শরিক বৈষ্ণব। তিনি হাসলেন। লোকের ধারণা জাত বৈষ্ণব মানেই ভিখিরি আর ছোটলোক। তা নয়। বামুন যেমন মুসলমান হয়েছে, খ্রিস্টান হয়েছে, তেমনই জাত বৈষ্ণবও হয়েছে। জাত বৈষ্ণব পাঁচ মিশেলি সমাজ। এখানে উঁচুও আছে, নিচুও আছে। জাত বৈষ্ণব খুঁজতে শুধু আখড়ায় গেলে হবে না, সমাজে ঘুরতে হবে। হাজার হাজার গৃহস্থ আছে—জাত বৈষ্ণব—যারা ভিখিরি নয়। উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, জমিদার, জোতদার—আবার ভিখিরিও আছে। যারা গুটি কয় ভিখিরি দেখে জাত বৈষ্ণবের পরিচয় বোঝে—তারা কাঁচা।

মহান্ত মশায়ের কথাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। আমি ত এক খ্রিস্টান পরিবারকে জানি, যাদের আরেক শাখা হিন্দু হয়েই আছে। একটি মুসলমান পরিবারের কথা জানি—যাদের মূল অংশ হিন্দুই আছে আজও। এবং দুপক্ষই একই শহরে বসবাসকারী। তবে মহান্ত মশায়ের মাতুল বংশেই বা তা সম্ভব হবে না কেন?

সন্ধ্যা নামছে। বৈষ্ণবী প্রদীপ নিয়ে উঠোন পরিক্রমা করছে। কণ্ঠে কীর্তনের সুর।

বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। মহান্ত মশায় দূর সম্পর্কে আমার আত্মীয়। অতএব তিনি বলতে থাকলেন, আজ এখানে থেকে যান। রাতে নিরিবিলিতে অনেক কথা হবে। মনে অনেক কথা জমে আছে। আমাদের সমাজকে লোকে হেয় করে— এর স্বপক্ষে বলার মত লোক নেই বলে। আমার ত লেখার চর্চা নেই।

বৈষ্ণব ঘরে উঠছে। তার কণ্ঠে গীত আরও স্পষ্ট হয়েছে।

পথে পা বাড়ালাম।

রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা ইসলামপুর চকের এক বৈষ্ণব পরিবারে। সেখানে ফিরে শ্যামাদাস মহান্তর মামার বাড়ির কথা তুলতেই গৃহকর্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির পিছনেই সে বাড়ি।

ওঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন?

হ্যাঁ।

আরেক শরিক বামুনই আছেন ?

হ্যাঁ

কোথায় থাকেন ?

গৃহস্বামী বললেন, বুড়া ঠাকুর ? আগে ওই বাড়িতেই ছিল, এখন বাজারের মধ্যে উঠে গিয়েছে।

কী করেন ?

পুরুতের কাজ। আর দোকানে হিসাবের খাতাপত্র লেখে।

ওঁরা কি স্বীকার করেন এক পরিবারের লোক বলে ?

তা করবে না কেন ? শরিক ত। বুড়া ঠাকুরকে ডাকিয়ে আনছি।

বুড়া ঠাকুর ডাক নাম। পোশাকী নাম যাদবেন্দু চক্রবর্তী। বাবার নাম বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্যপক্ষে রামানন্দ দাস ও সুধীর দাস—দু ভাই। বাবা কিশোরী দাস। দুই পরিবার এখনও বিষয় সম্পত্তির শরিক। পরিবারের নিয়ম হচ্ছে, বড়দোর বাগানে ফল পাকলে সবাই সেখানে খাবে। বংশের বড় ছেলে প্রথম ফল পাড়বে—ঠাকুরের ভোগ দেবে। তারপর শরিকদের মধ্যে ফল ভাগ হবে। আগে রামানন্দ প্রথম ফল পাড়তেন। তাঁর মৃত্যুর পর বুড়া ঠাকুর পাড়েন।

একটা দৃষ্টান্ত মিলল। উচ্চবর্ণের মানুষ জাত খুইয়ে স্বেচ্ছায় জাত বৈষ্ণবের খাতায় নাম লিখিয়েছিল।

আশ্রয় দাতা পরিবার ব্যবসায়ী। স্বচ্ছল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কণ্ঠীধারী। ছেলেরা স্কুল কলেজের ছাত্র। মেয়ে বি.এ. পরীক্ষার্থিনী।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জাত বৈষ্ণব সমাজ সম্পর্কে এক সমীক্ষকের লেখা পড়েছিলাম। সবাই নিম্নবর্ণজাত বা অবৈধ বিবাহ জাত। ভিক্ষা এদের মূল বৃত্তি। হালে কৃষি, ব্যবসা এবং চাকরিতে অনেকে যোগ দিয়ে অন্য উপাধি ও জাতি পরিচয় গ্রহণের ফলে জাত বৈষ্ণবদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার পথে।

এঁরা দেখলাম গোঁড়া পরিবার। কীর্তন গাইতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী—দুজনেই।

বললাম, ভেক হয় আপনাদের পরিবারে ?

হ্যাঁ, হয়। তিন ছেলের হয়েছে। দুই ছেলের দিতে হবে।

বিয়ে মালা চন্দনে হয় ?

না। মন্ত্র পড়ে হয়।

শ্রাদ্ধ ?

মহাপ্রভুর ভোগ হয়।

এখানে জাত বৈষ্ণব আরও আছে ?

অল্প ক'ঘর আছে।

বৃত্তি কী ?

ব্যবসা, মাস্টারি, ডাক্তারি।

কী ডাক্তার ?

এম.বি.বি.এস।

এখানে লোকে আপনাদের ঘেন্না করে না ?

ঘেন্না করবে কেন ?

নিচু জাত বলে।

তা ত এখানে কেউ বলে না। এখানে অধিকাংশই তন্তুবায়। ধনী রেশম ব্যবসায়ী। আমার বড় ছেলে পাশ করে ব্যবসা করছে। বিয়ে দেব। তন্তুবায়রা বলছে, আমাদের মেয়ে নাও, অনেক টাকা পয়সা দেব। আমি বলেছি, জাতের মেয়ে নেব। দাদা থাকে বহরমপুরে। তার ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে বামুনের ঘরে।

সামাজিক বিয়ে ?

তা ঠিক নয়। তবে বিয়ে হয়েছে সামাজিক ভাবে, উভয় পক্ষের সম্মতিতে। মেলা মেশাও আছে দুই পরিবারের মধ্যে। আমরা ত শূদ্র নই। ব্রাহ্মণের সমতুল্য।

আপনারা জাত ছেড়ে অন্যজাতের মধ্যে ঢুকে যেতে চাচ্ছেন ?

কী যে বলেন। জাত ছাড়ব কেন? যাব কার মধ্যে ? এক বামুনের মধ্যে যাওয়া যায়।

ব্যাপারটা চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমতার চিন্তা এই বৈষ্ণব সমাজে চারিত হয়ে কত গভীরে প্রবিষ্ট। অন্যদিকে প্রচার চলছে, ওরা অচ্ছুত, ব্রাত্য।

গৃহস্বামী বললেন, আমাদের স্বজাতীয় পরিবার মুর্শিদাবাদে অনেক আছে। বড় বড় ধনী আছে। বহরমপুরে, কান্দীতে, জিয়াগঞ্জে আছে।

হ্যাঁ, জানি।

আপনি জানেন ?

জানি। বহরমপুরে একটি পরিবারকে জানি, যাদের ছেলে ডবলিউ. বি.সি.এস। জিয়াগঞ্জের ধনী স্বর্ণব্যবসায়ী। তাদের একটি পরিবারের দুই জামাইকে জানি। একজন রাইটার্সে বড় চাকুরে। অন্যজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আমেরিকার পি.এইচ.ডি।

চকেও একটা আখড়া আছে।

বললাম, আপনারা ওই আখড়ার অধীন ?

না। আমাদের গুরুদেব ব্রাহ্মণ।

আখড়ায় বাবাজী আছেন ?

হ্যাঁ, আমরা একজনকে থাকতে দিয়েছি।

তার মানে ?

প্রায় একশ বছর আগে আখড়াটার জন্ম। গ্রামেরই একটি লোক। পাড়ারই এক বিধবার সঙ্গে ভাব ভালবাসা করে

ফেলল। পাড়ার লোক বলল, ও ভাবে ত চলবে না। তোমরা বিয়ে কর। বিধবার বিয়ে তো সমাজে থেকে হবে না। আর এক জাতও নয়। তখন তারা ভেক নিয়ে সংসার পাতল। তখন পাড়ার লোক বলল, নবশাক পাড়ায় থাকা চলবে না। তারা সেখান থেকে উঠে এসে এখানে বাড়ি ঘর করল। তাদের সন্তান হয় নি। তারা মারা গেলে গ্রামের লোক ওটা নিয়ে আখড়া করে দিল। ট্রাস্টি আছে। এখন এক বাবাজীকে রাখা হয়েছে। গ্রামের লোক মাসিক চাঁদা দেয়। তাতেই চলে। আরেক জন বৈষ্ণবী আছে।

বৈষ্ণবীও আছে ?

হ্যাঁ, এক বুড়ী আছে। এর আগে ওরাই স্বামী-স্ত্রী থাকত। স্বামী মরে গেল। কেউ নেই। বুড়ী আর কোথায় যাবে ? আখড়ায় একজন কাজের লোক ত দরকার।

পরদিন সকালে আখড়ায় বসে বাবাজীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হল। সুপুরুষ প্রৌঢ়।

বললেন, আদি নিবাস রাজশাহী। জাত বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। ভেক হয়েছিল। সংসার ধর্মও করেছি। পরিবারবর্গ মালদহে থাকে। তারপর আমি ধর্মাশ্রয়ী হয়েছি। ভারতের সব বৈষ্ণবতীর্থ পরিক্রমা করেছি। তারপর দীক্ষা নিয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছি। এখানে থাকি। কিন্তু সুখ পাইনে। বসে দুদণ্ড শাস্ত্র আলোচনা করব, তার লোক মেলে না। ব্যবসায়ী সমাজ মাসিক চাঁদা দিয়ে খালাস। আখড়ায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে, পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যায় আসর করলে লোক হবে না। কেমন করে তবে আখড়া চলবে ? আমার কাজ হচ্ছে লোকের বাড়ি ঘুরে মাসিক দেয় চাঁদা আদায় করে বেড়ান। নইলে খাব কী ?

মানুষটি শিক্ষিত, ভদ্র, মিষ্টভাষী।

উঠে আসবার সময় বললাম, একটা প্রশ্ন করব ?

বলুন।

আপনার কণ্ঠী আছে। ওটাই ত বৈষ্ণবের চিহ্ন। আবার উপবীত কেন ?

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বাবাজী বললেন, ভেক নেবার সময় থেকেই ওটা আছে। ত্যাগ করিনি। বললেন আরও।

ঠিকই বলেছেন, কণ্ঠীই আমাদের চিহ্ন। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন ? আপনাকে বলি ব্যাপারটা। আখড়ার মালিক ত গ্রামবাসী,—নবশাক সমাজের মানুষ। তাদের কাছে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। তাদের পুরোহিত পৈতে-ধারী ব্রাহ্মণ। ওরা বৈষ্ণব মাহাত্ম্য বোঝে না। সংস্কারে আবদ্ধ। ওরা এখানে ভোগ রাগ দেয়। ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে খায়। পৈতেহীন পুরুত হলে ওদের ঠিক মন উঠে না। তাই পৈতেটা রাখি। অপ্রয়োজনীয় হলেও।

বাবাজী দাস মশায় হাসলেন। বস্তুত নিরুপায় হাসি।

জাত বৈষ্ণব পরিবার দীক্ষাগুরু করছে ব্রাহ্মণকে, তা নিয়ে গৌরববোধও করছে। আখড়ার বাবাজীরা উপবীত ধারণ করছেন। ব্রাহ্মণত্বের এই সংস্কার জাত বৈষ্ণব আন্দোলনের পরাজয়ের ঘোষণা ছাড়া আর কী ?

সমীক্ষক হয়ত ঠিকই বলেছেন, এ সমাজ অবলুপ্তির পথে।

॥ দুই ॥

বড়দোর আখড়ায় বসে শ্যামাদাস মহান্ত বৈষ্ণবী প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন, মনে সেগুলো ঘুরছেই। আখড়া খুলে ডাক দিলেই দলে দলে মেয়েরা এসে বৈষ্ণবী হয়ে যাবে এখনও। বৈষ্ণবী কেন হয় ? শুধু কি আর্থিক কারণেই ? না, শামাদাস যা বললেন, তা হল আর্থিক এবং সামাজিক কারণে। যেমন বড়দোর বৈষ্ণবী এসেছে। যেমন চক-এর বৈষ্ণব বৈষ্ণবী আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা।

রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে তাঁর *Bengal Peasant Life* গ্রন্থে বৈষ্ণবী হবার একটি কাহিনী পরিবেশন করেছেন। তিনি একটি কৃষিজীবী পরিবারের কাহিনী লিখেছেন। বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের একটি আগুরি পরিবারের কথা। পরিবারটি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু তাঁরা বর্ণাশ্রমী। যেমন ধর্মীয় গুরু আছে, তেমন কুল পুরোহিত আছে।

বৈষ্ণব আন্দোলন বিষয়ে গবেষকরা অনুযোগ করেন যে, এই আন্দোলন সাহিত্য সঙ্গীতে অবদান রেখেছে। কিন্তু সমাজ সংস্কার—অর্থাৎ বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ সতীদাহ বিধবা নির্যাতন বিরোধী কোন আন্দোলন করে নি। কেমন করে করবে ? এই সব অপকর্মই ত উচ্চবর্ণ বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবদান। বৈষ্ণব আন্দোলন শেষ অবধি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছে। ফলে উচ্চবর্ণীয় বৈষ্ণব আন্দোলনেও এসেছে গতানুগতিকতা। বাস্তব সমস্যার দিকে পিছন ফিরে ঘরে বসে কৃষ্ণনাম জপ করে আত্মমুক্তির চিন্তাই প্রধান হয়েছে। লাল বিহারী দের গ্রন্থে তাই দেখা যায়, এই সামন্ত পরিবারের পুরোহিতের বাবার মৃত্যু হলে তাঁর মাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে সতী করে দেওয়া হল।

কিন্তু নিম্নবর্ণের সমাজে সতী প্রথা নেই। এই কৃষিজীবী সমুন্ত পরিবারের ছোট বউ আদুরীর স্বামীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হল। আদুরী বিধবা হল। সে যুবতী এবং নিঃসন্তান।

গতানুগতিক হিন্দু সমাজে বিধবা বিয়ের চল নেই। তার পড়ে থাকা সুদীর্ঘ জীবন এবং ভরা যৌবনের জন্য করণীয় শুধু কৃচ্ছ্র সাধন। আত্ম নিপীড়ন। তার সংসারে ভাসুর আছে, জা আছে, শাশুড়ি আছে। সংসারে সচ্ছলতা আছে। কিন্তু আদুরীর কী আছে? স্বামী বর্তমানকালেও আদুরী সুখী ছিল না। মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট ছিল সে। প্রথমতঃ সন্তানহীনা। দ্বিতীয়ত স্বামী সন্দেহপ্রবণ। বাড়িতে প্রেমভক্ত নামে এক বৈরাগী ভিক্ষা নিতে আসে। আদুরী তাকে ভিক্ষা দিল। অমনি স্বামী ঘরে এসে বলল। তুমি ভিক্ষা দিতে গিয়ে বৈরাগীর দিকে তাকালে, হাসলে। আমি গোয়াল থেকে স্পষ্ট দেখলাম।

আদুরী অভিযোগ অস্বীকার করল। ফলে সে মার খেল স্বামীর হাতে। এই মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে এল তার মানসিক বিকার। সে উন্মাদিনী হল। লজ্জাশীলা আদুরী এখন ভাসুরের সামনে উলঙ্গিনী হয়ে নাচতে, গাইতে, হাসতে লাগল। অতএব ওঝা এল ভূত ছাড়াতে। ওঝা বলল, তুই কোথায় ছিলি?

ভূত বলল, পুকুর পাড়ের তালগাছে।

একে ধরলি কেন?

ও যে লোকের দিকে থাকায়, হাসে।

এই সামান্য উক্তি থেকেই তার ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। আর ভাসুরের সামনে দিগম্বরী নৃত্য ত তার অতৃপ্ত কামনা বাসনারই প্রকাশ। যে ভাসুরের সন্তান আছে, সক্ষম পুরুষ—তাকেই সে বলতে চেয়েছে স্বামীর অক্ষমতা অযোগ্যতার কথা। অর্থাৎ সে অতৃপ্ত, অসুখী তার দাম্পত্য জীবনে।

সেই আদুরীই বিধবা হয়ে গেল। হিন্দুসমাজ বিধবা নারীর জন্য সুস্থ বিকল্প জীবন পথ কিছু খুলে দিতে পারে নি। তাদের জন্য হয় সহমরণ, না হয় আমৃত্যু আত্মনিপীড়ন নির্ধারিত। শূদ্রের যেমন ব্রাহ্মণের সেবা করার কাজ। বিধবার তেমনি পরিবারের জীবন উপভোগকারী সকলের সেবা করা কাজ। বিদ্রোহ করলে বা এই সামাজিকতা থেকে সামান্য চ্যুত হলেই ঠাঁই হয়ে যাবে আঁস্তাকুড়ে। অর্থাৎ পতিতালয়ে। একে সামাজিক নিষ্ঠুরতা না বলে বলা উচিত সামাজের নির্মম নিরুপায়তা—অসহায়তা, অক্ষমতা, আবদ্ধতা।

আদুরীর শাশুড়ি কৃষ্ণনাম জপ করে দিনে দুবার। দুপুরে আহারের আগে একবার আর সন্ধ্যায় একবার।

এখন আদুরীরও কাজ হয়েছে একশ আটবার করে ওই কৃষ্ণনাম জপ করা। কিন্তু সে নিয়মিত কাজ করতে পারে না। শাশুড়ির মত। যাই হোক, এখন শাশুড়ির পথই তার পথ। কেননা দুজনেই বিধবা। যদিও শাশুড়ি বৃদ্ধা, পুত্র পৌত্র নিয়ে সংসার। আর আদুরী নিঃস্ব অথচ যুবতী।

ভাসুরপোর বিয়ে হল জাঁক করে।

শাশুড়ির মনের খুশি নিয়ে বলল। যাক, এবার আমার কাজ চুকল। এবার তীর্থ করে আসি। পাড়ার দুই মহিলা সঙ্গীও জুটে গেল। আদুরী বলল, আমিও যাব। আমারই বা সংসারে কোন বাধা?

ভাসুররা অনুমতি দিয়ে দিল। অতঃপর আদুরীও তীর্থ করতে বের হল। অম্বিকা কালনায় গেল। নবদ্বীপে গেল। তারপর অগ্রদ্বীপে এল।

অগ্রদ্বীপে তখন গোপীনাথের মেলা বসেছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সমাবেশ। কত রকম সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম। বৈরাগী, বাউল, নাগা, নেড়ানেড়ী। সমানে চলেছে নাচ আর গান। অহর্নিশি সংসারের আবদ্ধজীবনের বাইরে এ যেন আনন্দের মুক্তাঙ্গন। কত দিন ধরে চলবে এই মেলা। অতএব আদুরীরা থেকে গেল সেখানে। আনন্দ উপভোগের জন্য। দেখে বেড়াতে লাগল মেলার নানা রূপ। নেড়ানেড়ী, বৈষ্ণবী সবাই নিজ নিজ দলে বিভক্ত হয়ে আস্তানা পেতেছে। আর সেখানে একসঙ্গে নাচছে গাইছে। নারী পুরুষ এক সঙ্গে নাচছে গাইছে। নারী পুরুষ ভেদ নেই। এখানে নারীর ঘোমটা নেই। আব্রু নেই। বিধি নিষেধ নেই। সব একাকার। এ যেন এক আশ্চর্য জগৎ, মুক্ত পরিবেশ। এখানে নিন্দা নেই, গঞ্জনা নেই, সন্দেহজাত লাঞ্ছনা নেই।

একদিন ওরা এক জায়গায় দেখল খুব ভিড় জমেছে। খোল করতাল বাজনার সঙ্গে এক বৈরাগী উদ্দাম নৃত্য করে গান গাইছে। তার পরনে কৌপীন মাত্র সম্বল। কত রকম ভঙ্গিতে সে নাচছে। ভোর বিভোর। হঠাৎ সেই নৃত্যরত বৈরাগীর নজর গেল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আদুরীর দিকে। অমনি সে ভাবের ঘোরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অচৈতন্য হল। তার মুখ দিয়ে গাঁজিলা বার হতে লাগল। সঙ্গীরা তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল। তখন কাছে এসে আদুরীরা এই দৃশ্য দেখতে গিয়ে দেখল। এই বৈরাগী তাদের গ্রামের সেই প্রেমভক্ত। যাকে নিয়ে আদুরীর লাঞ্ছনাভোগ হয়েছিল স্বামীর হাতে।

প্রেমভক্তর সঙ্গীরা বলল, ওর দশা হয়েছে। অর্থাৎ দেবতার ভর হয়েছে ওর ওপর।

সঙ্গীরা বলল, কে এসেছেন?

প্রেমভক্ত বলল, আমি গোপীনাথ।

আপনার কী আদেশ?

মেলায় একটি বিধবা যুবতী এসেছে। তাকে বৈষ্ণবী করে আমার সেবায় লাগাও।

সে কোথায়?

মাঠের উত্তর-পুব দিকে গাছ তলায় তিনজন মেয়ে মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

তারা তাকাতেই আদুরীকে দেখল। অমনি সেখানে ছুটে গিয়ে তাকে দেবতার আদেশের কথা শোনাল। সে কথা শুনে গ্রাম্য মহিলারা বিস্ময়ে রুদ্ধবাক।

প্রেমভক্তর দল-নেতা এবার ফলাও করে শোনাতে লাগল, স্বয়ং গোপীনাথ তাঁর সেবার জন্য ডাকছেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়! মহাভাগ্যবতী! বলুন মত আছে কিনা। আদুরী একটু ভেবে নিয়েই রাজি হয়ে গেল বৈষ্ণবী হতে। সম্মতি জানাল, হ্যাঁ। বৈষ্ণবী হব।

এ দেশে ধর্ম ক্ষেত্রে এই এক বিশেষ স্বাধীনতা। গৌরাঙ্গর দাদা বিশ্বরূপ বললেন, সন্ন্যাস নেব। নিলেনও। কেউ বাধা দিতে পারলেন না। গৌরাঙ্গর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জননী-জায়া-সংসার, আত্মীয়-পরিজন সব গৌণ। তারা শোক করতে পারে। বাধা দিতে পারে না। আদুরীর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটল। শাশুড়ি ও সঙ্গিনীরা বাধা দিতে পারল না।

তখনই আদুরীকে নিয়ে গিয়ে ভেক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এবং তার বৈষ্ণবী জীবনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তল প্রেমভক্ত বৈরাগীর ওপর।

এই বৈরাগীরা সংসার বৈরাগী। বৈষ্ণবীরও বিয়ে দেওয়া হবে না। এরা এক সঙ্গে বসবাস করবে এবং ধর্মচর্চা করবে। জীবিকা হিসাবে এরা প্রত্যেকেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। বস্তুত এরা স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন। পুরুষ-নারী উভয়েই ইচ্ছা মত তার সঙ্গী বদল করতে পারবে। বাধ্যবাধকতার দায় নেই।

লেখক ঘটনাটিতে প্রেমভক্তর কপটতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ধর্মের নামে ব্যাভিচার কেমন চলে এটাই দেখাতে চেয়েছেন। বিবরণটির সূচনায় শিরোভাগে একটি বাঙলা ছড়ার ইংরেজি অনুবাদ বসিয়েছেন। বাঙলা ছড়াটি হল:

মাগুর মাছের ঝোল
ভরা যুবতীর কোল
বোল হরি বোল।

এর লৌকিক অর্থ যেমন আছে, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও তেমনি শোনা যায়। ছড়াটি নিত্যানন্দর নামে প্রচলিত। লেখক লৌকিক অর্থকেই গ্রহণ করেছেন বলে ধারণা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বিবরণটি উপস্থাপিত করেছেন। লেখক খ্রিস্টধর্মের পাদ্রী। খ্রিস্টীয় সদাচারে বিশ্বাসী। তাই আখড়ায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর জীবন তার ভাল না লাগারই কথা। তবু তিনি এই বাস্তব জীবন চিত্র আঁকতে যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

একালে বসে বিষয়টা ভাবতে গেলে মনে অনেক কথাই জাগে। কঠোর রক্ষণশীল সমাজের বুকে আখড়াকেন্দ্রিক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর উদ্ভব হল কী ভাবে—যদি পিছনে শক্তিশালী সামাজিক সমর্থন না থাকে? স্বতঃই মনে পড়ে অবক্ষয়িত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের কথা। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী থেকে নেড়া-নেড়ী। তারই আরেক রূপ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। একে সাহায্য করেছে গৌরাঙ্গ আন্দোলনের নারী মুক্তির ডাক। সহমরণ নয়। বিধবা হয়ে গৃহে অন্তরীণ থাকাও নয়। বৈধব্য যখন জীবনের সব রঙ আশা আকাঙ্ক্ষার সামনে কালো পর্দা নামিয়ে দিয়েছে, তখন তা থেকে বেরিয়ে আসার নতুন পথ খুলে দিয়েছে এই বৈষ্ণব আখড়া। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেই বিশ্বভুবন তোমার সামনে খোলা। পতিতা হতে হবে না। পতিতালয়ে গিয়ে বাধ্যতামূলক পঙ্কিল জীবন যাপন করতে হবে না। স্বাবলম্বী, সহজ, স্বাধীন হয়ে যাবে অনেক—অনেক। আদুরী অকস্মাৎ ভাবে বিভোর হয়ে হঠকারি কাজ করে নি। অসহায় অতৃপ্ত বন্দী জীবন থেকে সে মুক্তি প্রত্যাশী ছিলই। প্রেমভক্ত ছিল তার দুঃখময় জীবনের নায়ক। অবশ্যই অগ্রদ্বীপের মেলা তাকে প্রভাবিত করেছিল। সে জানত এখানে নিন্দার অবকাশ নেই।

এই আখড়া আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের জীবনযাত্রাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে—এরা বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গমে অভ্যস্ত এবং তা বৈধ। ওদের সমাজ জারজে পূর্ণ।

কিন্তু অক্ষম সমাজ শত শত এই দুঃখী রমণীর মুক্তির আনন্দকে মূল্য দেয়নি। তবু ওরা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে বন্দীশালা থেকে।

এসব শুনে এক বুদ্ধিজীবী বন্ধু বলে উঠলেন, দারুণ। কী রকম?

এ ত আধুনিক প্রগতিবাদী পৃথিবীর কথা। উইমেনস লিব আর লীভ টুগেদার তত্ত্ব ত এসব কথাই বলছে। নারীকে

তার নিজের মত করে বাঁচতে দিতে হবে। সে স্বাবলম্বী হবে। সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। পুরুষের সঙ্গিনী হিসাবে সম মর্যাদায় বাস করবে। প্রয়োজনে জুটি বদল হবে। বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সন্তান হলে লালন করবে সমাজ। অর্থাৎ জারজ বলে কিছু থাকবে না। আখড়ার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের ব্যাপারটা ত তাই দেখছি। স্বাবলম্বী, বাধ্যবাধকতাহীন জুটি।

সন্তান হলে কী করত?

ওই যে জারজ লালন করত?

না হলে আর জারজ হয় কেমন করে?

বন্ধু গালে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, এই বাঙলাদেশের সাধারণ সমাজে এমন ব্যবস্থা—সে কালে—ভাবা যায় না।

হাসতে হল এসব কথা শুনে।

বন্ধু বললেন, আদুরীর ঘটনা কত কাল আগে?

আঠার শ চুয়াত্তর সালে।

ওঃ। এক শ বছর অতিক্রান্ত। মানতেই হয় বৈষ্ণব আন্দোলনই সেদিন আমাদের সমাজকে ভাল রকম নাড়া দিয়েছিল।

উচ্চ সমাজ তাতে যোগ দেয়নি। তা দেয়নি বলেই অনেক বিকৃতি প্রবেশ করেছে। শুনতে ভাল লাগলেও বাস্তবে হয়ত অনেক কিছুই মান্য করা যাবে না। বিশেষত ওই জীবন সুস্থ সংসার জীবন গড়ে তুলতে পারেনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন তাই অনেক বলিষ্ঠ এবং ইতিবাচক। তাই বা আমাদের সমাজ মানল কোথায়?

বন্ধু বললেন, তবু আখড়া সমাজ একটা নতুন স্রোত বইয়ে দিয়েছিল, এটা মানতেই হবে।

না মানলেও এসব ত ঘটনা। ঘটেছে। বাস্তব সত্য।

আরেক বন্ধু রবি বিশ্বাস বললেন, বৈষ্ণবী এখনও হয়। এবং সংসারও পায়। আমি জানি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

কী রকম?

আদুরী বৈষ্ণবী হয়েছে আঠারশ চুয়াত্তর সালে। আমার ঘটনার কাল উনিশশ ছেষট্টি।

রবি বিশ্বাসের বাড়ি নদীয়াজেলার হাঁসখালি থানার অন্তর্গত পাতরা পাড়া গ্রামে। এটি তাঁর গ্রামেরই ঘটনা।

তিনি শোনালেন: আমি তখন বগুলা কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র। সমাজ সেবায় উৎসাহী। সেই সুবাদে স্থানীয় ফুড কমিটি গঠিত হলে আমাকে তার আহ্বায়ক করে দেওয়া হল। আমি অবশ্য তা গ্রহণ করলাম না। কিন্তু আমাকে সবাই বিশ্বাস করত। ফলে অনেক সময় দুঃস্থদের খয়রাতি সাহায্য দেবার জন্য সুপারিশ পত্র লিখে দিতাম। বি. ডি. ও অফিস তা মান্যও করত। তারা সাহায্য পেত।

একদিন জেলে পাড়ার একজন এল। আগেও এসেছে। মধ্য বয়সী মানুষ। অসুস্থ। ফলে রাতে নদীতে জাল টানতে পারে না। দিনে জনমজুরও খাটতে পারে না। একেবারে অক্ষম। বেকার। অথচ সংসার আছে, বউ ছেলে মেয়ে আছে। সংসার অচল। মেয়েটাকে চিনি। সাবালিকা হয়েছে। আঠার-উনিশ বছর বয়স। স্বাস্থ্যবতী। জীর্ণ বসনে ঘুরে বেড়ায়। বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ অনেকের দৃষ্টি তার দিকে।

লোকটি এসে বলল, এবার দশ কেজি গম লিখে দাও।

সে কি! আমি দু কেজি দিই, না হলে পাঁচ কেজি। তুমি যে একেবারে দশ কেজি চেয়ে বসলে। পাঁচ কেজি নাও।

না। তুমি দশ কেজিই লিখে দাও।

আমি লিখলেও অফিস তা দেবে কেন?

তুমি একটু ভাল করে লিখে দাও আমার হয়ে। তুমি লিখলেই দেবে।

ব্যাপার কী বল ত? দশ কেজিই লিখে দিতে হবে বলছ কেন? পাঁচ কেজি নাও। পরে আবার পাঁচ কেজি নিও।

না। দিলে দশ কেজিই দিতে হবে।

কেন? খুলে বল ত।

খানিক দম ধরে থাকার পর সে বলল, খোকা, (সে ওই নামেই আমাকে ডাকত) তোমার কাছে হাত পেতে যখন ভিক্ষে চাইতে এসেছি তখন তোমার কাছে বলতে আর লজ্জা নেই। আমার মেয়েটা পোয়াতি।

চমকে ওঠা ছাড়া আর বুঝি কিছু করার ছিল না।

সে বলল, মেয়েকে আর পথে দেখতে পাও?

না।

দেখবে কেমন করে? ছ মাস হল।

কী ভাবে হল?

সে বলল, আমরা ত গরিব মানুষ। আমার রোগ হবার পর সংসার একেবারেই কাহিল। সমখ মেয়ে আঠার বছর বয়স, হাঁপাল চেহারা, বিয়ের যুগ্যি। কিন্তু আমরা কি মেয়ের বিয়ে দিতে পারি? আমার মত মানুষের মেয়েকে কে বিয়ে করবে বল? সেই মেয়েই বাজার হাট করত। লোকজন

বাবুদের ধরে খয়রাতি সাহায্য আনা—সবই করত। তা করতে গিয়েই এই হাল। কী বলব, বাবুরা আমাদের মাথা হয়ে বসে আমাদেরই মাথা খায়। এরপর সে এমন একজনের নাম করল যা শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সে বলল, মেয়ে ওর কাছে যেত খয়রাতি সুপারিশ পত্র লিখে নিতে। দুপুরে যেতে বলত। তখন ওর বউ ইস্কুলে পড়াতে যায়। ছেলে মেয়েরা ইস্কুলে। মেয়ে যেত। তাকে দিয়ে সংসারের কাজ করিয়ে নিত। পরোটা রুটি খেতে দিত। খেতে না পাওয়া মেয়ে সেটা পেয়েই বসে খেত। আর তার পর—কী আর বলব তোমাকে—

দশ কেজি গম নিয়ে কী করবে?

এটা নিয়ে পিষিয়ে বাড়িতে দেব। তারপর মেয়েকে নিয়ে বেরোব।

কোথায় যাবে?

কপাল যেদিকে নিয়ে যায়।

এরপর পনের কেজি গমের জন্য সুপারিশ পত্র লিখে দিয়ে ওর হাতে কটা টাকাও দিয়েছিলাম। আর মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ওকে দু কেজি চাল দিয়ে বলেছিলাম আজ দুটো ভাত খেয়ো সবাই মিলে। সে কেঁদে ফেলেছিল।

পনের কেজি গমই পেয়েছিল শুনেছিলাম। তারপর সত্যিই সে নিরুদ্দেশ। অনেক দিন পর তার বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলে তার বউ-এর কী কান্না। বলল কী জানি মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যে গেল। আর কোন খোঁজই নেই।

বেশ কিছুকাল পর সে বাড়ি ফিরেছিল। আমার কাছে আর আসেনি। তার কিছু দিন পর মারা গেল।

তারপর সে কথা মনের কোন্ তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। নিজের জীবনের সহস্র সমস্যা নিয়েই দিন মাস বছর কেটে যায় হু হু করে।

প্রায় একযুগ পরের কথা।

একদিন নবদ্বীপের পথে হেঁটে চলেছি আপন মনে। হঠাৎ পথের পাশ থেকে প্রশ্ন হল, দাদা, কেমন আছেন? বাম্না কণ্ঠ। মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। পাশেই এক মহিলা দাঁড়িয়ে। কালো, স্বাস্থ্যবতী, বছর ত্রিশ বয়স হবে,নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠী। বৈষ্ণবী। সে হাসল।

অবাক হলাম। কে এই বৈষ্ণবী?

সে বলল, চিনতে পারছেন না?

না ত।

আপনার বাড়ি ত পাতরা পাড়া?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে?

সে হেসে বলল,আমার বাপের বাড়িও ওখানে। আপনাকে দেখেই চিনেছি।

কিন্তু আপনার নাম কী, বাবার নাম কী?

সে এবার তার আত্ম পরিচয় দিল। মুহূর্তে সেই দূর অতীত সামনে এসে দাঁড়ল। আরেকবার ভাল করে ওর দিকে তাকালাম।

সে বলল, বেঁচে আছি দাদা। তবে আপনি সেদিন পনের কেজি গম না দিলে আর বাঁচতাম না। সেদিনই গলায় দড়ি দিতাম।

তুমি এখানে থাকো?

হ্যাঁ। এই ত কাছেই আমাদের আখড়া। সেখানে থাকি। আসুন না। আমাদের বাড়িতে। দেখে যান নিজের চোখে। কেমন আছি।

কৌতূহল রোধ করা গেল না। তার সঙ্গে চলতে চলতে বললাম, তুমি বৈষ্ণবী হয়েছ?

হ্যাঁ দাদা। বিয়ে হয়েছে যে গুঁসাই-এর সাথে।

গোঁসাই থাকে ওখানে?

হ্যাঁ তেনারই আখড়া।

পথের পাশেই আখড়া। আসলে একটা ছোট বাড়ি। ইঁটের দেওয়াল, টালির চাল মাথায়—খান দুই ঘর। একটা বড় সড় উঠোন—খুব ছিমছাম। ঘরে একটা মাদুর পেতে দিয়ে বলল, বসুন।

এটা ভাড়া বাড়ি?

না। গুঁসাই কিনে নিয়েছে।

গোঁসাই এর তাহলে টাকা আছে?

সে হাসল। তারপর তার নিজের কথা শোনাতে চাইল।

কেমন আছ?

খুব ভাল আছি। সবই ত জানেন। বাবা অক্ষম হয়ে গেল। আমার বিয়ে হত না কোনদিনই। বউ হতে আর পারতাম না এ জীবনে। পাঁচজনের ভোগে লাগতে হত। অনেকেই সেই ফিকিরে ঘুরত। একজন ত ভোগ করেই নিল। তারপর আর দরজা খুলত না। চিনতে পারত না। আমি মরণের কথাই ভাবতাম। কিন্তু আপনি গম দিলেন, চাল দিলেন, টাকা দিলেন। আর মরা হল না। বাবা আমাকে নিয়ে চলে এল। নবদ্বীপের পথে পথে পাগলের মত বাবা ঘুরল কত দিন আমাকে নিয়ে। শেষে এই গুঁসাই-এর কাছে

আশ্রয় মিলল। আমার খালাস না হওয়া অবধি বাবা এখানেই ছিল আমার কাছে। তারপর আমার ছেলে হল।

সে ছেলে আছে?

হ্যাঁ। গুঁসাই তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। ছেলে এখন চায়ের দোকানে কাজ করে। তারপর গুঁসাই আমাকে বিয়ে করল। ভেক দিয়ে বৈষ্ণবী করে। তেনাকেও একটা ফল দিয়েছি। সেটাও ছেলে। তাকে ইস্কুলে ভর্তি করেছি।

তাহলে ত ভালোই আছ।

তা বলতে পারেন। সবই মহাপ্রভুর কৃপা।

তোমরা মাধুকরী করো?

হপ্তায় একদিন। নিয়ম রক্ষের জন্য।

চলে কিসে তাহলে?

গুঁসাই-এর অনেক ভক্ত আর শিষ্য। তারা দেয় থোয়। আখড়ায় কেত্তন মচ্ছব, মালসা ভোগ লেগেই আছে। কত লোক আসে। দাদা এমন জীবন পাব তা ভাবিনি। লোকে খুব মান্য করে। মাঠাকরুণ বলে। পায়ের ধুলো নেয়। বোষ্টম ত উঁচু জাত।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে। বাবাজীর পরিচয় কী? তার সমাজছাড়া এই ঔদার্য এল কেমন করে?

রবি বিশ্বাস বললেন, তা জানিনে। হয়ত সেও এমনি এক জ্যরজ। হ্যাঁ। এ ত সাময়িক উত্তেজনা কিংবা ভাবাবেগ অথবা লোকের হাততালি পাওয়ার লোভে পরোপকার করতে যাওয়া নয়। সামাজিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে একজনকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচা এবং সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়া সামাজিক জীবন নিয়ে। এ বিষয়ে গবেষণার একান্ত অভাব। সাহিত্যের পাতায় যা মেলে তা বিতৃষ্ণা আর ঘৃণাই জাগায়। অথচ এই জীবন চলেছেই।

আগামী দু'সংখ্যায় সমাপ্য

'জাত বৈষ্ণব কথা' প্রচুর পড়াশুনা এবং ব্যাপক সমীক্ষা-জাত একটি মূল্যবান রচনা। কিন্তু দুঃখের কথা হল পুরো রচনাটি আমাদের পক্ষে ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। তার কারণ পত্রিকা দপ্তরে জমে থাকা ছাপার যোগ্য প্রচুর লেখার চাপ। এই চাপের মুখে পড়ে এই ক্ষুদ্র কলেবর পত্রিকার পক্ষে সমস্ত ভাল লেখার প্রতি সুবিচারের জন্য একটি সামঞ্জস্য বিধানকারী পরিকল্পনা গ্রহণ না করে উপায় থাকছে না। তাই 'জাত-বৈষ্ণব কথা' ছাপতে হচ্ছে কটি ছাঁট করে সংক্ষিপ্ত আকারে। এই লেখার আর দুটি কিস্তিই ছাপা হবে। উৎসাহী পাঠকবৃন্দ এর বেশি তথ্যের জন্য আগ্রহান্বিত বোধ করলে লেখকের সঙ্গে যাতে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন সেই কারণে তাঁর ঠিকানা এখানে উল্লেখ করা হল:—

অজিত দাস, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিন—৭৪১১০১

গ্রন্থসমালোচনা

দীপ্ত প্রাচ্যদর্শন

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের ছ'টি শাখা বা বিভাগ আমরা জানি — সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। এদেরও নানা ভাগ এবং নৈকট্য রয়েছে। কোনো কোনো স্তরে ন্যায় বৈশেষিক একত্র উল্লিখিত হয়। কিরণাবলী হল মহর্ষি কণাদ রচিত বৈশেষিকদর্শন সূত্রের প্রশস্ত পাদভাষ্যের উপর উদয়নাচার্যকৃত একটি উল্লেখ্য টীকাগ্রন্থ। এর রচয়িতা উদয়নের বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে 'ন্যায়বৈশেষিকাচার্য' শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী সেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য যিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি এই চারটি ভাষাতেই গূঢ় বক্তব্যবিষয়ও সুষ্ঠুভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম। অন্যান্য কিছু ভাষাও তাঁর আয়ত্তে। আচার্য শ্রী শাস্ত্রী কিরণাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ আগেই করেছেন। আমাদের হাতে এখন কিরণাবলী তৃতীয় খণ্ড, যাতে আলোচিত হয়েছে 'মহাভূতচতুষ্টয়'।

পরিভাষা এবং তাদের তাৎপর্য জানা না থাকলে, শুধু ন্যায় বৈশেষিক কেন, কোনও দর্শনগ্রন্থই আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। তথাপি বাঙালি গবেষক-পাঠকের জন্য এই অনুবাদ, যাতে বিবৃত আছে এক গুরুত্বপূর্ণ উজ্জ্বল প্রকরণ। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে ন'টি বস্তু বা দ্রব্যপদার্থ স্বীকৃত। তারা হল — আত্মা, আকাশ, কাল, দিক্; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং মন। মহাভূতচতুষ্টয় বলতে বোঝানো হয়েছে ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ নামের চারটি পদার্থকে (বাংলায় হয়ত 'উপাদান' বলা যেতেও পারে)। এই ক্ষিতি বা পৃথিবী আদি ভূতচতুষ্টয়কে আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় যে পরমাণুসমূহ, তারা হল নিত্য। আর, দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে যেই দ্ব্যনুক উৎপন্ন হল, সেই দ্ব্যনুকাদি থেকে শুরু করে সব ভূতপদার্থ হল অনিত্য। অনিত্য পৃথিব্যাদি (পৃথিবী ইত্যাদি) বস্তুগুলি আবার শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ভেদে তিনরকম। এই গ্রন্থে পার্থিবাদি পরমাণু (যা হল নিত্য, সূক্ষ্মতম পদার্থ-মূল) এবং পৃথিব্যাদি বিষয়ের (প্রকটিত পৃথিবী ইত্যাদি অনিত্য বস্তুসমূহের) বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

বৈশেষিকমতে পরমাণু প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের আচার্যরা 'আরম্ভবাদী'। কাকে বলে আরম্ভবাদ? এভাবে বলা যায় যে, কার্যমাত্রই উৎপত্তির পূর্বে 'অ-সৎ' (অর্থাৎ 'নেই')। আর সৃষ্টি মানেই হল 'অ-সৎ' থেকে উৎপত্তি (বা 'সৎ' হওয়া)। এই উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈশেষিক দর্শনে অতীন্দ্রিয় নিত্য অপরিসংখ্যেয় পরমাণু সিদ্ধ হয়েছে বা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে দৃষ্টান্তের একটি প্রধান অবলম্বন হল 'ঘট'। এখন, অবয়বী ঘটের বা ঘটরূপ পদার্থের উৎপত্তিতে একটি কারণ (সমবায়ী কারণ) হল ঘটাদির অবয়ব বা অংশসমূহ (অর্থাৎ 'কপাল'দ্বয়)। আবার, সেই অবয়বসংযোগটি হল ঘটাদি অনিত্য দ্রব্যের উৎপত্তিতে অপর এক কারণ (অসমবায়ী কারণ)। আবার, দণ্ড চক্র কুম্ভকার ইত্যাদি হল তৃতীয় কারণ (নিমিত্ত কারণ)। মূলকথা এই, অংশ আর তাদের সংযোগ হেতু অসংখ্য পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে। বৈশেষিকাচার্যের বক্তব্য তাহলে কী? তিনি বলছেন, জগতে প্রথম উৎপন্ন দ্রব্যাত্মক পদার্থ হল দ্ব্যনুক (দ্বি+অনুক)। এই দ্ব্যনুক হচ্ছে দুটি একজাতীয় পরমাণুর (যেমন, পার্থিব বা জলীয় পরমাণুর) সংযোগে উৎপন্ন পদার্থ। পরমাণু যেমন অজস্র, দ্ব্যনুকও অজস্র। এভাবে আবার, দুটি একজাতীয় দ্ব্যনুকের সংযোগে উৎপন্ন হয় ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু। বৈশেষিকমতে এভাবেই দ্ব্যনুক, ত্র্যণুকাদিক্রমে উৎপন্ন এই কার্যজগৎ (বা কারণের ফলস্বরূপ জগৎ)। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, জগৎ উৎপত্তির এরকম ব্যাখ্যা সম্ভবই হবে না যদি পরমাণুসিদ্ধি (বা তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা) না হয়। এই গ্রন্থে বৈশেষিক মতানুযায়ী পরমাণুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে পরমাণুসিদ্ধির প্রসঙ্গটি যথাবিধি আলোচনা করেছেন শাস্ত্রবিৎ গ্রন্থকার।

বৈশেষিক মতে, কারণ থাকে কার্যের পূর্বে। তাই ঘট থাকবে তদাশ্রিত গুণের উৎপত্তির পূর্বেও। তাহলে ধরে নিতে হয়, সেসময়ে ঘট নির্গুণ অর্থাৎ গুণ-উৎপত্তির আগের মুহূর্তে ঘটদ্রব্যটি গুণ-শূন্য। বৈশেষিকের এ সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে অনেকে বলেন, গুণবত্ত্বকে দ্রব্যের লক্ষণ বললে লক্ষণটি নির্গুণ ঘটাদিদ্রব্যে 'অব্যাপ্ত' হবে অর্থাৎ তাতে লক্ষণটির সমন্বয় হবে না। আবার এবিষয়ে অন্য আচার্যগণ বলেছেন, 'প্রতিযোগিব্যধিকরণগুণাভাবশূন্যত্ব' (উক্ত গুণাভাবের অভাব যাতে আছে সেটাই দ্রব্য।)—এই অর্থে গুণবত্তা দ্রব্যের 'নির্দোষ লক্ষণ' হতে পারে। গুণে কখনও

গুণ থাকে না। এজন্য গুণে যে গুণাভাব, তা হল 'প্রতিযোগিব্যধিকরণগুণাভাব'। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে — উৎপত্তিকালীন ঘটে যে গুণাভাব, সেটা কিন্তু 'প্রতিযোগিব্যধিকরণগুণাভাব' নয়। কারণ, ঘটটিতে পরক্ষণেই রূপাদিগুণ বৃত্তি হিসেবে এসে যাচ্ছে। সুতরাং মানতে হয় যে, উৎপত্তিকালীন ঘটে উক্তপ্রকার গুণাভাবের অভাব-ই আছে। এই অর্থে উৎপত্তিকালীন নির্গুণ ঘটেও 'গুণবত্ত্ব' লক্ষণটি খাটে। সরল কথা এই — যে কোনও দ্রব্যই যখন কোন না কোন অর্থে গুণবৎ, তখন গুণবত্ত্ব হল দ্রব্যের লক্ষণ এবং তা নির্দোষ লক্ষণ। পরিভাষার মধ্য দিয়ে একেই বলা হয়—'প্রতিযোগিগুণাভাববত্ত্ব হল দ্রব্যের নির্দোষ লক্ষণ'। সুতরাং এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছে, গুণের আলোচনা ছাড়া দ্রব্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ। তাই গ্রন্থকার দ্রব্যাত্মক মহাভূতচতুষ্টয়ের আলোচনায় পৃথিবী-আদি দ্রব্যের বা বস্তুর গন্ধাদিগুণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার করেছেন। আর এই আলোচনাই বইটির পঠনীয়তাকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

পার্থিব শরীর প্রসঙ্গে এই দর্শনপ্রস্থানসম্মত ব্যাখ্যা রীতিমত কৌতূহল উদ্দীপক। মনুষ্যশরীর, পশুশরীর, এমন কী দেবশরীর সম্পর্কেও পাঠকের সভ্যব্য জিজ্ঞাসাকে এখানে অবজ্ঞা করেন নি সহৃদয় ব্যাখ্যাকার। চিত্ররূপের মত বিষয়ের আলোচনাও এ প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিকা, বিষয়সূচি ও গ্রন্থপঞ্জি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাটিকে সম্যক্ মর্যাদায় স্থাপিত করেছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জন্য শুদ্ধিপত্রটির প্রয়োজনও কোনও অংশে কম নয়। লুপ্তপ্রায় উপাধ্যায়কুলের গোচর এই দীপ্ত প্রাচ্যদর্শনের সব্যাখ্যা বঙ্গানুবাদের জন্য আচার্য শ্রীশাস্ত্রীর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ ও বিনত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

উদয়নাচার্য রচিত কিরণাবলী—তৃতীয় খণ্ড/অনুবাদ ও বিবৃতি — শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলিকাতা/বিয়াল্লিশ টাকা।

সংযোজন: দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী এই লেখা প্রকাশের আগেই ১৫ই অগস্ট ১৯৯২ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। তীক্ষ্ণধী এই শিক্ষাগুরুর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাপক জীবনের সাফল্যের সংবাদ সুবিদিত। সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাছে সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোক'-এর পাঠগ্রহণ করেছি আমরা। বিশেষ ক্লাসে তিনি নিপুণ বিচারে বুঝিয়েছেন, প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রের গ্রন্থের সঙ্গে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রচিত 'রসগঙ্গাধর' শীর্ষক অভিনব গন্থের পার্থক্য এবং সামগ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের মূলকথা। বহু গ্রন্থই রচনা, সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন তিনি। কিরণাবলী ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য বই — 'এ স্টাডি ইন দা ডায়ালেক্‌টিকস্ অব ফ্লোট', 'ফিলজফি অব ওয়র্ড অ্যান্ড মীনিং', 'সঙ্গীত দামোদর', 'তত্ত্বচিন্তামণিময়ূখ, 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', 'হিস্টরি অব ক্লাসিকল ম্যানসক্রিপ্ট লিটারেচর' ইত্যাদি। এ রাজ্যে সংস্কৃত চর্চার অবনতিতে তাঁর পরিতাপের সীমা ছিল না, ক্রুদ্ধ হতেও দেখা গেছে তাঁকে। আধুনিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলে বার্ধক্যেও নানা প্রসঙ্গে তাঁর সক্রিয়তা ছিল। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

সৎ গবেষণার নির্দশন

অরবিন্দ পোদ্দার

কৃত্রিম উপায়ে দেশ বিভাজন ও রাষ্ট্র সৃষ্টি নানা মানসিক ও সামাজিক সমস্যার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যে চিন্তা মনন সাংস্কৃতিক উপলব্ধিতে বিপর্যয় অন্যতম। এর ফলে দেখা দেয় প্রেক্ষিত ও বিচার বিশ্লেষণে আবিলতা; কৃতী ও কৃতিত্ব উপেক্ষিত হয়, এবং যা উপেক্ষণীয় তা সমাদৃত হয়। সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা এমন বিভ্রান্তিতে বিপথচারী — এ অভিজ্ঞতা পাঠক মাত্রেরই আছে। সুখের বিষয়, সৈয়দ আবুল মকসুদ এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। এই সচেতনতা তাঁকে ঊনবিংশ শতকের ঢাকার সাহিত্য-সাময়িক পত্রের পথিকৃৎ হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

স্বীকার্য যে, হরিশ্চন্দ্র ছিলেন খাটো মাপের মানুষ। স্কুলে লেখাপড়ায় তেমন অগ্রসর হতে পারেন নি, দারিদ্র্য এর অন্যতম হেতু। যদিও বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি তিনি মোটামুটি ভালই জানতেন। সেই সুবাদে তিনি অল্পকাল শিক্ষকতাও করেছিলেন, পরে ঢাকায় ছাপাখানা স্থাপিত হলে তিনি কম্পোজিটর হিসাবে সেখানে যোগদান করেন এবং ছাপাখানাও পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার নব জাগরণের তরঙ্গ তাঁকেও স্পর্শ করেছিল, এবং সেই তরঙ্গে সঞ্চালিত হয়ে তিনি সমস্ত দিক থেকে হীনবল হওয়া সত্ত্বেও অসামান্য উদ্যাম প্রকাশ

করেন বাংলা ভাষার প্রথম মুখ্যত কবিতা বিষয়ক মাসিকপত্র ''কবিতা কুসুমাবলী''; পরে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন অনেকগুলো সাহিত্য পত্রিকা — ''চিত্তরঞ্জিকা'', ''অবকাশরঞ্জিকা'', সাপ্তাহিক ''ঢাকা দর্পণ'', ''কাব্যপ্রকাশ'', ''মিত্রপ্রকাশ'' ইত্যাদি। এছাড়াও কয়েকটি ক্ষীণজীবী সাহিত্যপত্র। তিনি স্বয়ং রচনা করেন অসংখ্য কবিতা পুস্তক, নাটক ও প্রহসন, গীতিনাট্য, গদ্যগ্রন্থ ও শিশুপাঠ্য রচনা। ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে এমন বিপুল সাহিত্যপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করলেন কোন উৎস থেকে। এই প্রশ্ন আমাদের বাংলার নবজাগরণের অন্তর্নিহিত অদম্য আত্মোপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্দেহ নেই, সেই প্রেরণা তাঁর মধ্যে সংগোপনে ক্রিয়াশীল ছিল।

হরিশ্চন্দ্র লিখেছেন প্রচুর। এত প্রচুর যে মাত্র একটি বছরের তথ্যে জানা যাচ্ছে (১৮৬৩), পদ্য-গদ্য-নাটক প্রহসন ও শিশুপাঠ্য মিলিয়ে মোট সাতখানা পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন; তার উপর ছাপাখানা ও প্রকাশনার অন্য প্রকার দায়দায়িত্ব তো ছিলই। এমন তাৎক্ষণিক রচনায় যিনি পটু তাঁর পক্ষে শিল্পসুষমা বা রচনার সৌকুমার্য সম্পর্কে যত্নশীল হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য সম্ভবত পাশ্চাত্যের দস্যুসভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতির ছত্র-ছায়ায় লালিত তথাকথিত বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠিত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। তাঁরা করুণাভরে তাঁকে ''পূর্ববঙ্গের রাজকৃষ্ণ রায়'' বলে চিহ্নিত করেছেন; অথচ, সৈয়দ আবুল মকসুদ তথ্যসহ দেখিয়েছেন, এর বিপরীতটাই বাস্তব সত্য। অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ রায়কেই ''পশ্চিমবঙ্গের হরিশ্চন্দ্র মিত্র'' বলে সনাক্ত করা উচিত। কারণ, হরিশ্চন্দ্রের ''কবিতাকুসুমাবলী'' (১৮৬০) অনুসরণ করেই রাজকৃষ্ণ রায় শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় কবিতা-প্রধান সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। আবুল মকসুদ মনে করেন, পদ্মার পূব পারের মানুষদের সম্পর্কে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের যে সামাজিক বিরূপতা — ''বাঙ্গাল'' সম্বোধন — সাহিত্যক্ষেত্রে এটা সেই মনোভঙ্গির প্রতিফলন। এ অনুমান অসত্য নয়, তবে কলকাতার গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কলকাতা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এখানে যেমন ইংরেজ প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হয়; তেমনি বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহও এখানেই স্থানান্তরিত হয়, এবং ঢাকা-মুর্শিদাবাদ-কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পীঠস্থান তাদের সনাতন গৌরব হারিয়ে ফেলে। ফলে, কলকাতার আত্মন্তরিতা স্ফুট ও বিস্তৃত হবার সুযোগ লাভ করে। ঢাকার মত 'দেহাতি' শহর যে উপেক্ষিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! একই কারণে ঢাকার সে সময়কার সাহিত্যিকরা তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি অন্য কারণেও বিশিষ্ট। এতে যে শুধু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকীর্তিকে বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তা নয়, তাঁর সমসাময়িক অন্য যাঁরা সাহিত্য রচনা অথবা প্রকাশনার ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন, — যেমন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দ দাস, আব্দুল করিম প্রমুখ — তাঁদের সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক পরিচয় ও অল্পবিস্তর আলোচনা প্রয়োজনীয় পটভূমি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া রয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত চিত্র, সমাজের প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীল অংশের বিবদমান অস্তিত্ব। এই দ্বন্দ্ব পারস্পরিক সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং করে, তাও আভাসিত হয়েছে। তবে, সামাজিক বা প্রগতিবাদী আন্দোলনে যাঁরা আধিপত্যের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, স্থানে স্থানে তাঁদের সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য বেশ কঠোর বলে মনে হয়েছে।

এটা অবশ্য গবেষণা কর্মে কোন প্রতিবন্ধক নয়। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বৃহত্তর সফলতার পথে তিনি অগ্রসর হবেন।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র — সৈয়দ আবুল মকসুদ / নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা / ষাট টাকা।

'কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা', 'শিল্প ও ব্যবধান' এবং

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যে ছোটগল্প লিখে শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্প আলোচনার যে ধ্রুপদী ভিত্তি রচনা করে গেছেন তা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের পক্ষেই শ্লাঘনীয় সম্পদ হত। বাংলা ছোটগল্পের মত তার সমালোচনা সাহিত্যও বেশ সমৃদ্ধ বলা চলে। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রী অলোক রায়ের 'কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা' তাতে একটি উল্লেখযোগ্য নবতর সংযোজন। অলোক রায় ভূমিকায় বলেছেন 'সাহিত্য বিচারে

মনে হয় আমরা এতদিন রূপসৃষ্টির উপর একটু বেশি জোর দিয়ে এসেছি। এইবার হয়তো একটু অন্যভাবে সাহিত্য সৃষ্টিকে দেখা দরকার।' সেই অন্যভাবে দেখার তাগিদ থেকে উৎসরিত একটি বই। আটজন ছোটগল্পকার ও একালের ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি নিয়ে মোট এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন। একশ ছত্রিশ পৃষ্ঠার সংগ্রহযোগ্য একটি ছিমছাম বই। আলোচিত ছোটগল্পকাররা হলেন প্রভাতকুমার, অবনীন্দ্রনাথ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দুই বিভূতিভূষণ, শিবরাম চক্রবর্তী, সুবোধ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

জীবনের লঘু অংশকে আশ্রয় করে সহজ বিনোদনের আয়োজনে ভরা গল্প — প্রভাতকুমারের গল্প সম্পর্কে এই রকমই সাধারণ একটা ধারণা আছে। অলোক রায় অন্যভাবে সাহিত্য সৃষ্টিকে দেখা দরকার বলে ভূমিকাতে যে সংকল্প ঘোষণা করেছেন তার সুপরিকল্পিত ও মানবিক প্রয়োগ এখানে দেখা যায়। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন প্রভাতকুমারের 'অভিজ্ঞতার জগৎ ছিল সুবিস্তারিত এবং দেশকাল সম্বন্ধে তাঁর সচেতনার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে অধিকাংশ গল্পে।' (পৃ: ৩) ইতিহাস জ্ঞানের পরিচ্ছন্ন ভিত্তি যে সাহিত্য সমালোচনার গতানুগতিক ভুবনে নিয়ে আসতে পারে নতুন মাত্রা তার নিখুঁত প্রমাণ অলোক রায়ের এই প্রবন্ধটি। প্রভাতকুমারের মূল্যায়নে তিনি নতুন রক্ত সঞ্চার করলেন।

তবে গ্রন্থের সব প্রবন্ধে এই ধরনের গভীরতা ও রক্তসঞ্চারক নতুনত্ব আছে এমন বলা যায় না। ছবি, কবিতা ও গল্পের তেরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বলে অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি আলোচনা বুদ্ধদেব বসু, পূর্ণেন্দু পত্রী বা শঙ্খ ঘোষ আগেই জমিয়ে তুলেছিলেন। অলোক রায় তাতে যোগদান করলেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর রচনা চরিত্রগত ভাবে আত্মজৈবনিক তবে সময় ও সমাজের বীক্ষণ থেকে তা কখনও বিচ্যুত হয় নি। প্রকৃতি প্রেমিক, অতীতচারী ও রোমান্টিক হিসাবে খ্যাত হলেও অলোক রায় দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটগল্প অন্ততঃ নভোচারী সাহিত্যের নিদর্শন নয়'। (পৃ: ৭৬)। বিচিত্র ধরনের রচনায় সিদ্ধহস্ত বলে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে দীর্ঘজীবী হওয়ার ট্রাজেডি ভোগ করতে হয় নি। 'বাড়ি শুদ্ধ সবার আমোদ শিবরামের গল্পে' এমন যে শিবরাম অন্যরকম প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন। হাসির গল্পেও তিনি দেশ কাল সমাজকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ' গল্পে সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য হারু অনেক ভেবে চিন্তে বলে 'পাশাপাশি মন্দির মসজিদ গির্জা গড়লে একদিন হয়তো মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন।' এই ভাবে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যায় লেখক শিবরাম সম্পর্কিত লোকচলতি ধারণায় আঘাত করেছেন। সুবোধ ঘোষ যে ভাবে সাড়া জাগিয়ে শুরু করেছিলেন সেভাবে চালাতে পারেন নি এই পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণাকেই এখানে একটু অন্যভাবে আনা হয়েছে। অভিজ্ঞতা নির্ভর গল্পকারদের অভিজ্ঞতার উৎসটি শানবাঁধানো চাকরিতে আটকে গেলে যা হয় সুবোধ ঘোষের তাই হয়েছে। অলোক রায় অবশ্য তাঁর ব্যাহত পরিণামটিকে সেদিক থেকে ব্যাখ্যা করেন নি। হৃদয়বান লেখক বলে নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানবচরিত্রের অসংগতির মধ্যে সংগতি খোঁজেন। 'এই তাঁর শিল্পী স্বভাব। এই তাঁর ছোটগল্পের চরিত্র লক্ষণ'। (১০৯ পৃ:)

আলোচ্য গল্পকারদের নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ ও কালানুক্রমে গল্প সংকলনের অভাব সঠিক সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক—এই সমস্যাটির বারংবার উল্লেখ ভবিষ্যৎ গবেষক ও প্রকাশকদের কাছে একটি অনিবার্য দাবি তুলে ধরে। 'নিঃসঙ্গ নায়ক'এ এলিয়েনেশনের মত গভীর সমস্যাকে খুব আলতো করে ছুঁয়েছেন অলোক রায়। বাংলা কথা সাহিত্যের ভেতর দাঁড়িয়ে একটা গড়া পেটা সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন। শিবনারায়ণ রায়ের 'নায়কের মৃত্যু' রচনাটি যাঁদের পড়া আছে তাঁরা এতে অতৃপ্ত থাকবেন বলেই মনে হয়।

'একালের ছোটগল্প: পরীক্ষা নিরীক্ষা' ও 'একালের ছোটগল্প: পট পরিবর্তন' প্রবন্ধ দুটিতে সংক্ষেপের মধ্যে সাম্প্রতিক ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি, তার প্রবণতা, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ মনোজ্ঞ ও খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে। ছোটগল্প কী ভাবে গল্পকে বাদ দিয়ে চরিত্রে, চরিত্র থেকে 'মুডে', আরও সম্প্রতি ইঙ্গিতধর্মিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তা বলেছেন। ফলে সাম্প্রতিক গল্পে এসে পড়েছে দুর্বোধ্যতা ও নৈরাশ্য। পাঠকরা নতুন রীতির গল্পকে এখনও সাদরে গ্রহণ করেন নি। অলোক রায় মনে করেন 'ভবিষ্যতে ছোটগল্প ক্রমশঃ কবিতার রাজ্যে শুধু পদার্পণ করবে না, অনেক সময় কবিতার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাবে। কবিতা-নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্প সবগুলি ধারার মিলন মিশ্রণের ফলে ছোটগল্পের নতুন রূপরীতি নিজস্বতা পাবে।'(পৃ: ১২৮) পেতে পারে। নতুন বিশ্বব্যবস্থা যে-রকম তালগোল পাকানো সংস্কৃতির দিকে আমাদের টান দিচ্ছে তাতে কেই বা স্থির থাকতে পারবে তার স্বধর্মে?

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আশা করেছিলেন ছোটগল্পে বিকীর্ণ জীবন একসময় জুড়ে গিয়ে জন্ম নেবে অনাগত যুগের মহাকাব্য। এ সব হচ্ছে সমালোচকদের হস্তান্তর অযোগ্য ব্যক্তিগত প্রতীতি। এখানে হাত দেওয়া যায় না। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি নানারকম ভবিষ্যৎ-বাণী চলতে থাকলে কেউ কেউ সত্যদ্রষ্টার মর্যাদা পাবেনই। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় গল্পই ছোটগল্পের স্বধর্ম। তাকে সে নমনীয় করতে পারে, ব্যঞ্জিত করতে পারে, কিন্তু ছাড়লেই বিনাশ। ঘটনা বা অভিজ্ঞতার পরিবাহী শিরদাঁড়া খুলে রেখে কোন্ বৈনাশিক মুক্তিযাত্রায় যাবে তৃতীয় বিশ্বের ছোটগল্প?

শ্রী তপোব্রত সান্যাল একটি ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার বই লিখেছেন। নাম 'শিল্প ও ব্যবধান'। ভূমিকায় জানিয়েছেন তাঁর পেশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা হলেও 'মানববিদ্যার বিচিত্র শাখার অধ্যয়ন ও অনুশীলন আমার নেশা।' বৃত্তি ও প্রবৃত্তির আনুরূপ্য ঘটেনি তাই। এতে শিল্প-সাহিত্য-সমাজ বিষয়ক মোট এগারোটি প্রবন্ধ রয়েছে। বিষয়: মৌলবাদ, মহাভারত, শিল্প, কবিতা, ভাষান্তর, নাটক, ভাষা, রবীন্দ্রনাথের গান, আধুনিক বাংলা কবিতা প্রভৃতি।

তেমন গভীর, মৌলিক ও ভাবনাযোগ্য বক্তব্য এসব প্রবন্ধে আছে তা নয় তবে পঠনের ব্যাপ্তি, কোটেশনের প্রাচুর্য ও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলির সহজ পুনরুচ্চারণ একঘরনের সুখপাঠ্যতা ও জৌলুস নিয়ে এসেছে। তাঁর কোন কোন প্রবন্ধ প্রায় কোটেশনের প্রদর্শনীতে পরিণত। যেমন 'শিল্প ও অধিকার ভেদ' নামক সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধে পনের/ষোল জন লেখকের প্রায় তেত্রিশটি উদ্ধৃতি আছে। রবীন্দ্রনাথ বারো বার, অবনীন্দ্রনাথ তিন বার, অস্কার ওয়াইল্ড দুবার; এছাড়া উদ্ধৃত হয়েছেন ক্রোচে, পেটর, ওয়াটস, গ্যেটে, প্লাতো, হ্যবার্ট রীড, বোসাংক, জীবনানন্দ, বিদ্যাপতি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিলেট, বিনায়ক সান্যাল, ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ প্রমুখ। কোটেশন প্রিয় এক ধরনের পাঠকের এ লেখা খুব পছন্দ হবে সন্দেহ নেই কিন্তু রুচিশীল ও বিদগ্ধ পাঠক সন্দেহ করতেই পারেন মুহুর্মুহু উল্লেখ আর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক নিজের বলবার কথার দৈন্যকে আড়াল করছেন না তো।

অধিকাংশ প্রবন্ধেই আছে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধ পুনরুচ্চারণ। যেমনঁ 'আনন্দিত দর্শকের অভিনন্দনেই নাটকের সার্থকতা' (নান্দনিক দৃষ্টিতে নাটক); 'শ্রেষ্ঠ ও মহৎ কবিতা তাই সর্বদেশে সর্বযুগেই আধুনিক' (আধুনিক বাংলা কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ)। তবে একটু বিচলিত হয়ে ওঠার মত কথাও যে তিনি কিছু বলেন নি তা নয়। যেমন '১৯২০ সালের পর বাংলা কবিতাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন তিনজন.....মার্কস, ফ্রয়েড ও গান্ধীজী .....গান্ধীজীর জীবনাচরণ বাঙালী কবিদের সমাজ চেতনায় প্রণোদিত করেছিল।' (পৃ: ৩৫) 'আসলে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।' (পৃ: ১৬) পথচলিত মানুষ ও ভাষাবিদদের উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার মত উদ্ধৃতি, 'কবিতা... এক যুগ এগিয়ে থাকা ভাষা, আগামী দিনের ভাষা।' (পৃ: ৪৬)। পর্বতারোহী পর্বত শৃঙ্গে পৌঁছে যদি বলেন এ হচ্ছে একযুগ এগিয়ে থাকা গন্তব্যস্থল, আগামীদিনের সমতল ভূমি — কথাটা সেইরকম শোনায় নাকি? পর্বতে সব মানুষ উঠবে না, কবিতা কখনও, কোন আগামী দিনেই সকলের ভাষা হবে না। কবিতাকে যাঁরা পর্বত চূড়ায় নিয়ে যাচ্ছেন, বিচ্ছিন্নতার কমপ্লেক্সিটি ঢাকার জন্য তাঁরা বড় বড় কথা বলতেই পারেন, তাঁদের মহান বাণী রিলে করা সমালোচকের কাজ নয়। তাঁকে দাঁড়াতে হয় কবি ও পাঠকের মাঝখানে। বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটা শুধু পাঠককে বুঝিয়ে লাভ নেই। কবিকেও বোঝাতে হবে। নিষ্ফল দৌত্যে কার লাভ?

রাধারমণ মিত্র বললেই রজনীপাম দত্ত রা মজাফ্ফার আহমদ পড়া পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে ১৯২৯ সালের ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার এক বন্দীর ছবি যিনি আদালতকে কমিউনিজমের প্রচার মঞ্চে পরিণত করতে জাঁহাবাজ বৃটিশ সরকারের পিলে চমকে দিয়েছিলেন অথবা ভেসে ওঠে 'কলিকাতা দর্পণ' লেখা একটি চারু প্রচ্ছদপটের কথা যার ভেতর রয়েছে পদাতিক এক গবেষকের খুঁটিনাটি কলকাতা দর্শন। কলকাতার পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, মন্দির-গির্জার বিস্মৃত, অর্ধবিস্মৃত কত যে খুঁটিনাটি তথ্য রাধারমণ মিত্র উদ্ধার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অথচ ৯৬ বছর বয়সে মারা যাবার পর দেখা গেল তাঁর প্রিয় কলকাতাবাসী তাঁর জীবনী নিয়ে বেশ ভালোরকম জট পাকিয়ে বসে আছেন। শ্রী ধনঞ্জয় দাশ রচিত 'রাধারমণ মিত্র অবিস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব' নামক পুস্তিকাটি পড়ে আশ্বস্ত হওয়া গেল খুব দেরি হয়ে যাবার আগেই যাহোক রাধারমণ মিত্রের জীবনীর জট ছাড়ানো শুরু হয়েছে। ছাপার অক্ষরে ছড়িয়ে পড়া শোক ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভুল তথ্যের জাল ছিঁড়তেই ব্যয় হয়ে যায় পুস্তিকাটির অর্ধেক দৈর্ঘ্য। জীবনী জিজ্ঞাসু সাদামাঠা পাঠক এ পুস্তিকা পড়ে কিছুটা হাঁফিয়ে উঠবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ছাপার অক্ষরকে ভগবানের সহোদর ভাই বলে আমরা যারা ভক্তিভরে সবকিছুকেই স্বীকার

করে নিই তাদের মঙ্গলের জন্য এই ধরনের দূরমুশমূলক একটি স-তর্ক জীবনী পুস্তিকা বোধ হয় আবশ্যক ছিল। রাধারমণের সন্ধানে আমাদের একসময় যেতে হয় গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে, অন্য সময় 'পরিচয়ে'র আড্ডায়। রাধারমণের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি গান্ধীজীর আশ্রমে বই পড়া নিষেধ ছিল। অর্থাৎ পড়াশুনার ব্যাপারে নিষেধমূলক দর্শন নকশালদের আগেই চালু করেছিলেন গান্ধী। 'পরিচয়ে'র আড্ডায় গিয়ে টের পাওয়া যায় তিরিশ ও চল্লিশের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বমৈত্রীর আবহটি। এই চটি বইটি থেকে উপরি পাওনা হিসাবে পাওয়া যাবে রাধারমণের স্মৃতিচারণে 'রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে গান্ধীজী' নামক ছোট্ট অথচ বৈদ্যুতিক একটি লেখা এবং রাধারমণের স্বহস্তে প্রস্তুত স্বীয় জীবনপঞ্জির একটি ইংরাজি চুম্বক।

কথা সাহিত্যে জিজ্ঞাসা— অলোক রায়
সাহিত্যলোক/বিডন স্ট্রীট কলকাতা/ *চল্লিশ টাকা*

শিল্প ও ব্যবধান—তপোব্রত সান্যাল/মিরান্দা মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা/ *কুড়ি টাকা*

রাধারমণ মিত্র অবিস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব—ধনঞ্জয় দাশ/
প্রাইমা পাবলিকেশন্স
মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা/ *পনের টাকা*

সমকালের বাংলাদেশের চলচ্ছবি: নতুন একটি গল্পগুচ্ছ

পল্লব সেনগুপ্ত

মুহাম্মদ একরামুল হক বাংলাদেশের রাজনীতির জগতে খুবই প্রখ্যাত মানুষ হলেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন সুপণ্ডিত এক অধ্যাপক এবং অভিনিবিষ্ট পাঠক হিসেবেই। কিন্তু এই ১৯৯২ সালে যখন তাঁর প্রথম বই 'নীলা' প্রকাশিত হল তখন আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম যে তিনি একজন সুকৃতী সাহিত্যিকও বটেন! প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি কর্মমুখর বাইরের জীবনের অন্তরালে তিনি সাহিত্যের চর্চা করে আসছেন — শুধু পাঠক নয়, লেখক হিসেবেও যে, এ-বইয়ের ভূমিকা পড়ে সেই আকর্ষণীয় তথ্যটি সংগ্রহ করা গেল।

একটি নাটক ('অন্তরীক্ষে অশ্রু') এবং ছ-টি গল্প ('নতুন প্রজন্ম'/'নীলা'/ 'স্মাগলারস্ ট্রেন'/ 'হীরা-মস্তান'/'স্বাধীনতার স্বাদ'/'সিকুরিটি প্রিজনার') সংকলিত করে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। সমকালের বাংলাদেশের জনজীবনের বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র সংগ্রহের সঙ্গে এটিকে তুলনা করা যায়, কেননা যে-সমস্ত চরিত্র এই বইয়ের বিভিন্ন গল্প নাটকে হাজির হয়েছে, তারা অন্তত বিশ্বস্ত ভাবেই বাস্তবতার উদ্ভাস ঘটিয়েছেন সেগুলির মধ্যে। এমন কি, কখন বা লেখক নিজেরই আত্ম-প্রতিভাস ফুটিয়ে তুলেছেন কোন চরিত্রের মধ্যে: যেমন, 'নতুন প্রজন্ম' গল্পের সৈয়দ বোরহানউদ্দিন, যিনি ''পঞ্চাশ বছর রাজনীতি করে..... এখন সংগ্রামী নতুন প্রজন্মের জন্য পথ ছেড়ে'' দিয়েছেন (পৃ: ১৮)। এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নানান্ ভাবে। উল্লেখিত গল্পটির উচ্ছৃঙ্খল তরুণ — যে স্কুল-ছাত্রী ফুসলে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং অক্লেশে দু-তিন লাখ টাকা খরচ করতে চায় খোদ এস.পি. সাহেবের মুখ বন্ধ করবার জন্য — সে সেই নতুনদের একজন। আবার 'স্বাধীনতার স্বাদ' গল্পের মুক্তিযোদ্ধারাও ঐ নতুন প্রজন্মের অংশীদার। চোরাচালানদারের দলের খপ্পরে পড়া গ্রামের মেয়ে নসিরন ('স্মাগলারস ট্রেন') — যে নিজেই ধীরে ধীরে পাক্কা স্মাগলারে পরিণত হয়েছে, সেও আছে এদের মিছিলে। আছে ভদ্রপরিবারের ছেলে হয়েও মাস্তান-বনে-যাওয়া হীরা এবং কলেজ-ছাত্রী হয়েও গণিকা বনতে বাধ্য হওয়া গোলাপীরাও ('হীরা-মাস্তান') যাদের মাকে মুড়ি ভেজে গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে হয়, সেই সুমতি-অনুমতিরা ('অন্তরীক্ষে অশ্রু') কিংবা হারুন, সুমনা জামানদের মতো উচ্চবিত্তরা (ঐ), অথবা তোহুরা বা মারুফের মতো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা ('নীলা') এবং জেল কয়েদী আব্দুল হক আর স্মৃতিভ্রষ্ট রাজবন্দী জসিম ('সিকুরিটি প্রিজনার')-এর মতো মানুষেরাও সেখানে সামিল। জীবনের এত বিচিত্র মাত্রাকে মাত্র সাতটি গল্প নাটকের দর্পণে বিম্বিত করে একরামুল হক সাহেব বাস্তবিকই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন।

আসল সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবন তাঁকে নানা স্তরের মানুষের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছে। সেই সব তাঁর গল্পের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে, সে কথা তাঁর লেখাগুলো মন দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যায়। এখানে একটি কথা বলার আছে। ওতঃপ্রোতভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকা মানুষেরা সচরাচর তাঁদের সমস্ত কর্ম এবং চিন্তার মধ্যেই সেই বিশেষ রাজনীতির—যা তাঁর অবলম্বন এবং অভিব্যক্তি — মাত্রাবিন্যাস না-করে পারেন না। একান্তভাবে রাজনীতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও একরামুল সাহেব সেই প্রায়-অনিবার্য ব্যাপারটাকে হতে দেন নি। এ বড় কম দক্ষতা নয়; কলমের ওপর অপরিসীম অধিকার না থাকলে এইটা করা সম্ভব নয়।

গল্পের উপজীব্য খুব অভিনব না হলেও মানব-মমতা এবং নিরলঙ্কার অথচ শিল্পঋদ্ধ প্রকাশভঙ্গি এই বইয়ের কাহিনীগুলিকে ''সহৃদয় হৃদয়সংবেদী' করেছে''। বাংলাদেশের হতভাগ্য হৃদয়হারানো সন্তান'' (পৃ: ১৯১)-দের জন্য যে সমবেদনা ঝরে পড়ে তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে সেটাই তো এই প্রবীণ লেখকের সৃষ্টির বৃহত্তম মূল্য — যা তিনি নিজেই চুকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। মাঝে মাঝে প্রতীক/সঙ্কেত তাঁর লেখাকে নিবিড় করে তুলেছে। এই প্রচ্ছন্ন-প্রতিমার নির্মাণই তাঁর শিল্পশৈলীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সে কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

একরামুল হক সাহেবের এই গল্পগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে উপন্যাস-কল্প একটা আদল এসেছে। যেমন 'স্বাধীনতার স্বাদ' কিংবা 'সিকুরিটি প্রিজনার'। জীবনের রূঢ়, অবাবরণ চিত্র আঁকতেও তিনি নির্দ্বিধ। এক কথায় কারুকে ভাল বা মন্দ বলে গ্রহণ কি বর্জন করার মতো একপেশে প্রবণতাও তাঁর লেখায় দেখি না। তাহলে হীরা, কিংবা গোলাপী, অথবা আব্দুল হকের ('সিকুরিটি প্রিজনার') মতো চরিত্র তাঁর গল্পে গড়ে উঠতে পারত না।

'স্মাগলারস ট্রেন' গল্পটি পড়ে সমরেশ বসুর 'এসমালগার' গল্পের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হতে পারে অনেক পাঠকেরই। আবার সমরেশেরই 'পসারিনী' গল্পের 'পুতুলের মা'-র সঙ্গে এ গল্পের নসিরণের মিলও যেন আছে কোথায় একটা। এটিই সম্ভবত এই বইয়ের গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানবিক আবেদন সব গল্পের মধ্যেই সুপ্রচুর; কিন্তু এইটির মধ্যে যে আবেদন যেন চেতন-স্তরকে ছাড়িয়ে গিয়ে মনের অবচেতনের অলক্ষ মাত্রাটিকেও স্পর্শ করে।

সমকালের বাংলাদেশের জীবন এবং সমাজের দলিল হিসেবে 'নীলা' বইটিকে মেনে নিতে বাধে না একটুও। হক সাহেবের কাছে এ রকমের আরও বইয়ের প্রত্যাশ রইল আমাদের সবারই; মায় আমাদের মতো বিদেশী পাঠকদেরও!

নীলা/মুহাম্মদ একরামুল হক/নাহার পাবলিকেশন, রাজশাহী/আশি টাকা।

অর্থনীতি

ভারতীয় অর্থনীতির সংকটের স্বরূপ

সন্মথনাথ ঘোষ

সম্প্রতি আমাদের দেশ এক চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রথমেই সংকটের কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ শাসন :— ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে আমাদের অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। অবশ্য কৃষির পাশাপাশি গ্রামীণ শিল্পও গড়ে উঠেছিল এবং সেই সব শিল্পের উৎপাদিত বস্তুর চাহিদা কেবল এদেশে নয়। বিদেশের বাজারেও ছিল প্রভূত পরিমাণে। রপ্তানি করা হত শিল্পজাত দ্রব্য। ফলে আমাদের অর্থনীতির সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য ছিল এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটান। প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য এদেশের বাজারে বিক্রি করবার জন্য আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান হয়, শিল্পের কারিগরদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়। আমাদের দেশ থেকে কাঁচামাল ও নৈসর্গিক সম্পদ ইংলন্ডে চালান করা এবং সেই সম্পদ থেকে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য এদেশের বাজারে বিক্রি করা শুরু হয়। এত নৈসর্গিক সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়া এবং তার উপর ব্রিটিশ শাসনের খেসারত হোমচার্জ দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের balance of payment-এর ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত থাকত। ব্রিটিশ শাসনের আরও লক্ষ্য ছিল তাদের আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া। তাদের চেষ্টা ছিল এদেশের অন্তত দশ ভাগ মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করা। কারণ প্রয়োজন হয়েছিল তাদের নিজস্ব শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার। এই প্রচেষ্টা সফল করবার জন্য তারা একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করল এবং অপরদিকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারী সংগঠনগুলিকে সক্রিয় করল। তারা বিশেষ করে অবহেলিত মানুষদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করতে লাগল। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক যাঁরা লাভ করলেন তাঁদের একাংশ পাশ্চাত্যের রেনেশাঁসের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শামিল হলেন। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার সদর্থক দিকগুলি গ্রহণ করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিকশিত করা। বিদেশী শিল্পদ্রব্য বর্জনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন গতিবেগ লাভ করেছিল। তাই সেদিনও আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি ছিল না, ছিল উদ্বৃত্ত।

ভারতে শিল্পায়ন গতিবেগ লাভ করল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই। শ্রী বিশ্বেশ্বরাইয়া শিল্পায়নের জন্য বেসরকারী স্তরে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এটাই বোধহয় বেসরকারী স্তরে ভারতের উন্নয়নের জন্য প্রথম পরিকল্পনা। লর্ড ওয়াভেল বড়লাট থাকাকালীন বম্বে প্ল্যান রচিত হয় এদেশের শিল্পায়নের জন্য। এদেশের নৈসর্গিক সম্পদ, সস্তা শ্রম ও ইংলান্ডে তৈরি যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ দেশে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা বেশি লাভজনক হওয়ায় ইংরাজ বণিকেরাই প্রথম ভারতে শিল্পায়ন শুরু করে। ১৮৫৩ সালে রেললাইন প্রতিষ্ঠার পর এদেশে শিল্পায়নের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। তাদের জুনিয়র পার্টনার হিসেবে এদেশে এক শিল্পপতি গোষ্ঠী গড়ে তুলতেও তারা সচেষ্ট হয়।

স্বাধীন ভারতে :— স্বাধীনতা লাভের পর শিল্পায়ন বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে। স্বদেশী ভাবধারাকে সামনে রেখে সেদিন আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন এদেশের স্বাধীন সরকার। তখন আমদানি করা হত প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি। বিদেশী ভোগ্যপণ্য যথা — বিলাতি মদ, বিস্কুট, টফি, কাটলারি প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হল। পরিবর্তে শিল্প গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামই কেবল আমদানি করা হত। এই অবস্থায় আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে সামান্য ঘাটতিও দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে Industrial Policy Resolution গৃহীত হয়। এই Resolution- এর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত

উদ্যোগের চেয়ে সরকারী উদ্যোগের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সরকারী উদ্যোগই গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। বেসরকারী কোন শিল্পগোষ্ঠীর হাতে যাতে অত্যধিক আর্থনীতিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত না হয় তারও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল এবং ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলবার বিশেষ ব্যবস্থাও এই প্রস্তাবে ছিল।

আমাদের দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতি সোভিয়েট মডেলকে অনেকখানি অনুসরণ করে চালু করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের সঙ্গে কৃষিও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। অবশ্য প্রথম পরিকল্পনা ছিল বম্বে প্ল্যানেরই অনুরূপ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারি শিল্পে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষি উপেক্ষিত হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি দেশের কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ে না, ফলে দানাশস্যের ঘাটতি দেখা দেয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্প দুই-ই সমান গুরুত্ব লাভ করে।

ইন্দো-পাক, ইন্দো-চীন যুদ্ধ হবার ফলে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশ থেকে আধুনিক অস্ত্র আমদানি করতে হয়। আমেরিকা থেকে PL 480 গম প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে আমদানি করা হয়, তথাপি balance of payment- এর ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা দেখা দেয় নি — ঘাটতি ছিল আয়ত্তের মধ্যে। এই সব পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এদেশে আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয় আর গড়ে ওঠে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাদের হাতে আসে আধুনিক ভোগ্যপণ্য ক্রয় করবার মত যথেষ্ট অর্থ। কিন্তু অর্থের পুনর্বণ্টন করা সম্ভব হয় না — ফলে বৈষম্য বাড়ে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়ে বেকারি।

এই বৈষম্য কমাবার জন্য এবং আর্থিক ক্ষমতা যাতে পুঞ্জীভূত না হয় সেজন্য MRTP Act প্রণয়ন করা হয়। বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং এদেশের সম্পদ বিদেশে পাচার রোধ করতে FERA আইনও প্রণয়ন করা হয়।

এই সব সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হয় নি। ১৯৪৯ সালে ডলারের হিসাবে স্টার্লিং-এর অবমূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টাকারও অবমূল্যায়ন ঘটান হয় — যদিও সেদিন টাকার অবমূল্যায়নের কোন প্রয়োজনই ছিল না। (এই সিদ্ধান্তের জন্যই স্বাধীন ভারতে প্রথম অর্থমন্ত্রী জন মাথাই পদত্যাগ করেন)। ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন শচীন চৌধুরীর অর্থমন্ত্রিত্বকালে দ্বিতীয়বার টাকার অবমূল্যায়ন ঘটান হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় এতে রপ্তানি বাণিজ্যের খুব বেশি উন্নতি ঘটে নি, কেবল টাকার দামটাই কমে গেছে। আমদানি নিয়ন্ত্রিত থাকার ফলে সেদিনও balance of payment খুব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি।

স্বাধীনতার পর উন্নয়নের মূল্যায়ন :— স্বাধীনতার পর আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির নীট ফল হল এই যে, আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা গেল কিন্তু পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হল না। আমাদের শিল্পের উৎপাদনশীলতা পশ্চিমের তুলনায় কম রয়ে গেল এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারও যেভাবে গড়ে ওঠা উচিত ছিল, সেভাবে গড়ে তোলা গেল না। আমাদের উন্নয়নও নির্ভরশীল হয়ে পড়ল পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশের উপর। এর কারণ, শিল্পায়নের প্রাথমিক শর্ত কৃষির আধুনিকীকরণ, উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, জমির পুনর্বণ্টন প্রভৃতি কাজগুলি, যা প্রথমেই করা উচিত ছিল, তা আজও করা হয় নি। (জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে জমির পুনর্বণ্টন ও আধুনিকীকরণের কাজ হয়েছিল ম্যাক আর্থারের নির্দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই।) সমস্ত কৃষিযোগ্য জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা যায় নি। মোট কৃষিযোগ্য জমি ১৮০ মিলিয়ন হেক্টরের মাত্র ৬০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আমরা জল পৌঁছে দিতে পেরেছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়েছে খুব কম। ফলে ভারতীয় শ্রমিকের ব্যক্তিগত উৎপাদন ক্ষমতা খুবই সীমিত হয়ে রয়েছে। একজন অশিক্ষিত অর্ধভুক্ত মানুষের কাছে ৮ ঘন্টার পরিপূর্ণ কাজ আশা করা যায় না। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর সত্তর দশকের মধ্যে আমাদের কৃষি উৎপাদন বেড়েছে প্রভূত পরিমাণে এবং শিল্পক্ষেত্রেও অনেকখানি স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এত উন্নয়ন সত্ত্বেও দেশের অর্ধেক মানুষ দুবেলা পেট ভরে খাবার পায় না। দেশের ৭৫টি পরিবারের হাতে আমাদের মোট সম্পদের প্রায় ৪০ ভাগ পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং ১০% (১০০ মিলিয়ন) মানুষ পশ্চিমী দেশের উন্নত মানের ভোগ্যপণ্য ক্রয় করবার সামর্থ্য অর্জন করেছে। আমাদের দেশের শিল্পায়ন কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রধানতঃ কয়েকটি শহরে। সমস্ত এলাকায় শিল্প গড়ে তোলার মত পরিকাঠামো রচনা করা সম্ভব হয় নি। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। এই বৈষম্যের কারণ নির্ণয়ের জন্য মহলানবিশ কমিটি গঠিত হয়েছে, কিন্তু তার রিপোর্ট আজও ঠাণ্ডা ঘরেই রয়ে গেছে।

আশির দশক:— আশির দশকের শুরু থেকেই দেশের ১০০ মিলিয়ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা পূরণ কররার জন্য আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করায় আমাদের বাজারে বিদেশী ভোগ্যপণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের শিল্পপতিদের যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব যৌথ উদ্যোগের কাজ ছিল আসলে আধুনিক ভোগ্যপণ্যের সাজসরঞ্জাম দেশে তৈরি না করে বিদেশ থেকে আমদানির ব্যবস্থা করা। ফলে গড়ে ওঠে স্ক্রুড্রাইভার ইন্ডাস্ট্রি আর আমাদের দেশের শিল্পোদ্যোগ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শুধু বৃদ্ধি পায় এ দেশের নৈসর্গিক সম্পদের রপ্তানি।

সপ্তম পরিকল্পনায় আমাদের বৃদ্ধির হার ধার্য করা হয় ৮% এবং ঢালাওভাবে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ বাড়ানো হয়। আজ এদেশে যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। সত্তরের দশকে এদেশে বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হত, যেটা আশির দশকে দাঁড়ায় ১০,০০০ মিলিয়ন ডলারে। আশা করা হচ্ছে এই বিনিয়োগ বছরে ২ বিলিয়ন ডলার হবে। বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ হয় প্রধানতঃ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কোন মূল শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় না। আমাদের দেশের শিল্পপতিরাও মূল শিল্প থেকে সম্পদ সরিয়ে এনে এই ধরনের যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ বাড়ান — কারণ এই সব উদ্যোগে সবচেয়ে কম সময়ে সর্বাধিক লাভ করা যায়। তাই আজ এদেশে বন্ধ কলকারখানার সংখ্যা এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার। সপ্তম পরিকল্পনায় রাজীব গান্ধীও মূল শিল্পে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে ইলেকট্রনিক্স্, ভোগ্যপণ্য (consumer durable) ও গৃহসজ্জা উপকরণ (house gadget) শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ান। এই সব শিল্পে বিদেশ থেকে প্রচুর আমদানি করা প্রয়োজন, কারণ বিদেশ থেকে আমদানির উপর নির্ভর করেই এই সব শিল্প গড়ে ওঠে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি এ বাবদ এ দেশ থেকে লাভ, রয়্যালটি, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতি নেয়। এ ছাড়াও বিদেশ থেকে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাজার থেকে বেশি দামে আমাদের আমদানি করতে হয় (captive purchase), কিন্তু রপ্তানি বাড়েনা। (যেমন ধরা যাক মারুতি গাড়ি — এর যন্ত্রাংশের জন্য যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দিতে হয়, রপ্তানি মাধ্যমে তার অর্ধেকও আমরা পাই না)।

মূল শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে আমাদের আমদানি পরিমাণ অনেক কমিয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

বস্ত্র শিল্প:— বস্ত্রশিল্পে রপ্তানির পরিমাণ বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ৯৯৩২ কোটি টাকা। এটা আরও বাড়িয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে ২০,০০০ কোটি টাকা করা যাবে বলে আশা করা হয়েছে। কিন্তু আজও আমাদের ১৩৪টি সূতাকল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অভাবে।

সিমেন্ট:— ১৯৮০-৯০ সালের মধ্যে সিমেন্ট শিল্পে উৎপাদন ২১.০৬ কোটি মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫.৪৬ কোটি মেট্রিক টন। কিন্তু এই শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতাকে আজও পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়নি, কারণ সপ্তম পরিকল্পনায় সিমেন্ট শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো হয় নি।

কয়লা:— খনির মুখে কয়লা জমা হয়ে আছে ৪ মিলিয়ন টন। উৎপাদন ২৩০ মিলিয়ন টন থেকে কমিয়ে ২১০ মিলিয়ন টন করা হয়েছে, অথচ অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪ মিলিয়ন টন কয়লা আমদানি করা হচ্ছে। এদিকে দেশে যে সব ওয়াশারি রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা যাচ্ছে না যথেষ্ট বিনিয়োগ না থাকার দরুন।

ইস্পাত:— ইস্পাত শিল্পে নতুন বিনিয়োগ হয় নি— ১০ মিলিয়ন টনই রয়েছে। ভারি যন্ত্রশিল্পে অর্ডারের অভাবে ক্ষতি হচ্ছে। অথচ ১৯৭০-৭১ সালে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল ৪০৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, ১৯৮৮ সালে আমদানি করা হয়েছে ৬৯৩৯ কোটি টাকার। BHEL-এর মত কোম্পানি আজ অর্ডারের অভাবে ধুঁকছে—অথচ বিদেশ থেকে জেনারেটর কেনা হচ্ছে সম্ভবতঃ বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে খুশি করবার জন্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে BHEL-এর তৈরি জেনারেটর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃতিত্বের দাবি রাখে।

সারশিল্প:— সারশিল্পে বর্তমানে আমদানির পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকা। HFC-র বন্ধ কারখানা যদি খোলা যায় এবং তার আধুনিকীকরণ করা যায় তাহলে এই পরিমাণ সার দেশেই উৎপন্ন করা সম্ভব হতে পারে।

মোটরগাড়ি:— ১৯৮০-৮১ সালে আমাদের দেশে মোটরগাড়ির সংখ্যা ছিল ৫ মিলিয়ন—বর্তমানে সেটা হয়েছে ১৬.৭ মিলিয়ন। ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিপোর্টে বলা হয়েছে রাস্তা ঠিক মত মেরামত করা হলে তেলের খরচ ২৫% কমান সম্ভব।

তৈলবীজ:— আমাদের ২০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে তৈলবীজ উৎপাদনের পরিমাণ হল ১৭.১৯ মিলিয়ন টন। Ground and Soil Expert রিপোর্টে বলা হয়েছে পুরুলিয়া, ছোটনাগপুর অঞ্চলে ৯ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপাদন করা সম্ভব অথচ এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হচ্ছে না।

আশির দশকে আমাদের balance of payment-এর ঘাটতি দাঁড়ায় বছরে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা। ১৯৮৮-৮৯ সালে ঘাটতি হয় ৭৮৯৯ কোটি টাকা, ১৯৮৯-৯০ সালে ৭৭৩০ কোটি টাকা এবং ১৯৯০-৯১ সালে ১০,৬৪৪ কোটি টাকা।

এই balance of payment-এর ঘাটতি পূরণ কররার জন্য প্রথমে IMF থেকে ধার নেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবছর ঘাটতি বেড়ে চলায় ধারের সুদ দিতেই সেই অর্থ অচিরে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে অধিক সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নেওয়া শুরু হয়। অনাবাসী ভারতীয়দের গচ্ছিত টাকাও ভাঙা হয়। আজকে balance of payment-এর সংকট এই সুদ এবং ধারশোধের দায় থেকে উদ্ভূত একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী আজ আমাদের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৭০ বিলিয়ন ডলার। আবার এই আশির দশকেই over invoicing ও under-invoicing-এর মাধ্যমে আমাদের দেশ থেকে সম্পদ বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছে বেশি পরিমাণে। James Joycee এবং S. C. Sarkar-এর হিসাব অনুযায়ী এই স্থানান্তরিত সম্পদের পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলার।

এই দশকে, বিশেষ করে রাজীব জমানায় অবিবেচকের মত খরচ বাড়ান হয়। সামরিক খাতে আধুনিক সাজসরঞ্জাম কেনার নাম করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। ফলে রেভিনিউ একাউন্টে ঘাটতি শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের আগে আমাদের রেভিনিউ একাউন্টে ঘাটতি ছিল না। এই ঘাটতি মেটাতে হয় ক্যাপিটাল একাউন্ট থেকে (ধারও এই ক্যাপিটাল একাউন্টের অন্তর্ভুক্ত)।

এই দশকেই বাজেটে বিপুল পরিমাণে ফিসকাল ডেফিসিট বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে অভ্যন্তরীণ ঋণ নিতে হয়। এই ঋণের পরিমাণ আজ ২ লক্ষ কোটি টাকা। যার সুদ দিতে লাগে ২০,০০০ কোটি টাকা। এই ঘাটতি বাজেট ও নতুন ট্যাক্সের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ে। আজ দেশে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ দুই অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ GNP (Gross National Productivity) বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৫% হারে এবং কৃষি উৎপাদনও বেড়েছে। GNP বৃদ্ধির ফল ভোগ করছে দেশি বিদেশি পুঁজি মালিক আর তাদের সাকরেদ এদেশের ১০ ভাগ মানুষ।

মূল্যায়ন:— সত্তর দশকে দ্বিতীয় দফায় তেলের দাম বাড়বার ফলে আমাদের অর্থনীতির ভারসাম্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হয় ২৭২৫ কোটি টাকা, যা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সবচেয়ে বেশি, শ্রীমতি গান্ধী দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮০ সালে রেগন-থ্যাচারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (লিবার‍্যাল ইকোনমির) পথ ধরেন। IMF থেকে ধার নেওয়া হয় প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। আমদানি বাড়ান হয়। তবু balance of payment-এর ঘাটতি বেড়েই চলে। ঘাটতি দাঁড়ায় বছরে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা এবং দেশের সমস্যা (বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি) তীব্রতর হয়। ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজীব দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার তাৎপর্য বুঝতে হলে ১৯৮৫ সালে উরুগুয়ের আলোচনায় ভারত সম্বন্ধে IMF, World Bank এবং GATT-এর প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ঐ আলোচনায় ভারতবর্ষে ১০ বছরের জন্য লিবার‍্যাল ইকোনমি চালু করবার একটি পরিকল্পনা রচিত হয়। পরে ভারত সরকারকে ঐ সংস্থার তরফ থেকে বলা হয় ওদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে ভারতকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ ভারত যাতে পায় তারও ব্যবস্থা করা হবে। রাজীব গান্ধী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজীবের দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাবার ঘোষণার সূত্রটি এইখানেই। এই সুপারিশের নির্দেশেই দেশে মুক্ত অর্থনীতি চালু করা হয়। আজকেও যে সব আর্থনীতিক সংস্কার করা হচ্ছে তা ঐ সুপারিশেরই অঙ্গ। তাই রাজীব জমানায় সপ্তম পরিকল্পনায় growth rate বাড়ল, কিন্তু মূল শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ান হল না। বাড়ান হল আমদানি-নির্ভর ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প, যার নীট ফল হল আমাদের দেশের শিল্পোদ্যোগীরা নিছক ব্যবসায়িতে পরিণত হলেন, কলকারখানা বন্ধ হল, বেকারি বাড়ল আর সুবিধা পেল দেশের মাত্র ১০ ভাগ মানুষ।

World Bank-এর পরিকল্পনাতেও এই ফলাফলেরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে — ১০-১৫% মূল শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। সরকারী সংস্থাগুলির অবস্থা খারাপ হবে, কিন্তু শিল্পে সার্বিক উন্নতির হার অনেক বাড়বে, আধুনিকতম ভোগ্যবস্তু বাজারে আসবে; পরিসেবা (service sector) ক্ষেত্রে কয়েকগুণ কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিল্পে আসবে নতুন গতিবেগ। তাই সপ্তম পরিকল্পনায় শিল্পে গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎকে বন্ধক রেখে কিছুলোকের সাময়িক লাভ ছাড়া আর কিছু নয়। হিস্টিরিয়া রোগী যেমন অসুস্থ অবস্থায় অত্যন্ত বলশালী হয়ে ওঠে, রাজীব জমানায় অর্থনীতির বলবৃদ্ধি তেমনই এক অসুস্থতারই লক্ষণ।

পরে রাজীব গান্ধী ক্ষমতা হারালে এই পরিকল্পনার রূপায়ন বিঘ্নিত হয়। অবশ্য ভি. পি. সিং অর্থমন্ত্রী থাকাকালীনই World Bank-এর এই পরিকল্পনা চালু হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পর অর্থনীতিতে কোন নতুন দিশা দিতে পারেন নি — গতানুগতিক ভাবেই চলছিল। তিনি সংকটের ভয়াবহতা সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে এমন সোচ্চার হয়ে উঠলেন যে অনাবাসী ভারতীয়রা দেশের উপর আর

ভরসা রাখতে পারলেন না। ফলে সংকট আরও তীব্র হয়ে উঠল।

দশম লোকসভা নির্বাচনে নরসিম্হা রাওয়ের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকার গঠিত হলে World Bank ভারতের জন্য তার adjustment programme দুই বছর স্থগিত রাখার পর পুনরায় চালু করবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। নরসিম্হা রাও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পর (আস্থা ভোট অর্জন করবার আগে) ঐ adjustment programme অনুযায়ী এক সপ্তাহের মধ্যে তিন দফায় মার্ক, ইয়েন ও রুবলের তুলনায় টাকার অবমূল্যায়ন করেন। অবশ্য বর্তমানে মুদ্রার কোন স্থায়ী মূল্য নেই — আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি অনুসারেই মুদ্রামূল্য ওঠনামা করে। যেদিন আমাদের টাকার অবমূল্যায়ন করা হয় সেদিন আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে ডলারের তুলনায় টাকার ২৫% অবনয়ন ঘটেই ছিল। World Bank-এর জনৈক কর্তা সম্প্রতি বলেছেন — "There were no *instruction* to the Indian authority to adjust the value of rupee". World Bank-এর অপর এক প্রতিনিধি বলেছেন — "We have sent a programme to New Delhi for immediate action prior to the passing of the budget." এই কারণেই বোধ হয় বাজেট পেশের পূর্বে আমদানি-রপ্তানি সংস্কার করা হল।

বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নরসিম্হা রাও সরকার New Economic Policy (N.I.P., Trade Policy ও Export Import Policy) ঘোষণা করেছেন, যা ১৯৫৬ সালে কংগ্রেস ঘোষিত Intustrial Policy-র সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। New Industrial Policy-তে শিল্পে লাইসেন্স পলিসি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, বিদেশী প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় চুক্তি, সরকারী শিল্প সম্পর্কিত নীতি MRTP ও FERA প্রভৃতি অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। MRTP আইনের এমন পরিবর্তন সাধন করা হবে যা প্রকৃতপক্ষে এই আইন নাকচ করারই সামিল। FERA আইনেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে বিদেশী পুঁজি যাতে যথেচ্ছভাবে এদেশে লগ্নী করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। এরই অনুষঙ্গ হিসাবে বিদেশী মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন ঘটান হয়েছে এই আশায় যে বিদেশের বাজারে আমাদের উৎপাদিত বস্তুর দাম কম হবে ফলে রপ্তানি বাড়বে। ১৯৬৬ সালেও এই আশা নিয়েই টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল কিন্তু সে আশা পূরণ হয় নি।

১৯৮৯-৯০ সালে আমাদের মোট রপ্তানির পরিমাণ ২৭৬৮১ কোটি টাকা — তার মধ্যে কৃষিজাত পণ্যে ২৬৩৭ কোটি টাকা, বস্ত্রশিল্পে ৫৫৮৫ কোটি টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে মাত্র ২৮৬৩ কোটি টাকা। এই সব তথ্য থেকে মনে করা ভুল হবে না যে রপ্তানি করার মত যথেষ্ট পণ্য আমাদের নেই। তাই টাকার অবমূল্যায়ন হোক বা না হোক, আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধির হার ৪-৫ শতাংশ। টাকার অবমূল্যায়নের ফলে বিগত বছরের সমপরিমাণ জিনিস রপ্তানি করেও কম টাকা পাওয়া যাবে অথচ আমদানির জন্য বেশি টাকা দিতে হবে। আজকের রপ্তানির মধ্য দিয়ে যে বিদেশী মুদ্রা আমরা সংগ্রহ করি, সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য আরও অন্ততঃ ৪০% রপ্তানি আমাদের বাড়াতে হবে, যেটা মোটেও সম্ভব নয়। আবার উন্নত দেশে আমাদের রপ্তানির সুযোগও সীমিত— Multifibre Agreement, US. Super 301 প্রভৃতি নানারকম বাধানিষেধ আছে। ফলে অর্থনীতিতে মোটেই সুফল পাওয়া যাবে না, কেবল আমাদের টাকাই হবে মূল্যহীন। তাই এটা স্পষ্ট যে এই নতুন আর্থিক নীতির লক্ষ্য হল আমদানি সহজতর করা এবং আধুনিক ভোগ্যবস্তু এদেশে সহজলভ্য করা।

সহায়িকা:

১। দেশ — শতাব্দীর অর্থনীতি : অম্লান দত্ত
২। The Statesman : A. K. Roy
৩। E.P.W — IMF Borrowing :Some Myths Exposed : Arun Ghosh
৪। E.P.W. — Smell of Surrender : B. M.
৫। " —Fund Bank Grand Design for India : B.M.
৬। " —New Industrial Policy : J. C. Sandesara
৭। Flight of Capital : James Joycee
৮। Eastern Commerce— Flight of Capital : S. C. Sarkar
৯। Speeches of Chandrasekhar — Election Manifesto — 1991 of Samajbadi Janata-Party.
১০। Speeches of Jasowant Sinha — Ex-Finance Minister

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

নারী মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং তসলিমা

বিজলি সরকার

মাতৃগর্ভের সন্তানটি মেয়ে হবে না ছেলে হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ক্রোমসোমের বিন্যাসের ওপর। শারীর বিজ্ঞানের এই নিয়মবদ্ধ বিন্যাস প্রক্রিয়াকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা এখনও সম্ভব হয় নি। নারী-পুরুষের ভেদভেদ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এসেই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাকৃতিক কারণে শরীরের গঠনগত বিভিন্নতার জন্য নারী-পুরুষের সামাজিক স্বতন্ত্রতার কথা অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন। "Biological differance between them were relevant for the bifurcation of their roles in society"[১] মানব সভ্যতা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি মানব চৈতন্যকে আজ কতভাবে প্রসারিত করে চলেছে। অথচ মানব মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে নারীর অবস্থান আজও কেন পুরুষের নিচে থেকে যাচ্ছে — এই প্রশ্ন নারীদের আজ সচেতন করে তুলেছে। এই প্রশ্নেই সম্প্রতি বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবি ও কলাম লেখিকা তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম (১৩৯৮-এ আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত) বইটি উভয়বঙ্গে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। তসলিমার বই নারীর সামাজিক অবস্থানের কোনও ধারাবাহিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাধর্মী নয়। কিন্তু তিনি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে দেখাতে চেয়েছেন যে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পৌঁছেও নারীর মানবীয় স্বাধীনতা বিষয়ে মীমাংসার অধিকার এখনও মৌলবাদীদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। ফলে আজও নারীরা সামাজিক-আর্থিক-নৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া পুরুষশাসিত সমাজে একজন নারী হিসেবে তসলিমা তাঁর অবস্থানের স্বরূপ এবং নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তীব্র ধারাল ভাষায়।

নারীর সামাজিক দূরবস্থা নিয়ে বহুদিন আগেই বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০—১৯৩২) মুখর হয়েছিলেন। নানা প্রবন্ধে -উপন্যাসে- গল্পে বেগম রোকেয়া নারী স্বাধীনতার পক্ষে বহু মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি এমন সব সাহসী কথা বলেছিলেন যে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়। বিশেষ করে তিনি যখন বলেন— "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।.....যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর?.....যাহা হউক এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য উচিত নহে।"[২] মেয়েদের মানসিক সীমাবদ্ধতা নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। মেয়েদের অলংকার পরা তাঁর দৃষ্টিতে দাসত্বের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়— "নিজের শরীরে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? যদি অলংকারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য বর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়?.....পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে বলেন 'আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব।'[৩] নারী-পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্য নিয়ে বেগম রোকেয়ার এই সব লেখার বিরুদ্ধে সে সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবাদ হয়েছিল। তবে সে প্রতিবাদ এতখানি আক্রমণাত্মক ছিল না, যেটা এই মুহূর্তে তসলিমার

বিরুদ্ধে হচ্ছে। এতে বোঝা যায় মৌলবাদী শক্তির তাপ কমেনি, বেড়েছে। তসলিমার প্রতিবাদের ভাষা বেগম রোকেয়ার থেকে আলাদা। তসলিমার ভাষা একেবারে চাবুক হাঁকড়ানো। বড় তীক্ষ্ণ হয়ে গায়ে বসে। তাই তাঁর বই মৌলবাদীদের এত উত্তেজিত করে। তাঁরা তসলিমার বই পুড়িয়ে দেয়, জীবননাশের ভয় দেখায়, জব্দ করার জন্য প্রত্যন্ত জায়গায় তাঁকে বদলি করায়।

প্রাচীনকাল থেকেই নারী-পুরষের বৈষম্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে ধর্ম। অন্তত ধর্মের সামাজিক বিধান যেটা আমরা দেখতে পাই। ধর্ম তার প্রয়োজন মত নারীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেছে। মহাভারতের সমাজ বইটিতে শ্রীসুখময় ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণে দেখতে পাই — ''মানুষের চরিত্রে যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, সকল দোষই নারীর চরিত্রে আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন,

জন্মান্তরীয় পাপের ফলেই জীব স্ত্রীরূপে জন্ম গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে আরও দুই চারিটি জঘন্য উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।''[৪] কোরআন শরিফে বলা হয়েছে ''পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।''[৫] বেশি দৃষ্টান্ত টেনে লাভ নেই। তাই নারীর সামাজিক অবস্থানের ব্যাখ্যায় ধর্মের ভূমিকার কথা এসেই যায়। ১৯০৪ সালে 'সবনূর' পত্রিকায় 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া লিখেছিলেন ''...ধর্ম শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে।''[৬] শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে বলেছেন— ''যে ধর্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে, আদিম জননী ইভ-এর পাপের উপর, যে ধর্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম সত্য বলিয়া যে কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাহার শ্রদ্ধা শুধু ততটুকুই হইতে পারে, যতটুকুতে নিজের স্বার্থ জড়িত হইয়া আছে। তাহার অধিক শ্রদ্ধাই বল, ন্যায্য অধিকারই বল, সহস্র বৎসর পূর্বেও পুরুষে দেয় নাই, সহস্র বৎসর পরেও দিবে না।''[৭] তসলিমাও বলেন ''নারীকে সবচেয়ে বেশি অমর্যাদা করেছে ধর্ম। ....কোনো ধর্মই নারীকে মানুষের সম্মান দেয় নি।'' (পৃ. ১৬৯) ধর্মের প্যাঁচ ক্রমশই খুলে যাচ্ছে। এখন ধর্মের সঙ্কীর্ণ সামাজিক বিধানের ওপর রাষ্ট্র নানা আইন তৈরি করছে। যদিও এসব আইন করা-না করার মধ্যে মূলগত কোনই পার্থক্য নেই। আমরা জানি শাহ্‌বানু মামলার সরকারী সিদ্ধান্ত কীভাবে বদলে যায় শরিয়তি আইনের জোরে। ক্ষমতা বজায় রাখবার দড়ি টানাটানিতে রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা কেবল নারী কেন, কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ কোনদিন সহায়ক হয়ে উঠবে কিনা তা বলা খুবই মুশকিল। তবু স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাশীল মানুষ মাত্রেই এর প্রতিবাদ করেন যেমন তসলিমা করেছেন। ধর্ম এবং রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তসলিমা রুখে দাঁড়িয়েছেন মৌলবাদীদের দাপট উপেক্ষা করে। তসলিমার সাহস আমাদের চমৎকৃত করে। তিনি তাঁর সামাজিক অবস্থানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন—''....কে বলে মেয়েরা পারে না একা বেঁচে থাকতে, একা দাঁড়াতে। আমার সর্বস্ব লুটে আমাকে নিঃস্ব করে যখন প্রতারক পুরুষেরা যে যার মত পালিয়ে গেছে কই আমি তো ধুলো ঝেড়ে ঠিক দাঁড়িয়েছি। ....আমার তো কই কোনো কষ্ট নেই। বরং এই ভেবে আনন্দ হয় যে কোন লম্পটের নাগালের মধ্যে থেকে আমি সেই জীবন যাপন করছি না যে জীবনে আমার দেবতাপুরুষ গণিকা সম্ভোগ সেরে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ঘরে ফিরবে আর আমার উরুতে হাত রেখে স্বভাব দোষে বলে উঠবে ভালোবাসি।''(পৃ.৯১) এখানেই তসলিমার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। মেরুদণ্ড সোজা রেখে অচলায়তন থেকে বেরিয়ে আসার দারুণ এই মনের জোর আমাদের বিস্মিত করে।

নারী সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কেবল বাংলাদেশ কেন তৃতীয় বিশ্বের নারীদের সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক। সেই হিসেবে ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটেও হুবহু খেটে যায়। তাই এদেশেও তসলিমার বইটির গুরুত্ব কিছু কম নয়। ইতিমধ্যেই কলকাতায় তসলিমার বইটি সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন গত ২ অগস্ট '৯২-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় কেতকী কুমারী ডাইসন, সুতপা ভট্টাচার্য এবং শিবনারায়ণ রায়ের তিনটি মূল্যবান আলোচনা ছাপা হয়েছে। মনে হয় এই আলোচনাগুলি বইটির ব্যাপক প্রচারে সাহায্য করবে। শিবনারায়ণ রায়ই প্রথম 'চতুরঙ্গ (মে '৯২ সংখ্যা) পত্রিকায় তসলিমা সম্পর্কে লিখে আমাদের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। 'আজকাল' পত্রিকায় বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত এবং কবি শঙ্খ ঘোষ 'নিবাচিত কালাম'-কে বলেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই।

নারী সম্পর্কে পুরুষের কতকগুলি আদি অকৃত্রিম শব্দ ব্যবহার করে আসছে প্রাচীন কাল থেকেই। যেমন 'সতী', 'অসতী', 'পতিতা', 'বন্ধ্যা', 'নষ্ট' — পুরুষ সৃষ্ট এসমস্ত অশ্লীল শব্দ অভিধান থেকে তুলে দেবার সময় কেন এখনও

হচ্ছে না—এ সম্পর্কে তসলিমার বিশ্লেষণ খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। তসলিমা খুব ঠিক কথা বলেছেন—''সর্বত্র বিরাজমান 'পতিত' পুরুষদের 'পতিত' বলবার রীতি শুরু হোক আজ থেকে। পতিতদের চিহ্নিতকরণ এসময় খুব জরুরী। কারণ 'পতিত'রা নির্মূল না হলে 'পতিতা' জন্মাবেই। মূলত 'পতিত'র স্বার্থেই 'পতিতা'র প্রয়োজন হয়।'' (পৃ. ১৭৫) বন্ধ্যাত্বের জন্য নারীকে যে চরম লাঞ্ছনা পেতে হয়, সন্তান জন্মদানে অক্ষম পুরুষকে সেক্ষেত্রে কিছুই দুর্ভোগ পোহাতে হয় না। ''কেন বন্ধ্যা'' পুরুষ বন্ধ্যা নারীর মত একই নিগ্রহ ভোগ করে না?''— (পৃ. ১১৬) তসলিমার এসব প্রশ্নের সঙ্গে সকলেই একমত হবে না। বুদ্ধি বৃদ্ধির চর্চা এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার সূত্রেই নারীর বিভিন্ন সমস্যাই তসলিমার বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে চমৎকার ভাবে।

কিন্তু একটা বিষয়ে তসলিমা নজর দিলে তাঁর বিষয়বিস্তার আরও সমৃদ্ধ হত। সেটা হল সমস্ত কিছুর মূলেই থাকে আর্থ-সামাজিক ভিত্তি — তার ওপরই বেশিরভাগ মানবীয় সমস্যাগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। আর্থনীতিক সাম্য-অসাম্যের ওপরেই ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের তরতম নির্ভর করে। প্রাচীন কাল থেকেই এই অবস্থা লক্ষ করা যায়। ''উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছিল, যদিও গৃহকর্মে তার পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল তবু তাকে 'ভার্যা' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে 'ভৃত্য' আর 'ভার্যা' শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই — যাকে ভরণ করতে হয়। স্ত্রী স্বয়ং অন্ন উৎপাদন করে না তাই সে ভরণীয়া।''[৮] আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন না করলে পুরুষের সমান স্বাধীনতা কথাটা অর্থহীন হয়ে যায়। আর্থিক স্বাবলম্বন এলে অসাম্য সমস্যাও ক্রমে অনেক সরল হয়ে আসে। যদিও অনেক মহামনীষীরা মেয়েদের আর্থনীতিক স্বাধীনতা সমর্থন করেন নি। মহাত্মা গান্ধীজী মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে মেয়েদের আদর্শ জায়গা হল গৃহকোণ। সেখানে সন্তান পালন, গৃহকাজই মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট থাকা উচিত। বাইরের কাজ পুরুষদেরই মাথায়। কেননা ''...It is in the fitness of this that he should have a greater knowledge there of. On the other hand, home life is entirely the sphere of women, and therefore, in domestic affairs, in upbringing and education of children, women ought to have more knowledge.''[৯] কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের অসংখ্য শ্রমজীবী মেয়েরা যে কী করবেন সে সম্পর্কে গান্ধীজী কিছু বলেন নি। গান্ধীজী অবশ্য দেশের সংকটের সময় মেয়েদের কিছু কিছু কাজের কথা বলেছিলেন। যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সময় মদ বিক্রি এবং বিলিতি কাপড়ের দোকানে দোকানে পিকেটিং করতে মেয়েদের এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। তাৎক্ষণিক এই সব সমস্যা দূর হয়ে গেলে মেয়েরা আবার গৃহে ফিরে যাবে। কেননা তিনি আদর্শ স্ত্রীলোক তাঁদেরই মনে করেন যাঁরা ''...devoted wife and the caring mother, a living Sati whose life is consecrated to the service of the husband.''[১০] আজকের সামাজিক আর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় এসব সাংঘাতিক রক্ষণশীল কথাবার্তার মূল্য বিচার অবান্তর। তসলিমার আর্থনীতিক স্বাবলম্বন অর্জন করতে পেরেছেন বলেই তিনি স্বেচ্ছাচারী পুরুষের আওতা থেকে বেরিয়ে একটা শক্ত জমিতে দাঁড়াতে পেরেছেন। তাই এই বিষয়টা তাঁর ব্যাখ্যায় থাকলে ভাল হত।

একটা বিষয়ে তসলিমা সম্পর্কে মৃদু অনুযোগ থেকেই যায়। এটা অবশ্য তাঁর বইএর বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নয়। নিতান্ত টেকনিক্যাল ভুল। তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের 'বিচিন্তা' পত্রিকায় অভিযোগ উঠেছে 'চৌর্যবৃত্তি'র। বিষয়টি নিয়ে *The Statesman* (July 4, 92) পত্রিকায় Prize Plagiarism শিরোনামে একটি দীর্ঘলেখা প্রকাশিত হয়েছে। এতে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অভীক সরকারের মতামতও রয়েছে। এবং এই লেখাটিকে ঘিরে তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে বেশ কিছু চিঠিপত্রও বেরিয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি হল ভারতের খ্যাতনামা সংস্কৃত গবেষিকা শ্রীযুক্তা সুকুমারী ভট্টাচার্যের বিখ্যাত বই 'প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য' থেকে তসলিমা চুরি করেছেন। এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক তা সকলেই এখন বুঝতে পারছেন। তসলিমার বিষয়-ভাবনা-ভাষা সম্পূর্ণপই তাঁর নিজের। কিন্তু তথ্য হিসেবে যখন তিনি সুকুমারী ভট্টাচার্যের বই ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে শ্রীযুক্তা ভট্টাচার্যকৃত সংস্কৃত অনুবাদের ভাষা যখন তিনি নিলেন তখন সেটা উল্লেখ করা তাঁর উচিত ছিল। দৈনিক কাগজে কলাম লেখায় রেফারেন্স দেওয়া না দেওয়ায় প্রশ্ন ওঠে না ঠিকই, কিন্তু বই করবার সময় পুরো রেফারেন্স দিয়ে দেওয়াই সৌজন্য। যেমন কোরআন শরিফের অনুবাদ তসলিমা ব্যবহার করেছেন 'হরফ' প্রকাশনীর মাওলানা মোবারক করীম জওহার

অনুদিত বইটি। রেফারেন্স দেওয়া থাকলে পাঠকের বুঝতে সুবিধে হয়। তবে এসমস্ত ত্রুটি নিয়ে বিতর্কের ঝড় তুলে তসলিমার বইটির গুরুত্ব আড়াল করার চেষ্টা উচিত নয়।

নারী সমস্যার বিষয়টিকে তসলিমা ধরেছেন শক্ত মুঠিতে। বিশেষ করে তাঁর ভাষার প্রবল টানে বহু আলোচিত বিষয়টিই একটা নতুন গতি পেয়েছে। কিন্তু একটাই বলবার বিষয়, তিনি নারী সমস্যার বিষয়টিকে কেবল সমাজের উপরিতল থেকেই দেখলেন, মূলে গেলেন না। বাইরের জগতে চলতে ফিরতে প্রতিদিন পুরুষের সংস্পর্শে বিশেষত পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে, দোকানে-বাজারে যেসব ছেলেরা মেয়েদের নানাভাবে উপদ্রব করে তারও একটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। আসলে সমাজের স্তর স্তরান্তে আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মানসিকতার পার্থক্য হতে বাধ্য। সেখানে নারী সমস্যারও রকমফের হয়। এই আর্থ সামাজিক অবস্থার দিকটি বিশ্লেষিত হলে তাঁর বইটি আরও সমৃদ্ধ হত। তবু তসলিমা যা করলেন তার মূল্যও অনেকখানি।

তথ্যসূত্র :

১। Indu Banga, Social reforns and the Gender Question in India Late Nineteenth-Early Twentith Century, Proceedings of the Indian History Congress, 51st session. Calcutta University, Calcutta. 1990 P. 549.

২। 'সম্পাদকের নিবেদন', রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১২।

৩। 'স্ত্রীজাতির অবনতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৪। 'মহাভারতের সমাজ', শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, শান্তিনিকেতন, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ৮০।

৫। কোরআন শরীফ, মাওলানা মোবারক করীম জওহর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৬৪।

৬। 'সম্পাদকের নিবেদন', রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৩।

৭। 'নারীর মূল্য', শরৎসাহিত্য সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ১৯৩৩।

৮। 'প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য,' সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪, পৃ. ২৮।

৯। 'গান্ধী-গবেষণা', পান্নালাল দাশগুপ্ত, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৮৫।

১০। Indu Banga, ibid, পৃ. 546-47.

নাটক

বিজয় তেন্ডুলকর : একটি ব্যক্তিত্ব

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখবন্ধ :

বিজয় তেন্ডুলকর-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় 'সাতাশিতে। ভারতীয় নাট্য সংক্রান্ত গবেষণার কাজে পুনে ও বোম্বাইতে বিভিন্ন নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে মরাঠী থিয়েটারের আধুনিক পর্ব সম্বন্ধে সন্ধান চালাচ্ছিলাম তখন। সেই সূত্রেই আলাপ। তারপর, সেই গবেষণার নানা পর্যায়ে এবং পরেও বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর সঙ্গে—হয়েছে বিস্তৃত আলোচনা। এ বছর জুলাই-এ শেষ যেবার কলকাতায় এসেছিলেন নাট্যশোধ সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তখনও অবসর হয়েছিল নানা কথা শোনার এবং বলার। বরাবরই লক্ষ করেছি, মারাঠী থিয়েটারের বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রমপরিণতি সম্বন্ধীয় ধারণা এবং নিজের ও সমসাময়িক নাটককারদের কাজ সম্পর্কিত মূল্যায়নও তাঁর অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। আর, ক্রমে গড়ে-ওঠা এই পরিচয়ের সুবাদে জেনেছি বিজয় তেন্ডুলকর মানুষটি পল-কাটা হীরের মত। সামান্য কৌণিক পরিবর্তনেই ঘটে ব্যক্তিত্বের নানারকম আশ্চর্য বিচ্ছুরণ। সেই সব আলোচনার ভিত্তিতে রচিত এই লেখাটি স্বল্প-পরিসরে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবার একটি প্রয়াস।

সাহিত্যস্রষ্টা : (ক) নাটককার

তেন্ডুলকর-এর প্রথম নাটক 'গৃহস্থ' দর্শকেরা কিন্তু প্রথম অভিনয়-সন্ধ্যাতেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অগ্রাহ্য করেছিলেন। নিরীক্ষামূলক মরাঠী থিয়েটারের অন্যতম প্রবর্তক দামু কেন্ধরের পরিচালনায় প্রযোজিত এই নাটক যে লাঞ্ছনা বয়ে এনেছিল সেদিনের সেই তরুণ নাটককারের জন্য তাতে তিনি মনস্থ করেছিলেন নাটক আর কোনদিনই লিখবেন না। কিন্তু, মরাঠী নাটক ও নাট্যের, হয়ত ভারতীয় থিয়েটারেরও, প্রয়োজন ছিল তেন্ডুলকর-এর মত সংবেদনশীল, উদ্ভাবনক্ষম, সচেতন ও আধুনিকমনস্ক এক নাটককারের এবং সৌভাগ্যক্রমে নাট্যচর্চার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারেনি সেদিন। তারপর, গত চার দশক ধরে তিনি লিখেছেন আটাশটি পূর্ণাঙ্গ, চব্বিশটি একাঙ্ক এবং এগারোটি শিশু নাটক—যার অনেকগুলিই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। ষাটের দশকের শেষভাগে 'শান্ততা! কোর্ট চালু আহে' তাঁকে ভারতীয় নাটককারদের প্রথম সারিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং মধ্য সত্তর দশকে 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' তেন্ডুলকরকে এনে দেয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার-প্রাপক এই নাটককার আজ এক সম্মানীয় ও বিতর্কিত নাম।

মরাঠী নাট্যের 'ক্রুদ্ধ যুবা' এই ছিল যাঁর প্রাথমিক পরিচয় সেই তেন্ডুলকর-এর নাটক সম্বন্ধে আমাদের মোটের ওপর ধারণাটি হল তীব্র হিংসা ও যৌনতা তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। কিন্তু এ হল আদতে এক চটজলদি সিদ্ধান্ত। মধ্য-পঞ্চাশ দশকে লেখা 'মানুষ নাওয়াচে বেট' নাটকই পূর্বসূরীদের সঙ্গে তেন্ডুলকর-এর পার্থক্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। কারিগরি শিল্প-নির্ভর নাগরিক জীবনে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাকর একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা নাটকটির এই বিষয়ই নিরীক্ষামূলক মরাঠী নাট্যচর্চার সেই উষালগ্নে হয়ে উঠেছিল যথাযোগ্য অবলম্বন। অনেক বছর পরে দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'সেই গোড়ার দিনগুলিতে আমি থিয়েটারের পাঠ নিতাম নাটকের অভিনয় দেখে। যে-কোনও নাটক। বিশির ভাগই বাজে নাটক। কখন-কখন তেতে উঠে সেই বাজে নাটকগুলোকে মনে মনেই মাজাঘষা

করতাম। সৌখিন অভিনয়ে অংশও নিয়েছি কখন-সখন। একটি নাট্যসংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল—আমারই মত অল্পবয়সী, অনভিজ্ঞ, লড়াকু কয়েকজন—তাদের সঙ্গে অভিনয় প্রযোজনা ইত্যাদি নিয়ে আড্ডা দিতাম, তাদের রিহার্সাল দেখতাম, অভিনয়ের সময় নেপথ্য থেকে লক্ষ করতাম তাদের।' এই নাট্যসংস্থা হল সেদিনের 'রঙ্গায়ন'—নিরীক্ষামূলক আধুনিক নাট্যচর্চায় ব্রতী। 'রঙ্গায়ন'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং দামু কেদ্বরে, মাধব ভাটেল, কমলাকর সারঙ্গ, অরবিন্দ ও সুলভা দেশপাণ্ডে, বিজয়া মেহতার মত নিবেদিত-প্রাণ নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক সেই গোড়ার দিনগুলিতে তেন্ডুলকর-এর সৃজনশক্তিকে উদ্দীপিত করে রাখত। 'মানুষ নাওয়াচে বেট' লেখার কয়েক বছরের মধ্যে তেন্ডুলকর 'মধল্যা ভিন্তি' (১৯৫৮), 'চিমনিচা ঘর হোতা মেনাচা' (১৯৫৯), 'মী জিঙ্কলো! মী হরলো!' (১৯৬৩), 'কাওড়াঞ্চি শাড়া' (১৯৬৩), 'সারি গ সারি' (১৯৬৪) ইত্যাদি কয়েকটি নাটক লিখে মরাঠী নবনাট্যের ধারাটিকে নির্দিষ্ট করে দেন। বিষয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও এই নাটকগুলির মূলকথা ও বলার ধরনের মধ্যে কিন্তু একটি সংগতি আছে—বিরূপ ও বৈরী সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমানুষকে নিয়েই তাঁর আগ্রহ। কোন সহজ সমাধানের কথা নেই এর একটিতেও। আধুনিক মানুষ তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে উপস্থিত, তবু কোনরকম নীতিকথা আওড়ানো বা আপাত দার্শনিকতার চেষ্টা নেই নাটকগুলিতে। 'সারি গ সারি'-তে তেন্ডুলকর প্রথম লোকনাট্য-আঙ্গিক ব্যবহার করেন।

'সাতখট্টিতে 'শান্ততা! কোর্ট চালু আহে' লিখে তেন্ডুলকর বিতর্কের এক কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী মরাঠী সমাজের বিরুদ্ধে এক জেহাদ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে পড়ে তাঁর এই নাটক। আপাতদৃষ্টিতে স্বভাববাদী বলে মনে হলেও নাটকের মধ্যে নাটক এনে বাস্তব ও মায়া—দুয়ের সীমারেখাটিতে ঝাপসা করে দেয়ার ফলে আরেকটি মাত্রা সংযোজিত হয়ে গেছে এই নাটকটিতে। চরিত্রগুলি 'যদি এমন হত' আর 'যেমনটা আদতে' এই দুয়ের মধ্যে অনায়াস বিচরণে প্রায় এক 'পিরানদেল্লো এফেক্ট' তৈরি করে তোলে। কিন্তু, পিরানদেল্লোর মত কোন দার্শনিক তত্ত্বের তাগিদে নয় সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধানের আগ্রহে নাটকটি লিখেছিলেন তেন্ডুলকর, একথাটি মনে রাখা দরকার। ডুরেনমাট-এর 'দ্য ভেঞ্জারাস গেম' উপন্যাসটির ইয়াফে-কৃত নাট্যরূপটির সঙ্গে 'শান্ততা'-র মিল খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ। অথচ, দুয়ের প্লটের মধ্যে অতি-ক্ষীণ এক সাদৃশ্য থাকলেও এই দুই লেখক যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আগ্রহ থেকে লিখেছেন সেই কথাটি—ছিদ্রান্বেষীদের স্বকৃত ছিদ্রপথে হারিয়ে না-ফেললে — না-বুঝতে পারার কোন কারণ নেই। ডুরেনমাট যখন অস্তিত্ববাদ-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত তেন্ডুলকর-এর ভাবনা তখন ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়ে। পরের বছরে লেখা 'দ্বন্দ্বীপচা মুকাবলা' কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক রূপক নাটক। ষাটের দশকের শেষভাগে এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু কিছু প্রতিফলন দ্বন্দ্বীপের রাজতান্ত্রিক শাসন অবস্থার মধ্য থেকে ঝলসে ওঠে, রূপকের আড়াল সত্ত্বেও চিনে নিতে অসুবিধা হয় না তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতা-অধিনেতাদের। নাটককার একটি সূত্রধার রেখেছেন এই নাটকে এবং তারই মাধ্যমে নাটকের কেন্দ্রীয় কথাটি তিনি পৌঁছে দেন আমাদের কাছে: ক্ষমতামাত্রই দুর্নীতির উৎস। মুখোশধারী দুটি চরিত্রও আছে, তারা বিশাল দুটি কলম হাতে নিয়ে মঞ্চে আসে আর সুরেলা ঢঙে আবৃত্তি করে মুক্তছন্দে লেখা সংলাপ। যে সংলাপ শুনলেই আমাদের মনে পড়ে যায় সংবাদপত্রের শিরোনামের কথা—অর্থহীন কিছু কথা যাতে কিছুরই কোন সমাধান হয় না, উলটে বরং সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে।

নাটকের আইডিয়া কোথা থেকে কেমন করে আসে! তেন্ডুলকর বলেন, 'আমার বেলায় যা হয় তা হল কেউ কিছু বলেছিল, কখন বা সামান্যক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল হয়ত কারোর সঙ্গে—চলে যাবার পর মনে হয়েছে কেমন মানুষ এই পুরুষটি বা নারীটি! বা সকালের কাগজে পড়া কোন খবর। অথবা আমারই পড়া কিংবা দেখা কোন নাটক বা ফিল্ম। এসব থেকেই মাথায় গাঁথা হয়ে যায় যে কোন ''বীজ''। কোন্‌টা যে বীজ হয়ে উঠবে আর কেনই বা তা হয় বলা মুশকিল। কখন আবার, একটা বীজ বেছে নিই—নিজেকে সঁপে দিই একগুচ্ছ ভাবনার মধ্যে, লিখতে বসি একটা নাটক আর লিখে ফেলি শেষ পর্যন্ত অন্য কোন একটা নাটক। ''গিধাড়ে'' আমি এইভাবেই লিখেছিলাম।' এই নাটকটির প্রথম অভিনয়ের পরে গিরিশ কয়ড়

লিখেছিলেন যে এই নাটকের মঞ্চায়ন যেন জমজমাট হাটের মাঝখানে বোমা ফাটানোর মত। যৌনতা ও তীব্র হিংসায় ভরপুর আর চমকদার নাটককার হিসেবে পরিচয়টা তাঁর তৈরি হয়ে যায় এই নাটক থেকেই। অশ্লীলতা ও কুরুচির অভিযোগ নিয়ে সেন্সর-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তুমুল বিরোধ শুরু হয়। মরাঠী সমাজের রক্ষণশীল অংশ অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও হিংসার খোলামেলা দৃশ্যগুলি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আজ কুড়ি বছর বাদে তদানীন্তন বিচারে বোঝা যায় যে নির্মোহ ব্যবচ্ছেদে তিনি দেখাতে চেয়েছেন মনুষ্য-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে কী অমেয় হিংস্রতা, লোভ, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও নীচতা। একটি পরিবারের মানুষগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন তেন্ডুলকর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয়ী অপচীয়মান স্বরূপ। পরবর্তীকালে তিনি জানিয়েছেন তাঁর জীবনের এক সংকট থেকে জন্ম নিয়েছিল এই নাটক এবং মাত্র চারদিনের মধ্যে শেষ করেছিলেন তিনি এই লেখা। 'গিধাড়ে' যদিও অভিনীত হয় সত্তর সালে, এই নাটক কিন্তু লেখা হয়েছিল আরও চোদ্দ বছর আগে।

'গিধাড়ে' লেখার পর তেন্ডুলকর বলেছিলেন এইরকম হিংসা ও যৌনতা সংবলিত কোনও নাটক আর কখনই তিনি লিখবেন না। কিন্তু, ষোল বছর পর তিনি লিখলেন 'সখারাম বাইন্ডার'—যে নাটক আবার তুলল তুমুল শোরগোল, 'গিধাড়ে'-র তুলনায় কম ত নয়ই, বরং আরও বেশি। এই নাটকের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাটককার এক তদানীন্তকা বজায় রেখেছেন, নৈতিক মানদন্ডে বিচার করার কোন প্রচেষ্টা নেই এখানেও। মনুষ্য-প্রকৃতির জটিলতা—যা স্যাদাও নয় বরং ধূসরতার নানা পরত-উন্মোচনে নিবদ্ধ তাঁর আগ্রহ। আর তাই এই চরিত্রগুলি ভাল আর মন্দ, দুর্বলতা আর সবলতায় মেলানো-মেশানো। জীবনের এই কুশ্রী দগদগে বাস্তবতা মধ্যবিত্ত দর্শকের রুচিবোধকে আঘাত করে প্রবলভাবে। তবু, 'গিধাড়ে'র মত এই নাটকেও মানবিকতা, অনুভূতিপ্রবণতা, কোমলতার এক অন্তঃস্রোতা ধারা যে বহমান মনোযোগী, সংবেদনশীল পাঠক বা দর্শকের কাছে তা কখনই অধরা থাকে না।

'বাহাত্তরে প্রথম অভিনীত হয় 'ঘাসিরাম কোতোয়াল'। ঘাসিরাম কোতোয়ালকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস পড়েছিলেন তেন্ডুলকর। সেই উপন্যাস যতটা ঐতিহাসিক তার চাইতে বেশি কাল্পনিক, শুধু তার ভূমিকাটি লিখেছিলেন এক ইতিহাসবিদ। বোম্বাইতে তখন শিবসেনার অভ্যুত্থান ঘটেছে, তেন্ডুলকর সেই সময় সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। একটি অকিঞ্চিৎকর সংগঠন ক্রমশ কীভাবে প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে উঠে ব্যাপক সন্ত্রাসের সাহায্যে খোদ রাজধানী বোম্বাইকে কব্জা করে রাখতে পারে এ সমস্তই তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এই ফাসিস্ত শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছিল—কীভাবে লালন করছিল অর্থ ও সুযোগ-সুবিধে দিয়ে। তেন্ডুলকর বলেছেন ওই রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর ভাবনাকে উস্‌কে দিয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাস যেন উন্মোচিত হতে শুরু করেছিল তাঁর চোখের সামনে। বোম্বাইতে যা ঘটছিল তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলেন এক পরিচিত নকশার পুনর্বুনন। উপন্যাসটির ভূমিকায় পড়া ঘাসিরাম সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যটিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল তাঁর সেদিন। আর তখনই একটি নাটক লেখার কথা মাথায় আসে তাঁর। কিন্তু ইতিহাস নয়, ঘটনাটির বিশ্বজনীনতা ও অন্তর্নিহিত মূল কথাটিই হবে তাঁর নাটকের মূল উপজীব্য। প্রয়োজন সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটটিকে গড়ে তোলা। বুঝলেন, তার জন্য দরকার একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক। তারপর কেমন করে হঠাৎ একদিন কোঙ্কনী লোকনাট্যের 'খেলে'-তে 'মানুষ-দেয়াল'-এর ব্যবহার দেখে তাঁর মাথায় এসে যায় 'ঘাসিরাম কোতোয়াল'-এর আঙ্গিক-চিন্তা—সেসব কথাও বলেছেন তিনি। 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' কেবল মরাঠী নয়, ভারতীয় নাট্যের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

'পঁচাত্তরে প্রযোজিত হয় 'বেবী' সিনেমায় 'একস্ট্রা'-র কাজ করে এমন একজন সরলসিধে নারীকে শোষণ করে তার আশেপাশের সকলেই—এই হলো 'বেবী'র বিষয়। 'ছিয়াত্তরে মঞ্চস্থ হয় জাতপাত নিয়ে লেখা প্রহসনধর্মী 'পাহিজে জাতি চে'। 'একাশিতে প্রযোজিত হয় 'কমলা'। এই নাটকটির বিষয়বস্তু সরাসরি জীবন থেকে নেয়া। 'ইনডিয়ান এক্‌স্প্রেস'-এর অশ্বিনী সারিন বাস্তবিকই মানুষ বেচা-কেনার বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন এক নারীকে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির করেছিলেন তাকে সংবাদের সত্যতার জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে।

এই নাটকে তেন্ডুলকর তুলে ফেলেন একটি জরুরী প্রশ্ন : সাফল্য-সন্ধানী আধুনিক প্রজন্ম কি মানবিকতার দোহাই পেড়ে ক্রমশ জলাঞ্জলি দিতে থাকবে মানবিক মূল্যবোধকেই? শুধু এই নয়, আরও একটি বিবেচ্য প্রসঙ্গ আছে 'কমলা'-তে। 'শান্ততা' বা 'গিধাড়ে'-র মত 'কমলা'-তেও ইদানীংকার ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থানটি বুঝে নেবার একটা চেষ্টা আছে। বাজার থেকে কিনে-আনা কমলা আর সাংবাদিক যাদবের স্ত্রী সরিতা দুয়ের অবস্থানের মধ্যে যে বিশেষ কোন তারতম্য নেই, বরং তা যে প্রায় অবিকল এই সত্যটি আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় একটি দৃশ্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। 'তিরাশিতে প্রথম অভিনীত হয় 'কন্যাদান'। মহারাষ্ট্রে দলিত-সম্প্রদায় এই নাটকটির বক্তব্যের এক চট্‌জলদি বিচার করে ক্ষুব্ধ হলেও, 'কন্যাদান' কোনমতেই বর্ণ কিংবা সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিরোধী নয়। নাটকটির নামের মধ্যেই বিষয়মূল সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। সমাজবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ পিতা আদর্শ-পালনের পরাকাষ্ঠা হিসেবে মেনেছেন ব্রাহ্মণ-কন্যার দলিত পাত্রকে বরণ করাকে। কন্যাকে তিনি প্রভাবিত করেন সেই আদর্শ মেনে নেবার জন্য। কোন বর্ণ বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়, এখানে সমালোচনা বরং জীবনবিচ্ছিন্ন সমাজবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে। লক্ষণীয় যে, এই নাটকেও নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণ যে পুরুষেরই হাতে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'পঁচাশিতে প্রযোজিত হয় 'বিঠ্‌ঠলা'। মানব-জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে কি না এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তিনি স্বভাবসিদ্ধ হাল্‌কাচালে। 'নব্বই-এর দশকে পৌঁছে এই অফুরান সৃষ্টিক্ষমতা সম্পন্ন নাটককার এযাবৎ আমাদের উপহার দিয়েছেন তিনটি নতুন নাটক : 'চিরঞ্জীব সৌভাগ্যকাঙ্ক্ষিণী', 'নিয়তি চা ব্যয়লালা' এবং 'সঙ্কর'। বিষয় ও বক্তব্যে ভিন্নধর্মী এই রচনাগুলি নাটক নিয়ে তাঁর নিরীক্ষা চালাবার অদম্য স্পৃহার পরিচয় বহন করছে।

ষাটের দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের যে চারজন নাটককার ভারতীয় নাট্যে আধুনিকতার ঢল এনেছিলেন তাঁরা হলেন—হিন্দীতে মোহন রাকেশ, বাংলায় বাদল সরকার, কানাড়ীতে গিরিশ কয়াড় এবং মরাঠীতে বিজয় তেন্ডুলকর। মোহন রাকেশের অকাল মৃত্যু হিন্দী নাটকের ক্ষেত্রে যেমন সর্বভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি এক অপূরণীয় ক্ষতি। গিরিশ কয়াড় নাটক লেখেন অবরে-সবরে। বাদল সরকার দীর্ঘকাল ধরে নাটক লিখেছেন, কিন্তু তাঁর নাটক রচনা ও নাট্যচর্চা কয়েকটি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। এই চারজনের মধ্যে একমাত্র তেন্ডুলকরই সবচেয়ে বেশি ফলনশীল এবং সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যসম্পন্ন। 'গৃহস্থ' (১৯৫৫) থেকে 'সফর' (১৯৯২) ভারতীয় আধুনিক নাট্যের এই দীর্ঘপথ তিনি অতিক্রম করেছেন কখন সঙ্গী-সমভিব্যাহারে কখন বা একলাই, সেই সঙ্গে আমাদের জন্যে রেখে দিয়েছেন এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার এবং আমাদের করে তুলেছেন আরও প্রত্যাশী।

(খ) অনুবাদক :

মৌলিক নাটক লেখা ছাড়াও অপরের নাটক অনুবাদ করেছেন তেন্ডুলকর। মোহন রাকেশের 'আধে আধুরে', গিরিশ কয়াড়ের 'তুঘলক' যেমন তেমনই মার্কফন ডায়ুন-এর 'লাস্ট ডেজ অব লিঙ্কন', জন প্যাট্রিক-এর 'হেস্টি হাই', টেনেসী উইলিয়াম্‌স-এর 'আ স্ট্রীটকার নেম্‌ড ডিজায়ার' ইত্যাদি। এছাড়া তিনি গোটা ন'য়েক উপন্যাস ও দুটি জীবনীও অনুবাদ করেছেন।

(গ) চিত্রনাট্যকার :

চলচ্চিত্র শিল্পেও এই ব্যাপ্তপ্রতিভাবের স্রষ্টার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মরাঠী ও হিন্দী বহু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছেন তিনি এবং রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ পুরস্কারে অভিনন্দিত হয়েছেন। সত্যদেব দুবে, জব্বর প্যাটেল, গোবিন্দ নিহালনির মতো সুখ্যাত পরিচালকেরা চিত্রনাট্যের জন্য নির্ভর করেছেন তাঁর ওপর। 'সামনা', 'উম্বার্তা', 'নিশান্ত', 'মন্থন', 'আক্রোশ', 'অর্ধসত্য', 'কমলা', 'আঘাত', ইত্যাদি চলচ্চিত্রের সফল চিত্রনাট্যকার তিনি। এই চলচ্চিত্রগুলির প্রবল অভিঘাতের পেছনে তাঁর অসাধারণ চিত্রনাট্যগুলির ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

(ঘ) ছোটগল্পকার ও বিবিধ রচনাকার :

নাটককার তেন্ডুলকর-এর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত

কিন্তু গল্প লেখা দিয়ে। 'মাতি' তাঁর লেখা প্রথম গল্প, পরে এই গল্প ভিত্তি করে একটি বেতার-নাট্য লেখেন তিনি। পরের গল্প 'গৃহস্থ' নাট্যরূপায়িত হয়েছিল। আটান্ন থেকে সত্তর সালের মধ্যে চারটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। এছাড়া তিনি লিখেছেন আরও অজস্র রম্যরচনা, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনায়াসে বিচরণ করেছেন এবং আজও করে চলেছেন।

তন্নিষ্ঠ সামাজিক :

বড়ো ভাই ছিলেন গান্ধীবাদী, বাড়িতে ছিল চরকা ও খাদির চল। তেন্ডুলকর-এর শৈশব কেটেছিল সেই পরিবেশে। স্কুলে ভর্তি হবার পর যোগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের সময়—বয়স তখন চোদ্দ কি পনের—স্কুল পালিয়ে ইস্তাহার বিলি করতেন। তারপরের যোগাযোগ ঘটে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সঙ্গে। আরও খানিক পরে শুরু হয় কমুনিস্ট সভায় যাতায়াত ও মার্কসীয় তত্ত্ব অধিগত করার জন্য পড়াশুনা। কিন্তু, সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা গড়ে উঠতে থাকে তখন নয়, আরও পরে সাংবাদিকতা-কর্মে লিপ্ত হবার পর। তেন্ডুলকর মনে করেন সেই জ্ঞানও ছিল পরোক্ষ। সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ তাঁর সত্যিই ঘটে বাহাত্তর-তেয়াত্তর সালে নেহরু ফেলোশিপ পাবার পর দেশে ক্রমবর্ধমান হিংস্র সামূলক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে গবেষণা-সংক্রান্ত কাজে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে। তখনই তিনি প্রথম বুঝতে পারেন রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র ও সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ—এই দুই কেমন করে পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত হয়ে থাকে। তেন্ডুলকর বলেন, 'আমি যা করি—সমাজে কিছু একটা ঘটে আর মনের মধ্যে একটা আঘাত লাগে বলেই তা করি। সমাজের জন্য নয়, নিজের জন্যই করি। তা সমাজের কোনও কাজে লাগে না, সমাজ তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে না।' তিনি মনে করেন, তাঁর লেখায় যে সমাজ-সচেতনতা ব্যক্ত হয় তা স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিহার্য ভাবেই হয়। নিজের মধ্যে এক দ্বৈত-সত্তা খুঁজে পান তিনি। সামাজিক নানা কারণে তাঁর যে-'আমি' প্রতিক্রিয়াঘিত হয়ে ওঠে—বিভিন্ন প্রতিবাদ- মিছিল, ধর্না, অনশন বা সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে সেই 'আমি'টা সহজেই তাৎক্ষণিক আবেগে বিচলিত হয়, সমস্যাকে সাদা কালোর বিচারে দেখে এবং সরলীকৃত আলোচনায় মেতে ওঠে। কিন্তু, তাঁর যে-'আমি'টা লেখে সে কিন্তু অত সহজে বাগ মানে না, একটু দূরে সরে থেকে সংশ্লিষ্ট অথচ নির্মোহ তদাত্মক ভঙ্গিতে লক্ষ করতে থাকে জীবনকে। এই দ্বিতীয় 'আমি'টা যেকোনো চট্‌জলদি সিদ্ধান্তকে ভীষণ অপছন্দ করে—প্রস্থিতিগুলিকে জটিল বলে মানতেই সে অভ্যস্ত। সাহিত্যে সমাজ-সচেতনতা থাকতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই তবু সাহিত্যিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সমাজ থেকে লেখক যা পান সমাজকেই তা ফিরিয়ে দেন তিনি। এই বিচারে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে সমাজ এক অপরিহার্য সংঘটক। আবার যে লেখক শুধুই সমাজ-সচেতন অথচ আত্মনিষ্ঠ নন তেন্ডুলকর-এর মতে তার লেখা একঘেয়ে ও প্রচারধর্মী হতে বাধ্য। আমাকে বলেছিলেন, 'সাম্প্রতিক মরাঠী নাটক যে ক্রমশই রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠছে এটা অবশ্যই এক সুলক্ষণ। কিন্তু, আমার ভয় হয় এতেই না তা আটকে পড়ে। কারণ, একজন দলিত যেমন দলিত তেমনি সে ব্যক্ত মানুষও বটে, আবার একজন শ্রমিক যেমন শ্রমিক তেমনি সেও ব্যক্তি-মানুষ। এই সরল সত্যটা ভুলে গেলে মানবিক-উপাদানটাই হারিয়ে যাবে নাটক থেকে।'

বোম্বাই সিভিল রাইট্‌স্ প্রিজারভেশন কমিটির অধ্যক্ষ ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সংস্থার কার্যকরী সমিতির সদস্য — জাতীয় সংহতি সমিতির সদস্য — চৌষট্টি বছর বয়সের যুবা বিজয় তেন্ডুলকর—'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলন-এর অন্যতম নেত্রী মেধা পাটকর যাঁকে মানেন প্রেরণার উৎস বলে — আজও তাই বোম্বাই-এর বসবাস ছেড়ে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়েন, চলে যান প্রান্তিক বা অন্তর্বর্তী অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে কোন না কোন গঠনমূলক কাজের অংশীদারিত্বের টানে।

কালিদাস সম্মানে ভূষিত হবার পর ভোপালে ভারতভবনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন : 'সবশেষে, আমি কৃতজ্ঞ আমার সময়ের কাছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে গত চল্লিশ বছর হল বদল আর ঝড়-ঝাপটার কাল। সৃষ্টির তাগিদকে উসকে দেবার মত ছিল এই সময়। আমার লেখায়, খুবই সীমিতভাবে যদিও, এই সময়েরই প্রতিফলন ঘটেছে। আমার কাজ যদি কোনভাবে কোন স্বীকৃতিলাভের যোগ্য হয়ে থাকে তবে তা হতে পেরেছে সময় আমাকে লেখার

বিষয় ও প্রেরণা যুগিয়েছে বলেই। আমার সময় আমাকে নতুনতর নানা লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করে চলেছে এখনও—হাত থেকে কলম নামিয়ে রাখবার অবকাশ দিচ্ছে না। এই দেশে এই সময়ে জন্মেছি বলে লেখক হিসেবে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান বলে মানি।'

মানুষ তেভুলকর :

কী পরিচয় এই মানুষ তেভুলকর-এর? সরকারী নথিপত্রে বা আর্কইভে রাখা জীবনপঞ্জিতে যেমন লেখা থাকে জন্ম: ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৮ বোম্বাই-এ; শিক্ষা: ম্যাট্রিক পর্যন্ত; জীবিকা: যোলো বছর বয়সে ছাপাখানায় কর্মজীবনের শুরু, তারপর সাংবাদিকতা, পরে চিত্রশিল্প — শুধু এইটুকু? এইসব তথ্য থেকে কি চিনে নেওয়া যায় কোন মানুষকে? মানুষ স্বয়ম্ভূ নয়, কিন্তু স্বয়ম্ভর হতে পারে সে—যদিও তেমন মানুষ হাতে গোনা যায়। আমার কানে বাজে নিজের সম্পর্কে বলা তাঁর কয়েকটি কথা, মনের মধ্যে কথাগুলো ঢেউ তোলে একটার পর একটা — আর ঢেউ-এর রেখাগুলি ভেঙেচুরে গিয়ে ফুটে উঠতে থাকে একটা ছবি, একজন মানুষের ছবি:

'মনের মধ্যে যে কষ্ট, রাগ, দুঃখ, অস্থিরতা, বিভ্রান্তি, আনন্দ হয় অহরহ—সেসব প্রকাশের অন্য কোনো উপায় আমার নেই, এইসব ভার লাঘব করার জন্য আমি লিখি। এই প্রকাশগুলিরই কোনটা নাটক, কোনটা গল্প, কোনটা রম্যরচনা। পনের-ষোল বছর বয়সে চুকে গিয়েছিল পড়াশোনার পাট—স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম। কোন বন্ধু ছিল না—পরিবারের মানুষদের সঙ্গে সংযোগ গিয়েছিল ছিন্ন হয়ে। একা একা নিজের মনে থাকতাম। মনের একাকিত্ব ঘোচাবার জন্য লিখতে শুরু করি। লেখা আমার কাছেএকটা ''বেসিক নীড''। লেখাই আমার সন্তাযণ—লেখাই আমার আলাপচারিতা। একাকিত্বের বয়সটা একসময় কেটে গেল, কিন্তু লেখা বন্ধ হল না। লেখা চলল। কী করে সেটা হল? আমার মনে হয়, বাইরের একাকিত্বটা ঘুচলেও ভেতরে-ভেতরে আমি আজও একা। আমিও কথা বলি—প্রচুর কথা, ভাষণ দিই, হালকা রসিকতা করি। কিন্তু এতে আমার মন মানে না, লেখার তাগিদটা মেটে না। লিখলে তবে মুক্তি পাই। এটা ঠিক যে বহুদিন পর্যন্ত আমি লিখে রোজগার করেছি—পেট ভরিয়েছি লিখে। আজ আমার নাম হয়েছে—খ্যাতি হয়েছে, আজ আর ঠিক পেট ভরাবার জন্য লিখতে হয় না। কিন্তু, লেখার সঙ্গে তবু আমার বেঁচে থাকার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। লিখলে আমি শান্তি পাই—লিখলে আমি তৃপ্ত হই। তবু, মাঝে-মাঝে নিজের লেখার ওপরেই আমার খুব রাগ হয়— থুতু দিতে ইচ্ছে করে নিজের লেখাতেই। আমি নিজে কপট, নীচ, কৃতঘ্ন, পাপী — আমার নাটকের চরিত্রগুলির মতই—তবে কোন্ অধিকারে লেখার সময় নিজেকে বিচারকের আসনে বসাই আমি!'

এই হলেন তেভুলকর। সৎ—বড্ডো তীব্রভাবে সৎ, দরদী, সহমর্মী, ক্রুদ্ধ, পরিহাসপ্রিয় এবং তদাত্মক দৃষ্টি-সম্পন্ন সৃষ্টিশীল এক মানুষ।

স্মরণে

শ্রীযুক্তা লীলা রায়

শ্যামশ্রী লাল

এ্যালিস্ ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ্, এল্ পাসো, টেক্সাস, ইউ-এস্-এ এমন নাম ও ঠিকানা শুনলে বাঙালি মনে যে ছবিটি ফুটে ওঠে — শ্বেতকায়া, লম্বা-চওড়া চেহারা, টিউটনিক্ সোনালি চুলে ঘেরা আর্য মুখশ্রী একটি — এই সবই হয়ত তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত, চেষ্টা করলে, কিন্তু শ্রদ্ধেয়া লীলা রায়, আমাদের প্রিয় লীলা মাসি, ওই বাঁধাছকের গণ্ডি পেরিয়ে অনেক দূরে চলে এসেছিলেন, অনেকদিন আগে। আমেরিকার সীমান্ত প্রদেশে জন্ম নিয়েছিলেন, অনেকদিন আগে। আমেরিকার সীমান্ত প্রদেশে জন্ম নিয়েছিলেন বলে তাঁর অসাধারণ চরিত্রের দুটি গুণ হয়ত বা তিনি পরিবার সূত্রেই লাভ করেছিলেন, অসম সাহসিকতা ও স্বাধীনতা বোধ। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি — আন্দাজে মনে হয় ১৯৩৮-এর কাছাকাছি বা কিছু পরে — তখন আমরা একেবারেই শিশু। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ছিল আমাদের বাড়ি, মা ও মাসিমা, পথিকৃৎ লেখিকা শান্তাদেবী ও সীতাদেবী, কাছাকাছি বাড়িতে থাকতেন। দাদামশাই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বছরের মধ্যে কয়েক মাস পালা করে থাকতেন দুই কন্যার বাড়িতে। মনে হয় সেই সময়েই আমি অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়কে প্রথম দেখি। তখনকার বিখ্যাত রোমান্টিক উপন্যাস 'রমলা'র লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর বাড়িতে তাঁরা কয়েকদিন কাটাতে এসেছিলেন। রামানন্দের 'প্রবাসী' পত্রিকাতেই 'রমলা' ধারাবাহিক নিয়মে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯—৩০ বঙ্গাব্দে। গতাসু 'প্রবাসী'র পৌষ, ১৩৮২ সংখ্যায়, অন্নদাশঙ্কর আমাদের পরিবারের ক'জন সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় লিখেছেন ''রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। মনে মনে ব্রাহ্ম হয়েছি। সাংবাদিক হতেও চেয়েছি। কিন্তু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়ে ওঠেনি। ...একবার তাঁকে চিঠি লিখে একটি বাণী প্রার্থনা করি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পত্রের উত্তর দেন। তাঁর বাণীর মর্ম, প্রত্যক্ষভাবে কখনো কারো সেবা করলে যেমন তৃপ্তি হয়, আর কিছুতে নয়। এ বাণী আমার মনে গেঁথে যায়। ....আমি যখন বাঁকুড়া জেলার জজ তখন তিনি আমাদের কুঠিতে পদার্পণ করেন।... তাঁর সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎ হয়েছে। শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বেড়ে গেছে।''

ইয়োরোপে থাকার সময়ে অন্নদাশঙ্কর মণীন্দ্রলাল বসুকে বন্ধুরূপে পান এবং সেই বন্ধুত্ব মণীন্দ্রলালের জীবনাবসান অবধি থেকে যায়। মণীন্দ্রলালের পার্ক সার্কাসের বাড়িরই এক অংশে সীতা দেবীর সপরিবারে থাকতেন, সীতাদেবী স্বামী সুধীর কুমার চৌধুরী, তখনকার দিনে স্বীকৃত ও পুরস্কৃত কবি ছিলেন, আর মণীন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মাসিমার ঘরের পাশে সুন্দর ছোট-ছোট কয়টি শিশু খেলা করছে, জানতে পেয়ে আমরা দৌড়েছিলাম মাসির বাড়ি। ছোট বাচ্চা দেখতে ভারি ভাল লাগত আমাদের। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি মনে পড়ে, একটি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসা এক বিদেশিনী, কোঁকড়া চুল খোঁপা করে দিশী ভাবে বাঁধা, কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর, ফর্সা হাতে চওড়া শাঁখা, মোটা খদ্দরের লালপাড় সাদা শাড়ি পরা, ধপ্‌ধপে সাদা পা দুটিতে আলতা। আর মনে আছে তাঁর উজ্জ্বল চোখের চাহনি আর উদার হাসিমুখ। শিশুদুটি সহজ আনন্দে মায়ের চেয়ারের চারপাশে খেলে বেড়াচ্ছিল তখন। স্বাধীনতা লাভের আগে যাঁরা শিশু ছিলেন, তাঁরা যে সব বিদেশিনী দেখতেন, তাঁরা সবাই ছিলেন 'মেমসাহেব', কঠোর দাপটে ইস্কুলে, কলেজে বা সরকারী দপ্তরে তাঁরা ব্যস্ততা প্রকাশ করতেন। দোকানে বাজারে শখের জিনিস কিনতে গেলে সাহেব পাড়ায় তাঁদের দূর থেকে দেখে ভয়ে পালিয়েছি। খট্‌খটে তাঁদের পোষাক, গলার স্বর, হাঁটা-চলা। কিন্তু এই শিশু পরিবৃতা মাতৃমূর্তি—-এ কেমন বিদেশিনী? পরে জানলাম তিনি লীলা রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমেরিকান পত্নী। দাদামশাই আমাদের বলেছিলেন যে বাঁকুড়ায় ওঁরা থাকতেন; আন্তরিকভাবে তাঁরা গান্ধীভক্ত স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক— I. C. S. পদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়েও যেন

মণীন্দ্রলাল বাবুর বাড়িতে ওঁদের দেখেছি—শ্রীমতী অরুণা আসফ আলিকে দেখতে ও নানা আলোচনা করতে কয়েকজন এসেছিলেন, তিনি তখন লুকিয়ে ঘোরাফেরা করতেন। অরুণা দেবীর চেয়ে লীলা দেবীকেই যেন আরো বাঙালি মনে হয়েছিল সেদিন, পর্দার আড়াল থেকে। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবেশে এমন সাবলীল তৃপ্তিতে মিলে থাকতে, লীলামাসির মত, অনেকদিন বিদেশী কাউকে কাউকে দেখিনি।

মা-বাবার কাছে তখনকার দিনে P.E.N. সংস্থার পত্রিকা আসত। সেগুলি প্রতিষ্ঠাত্রী সোফিয়া ওয়াডিয়া বোম্বাই থেকে পাঠাতেন, কলকাতার শাখাও তখন যথেষ্ট কর্মব্যস্ত। লীলামাসির লেখা পুস্তক সমালোচনা আমরা মন দিয়ে পড়তাম সেই পত্রিকাতে। মা-মাসিমার গল্প সমালোচিত হয়েছিল তাঁর লেখায়, বাড়িতে তাই নিয়ে আলোচনা চলছে শুনেছি। লীলামাসি তখনই পথিকৃৎ, বাঙালি সমাজ জীবনে যেমন তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, তেমনই বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায়, কিছু অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও। কত বছর ধরে তিনি ভারতীয় ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করে চলেছেন, তার হিসাব কি কেউ রেখেছে? আজকের দিনে, সাহিত্যে ও অনুবাদ কর্মে বাজারি দক্ষতা ও নামী পত্রিকার, পক্ষভুক্ত সম্মান যতই বেড়ে চলেছে, ততই আমাদের আদি পথ প্রদর্শকদের আমরা ভুলে যেতে চাইছি যেন। লীলা রায় ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন। তাছাড়া তিনি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মার্গসংগীতের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন বহুদিন; ইয়োরোপীয় কয়েকটি ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা স্বীকৃত। তাঁর সংবেদনশীল মন ভারতীয় সাহিত্যের স্বরূপ চিনেছিল, বিশ্বসভায় ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয়কর্মে তিনি নিরলস ও আগ্রহী কর্মী ছিলেন, অর্দ্ধশতাব্দীরও বেশি। অথচ স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ, তাঁর এই আজীবন স্বার্থহীন কর্মের প্রতিদানে কোনও সম্মান তাঁকে উপহার দিয়েছেন কি? শেষ জীবনে, অসুস্থ-দুর্বল শরীরে, তিনি 'বনফুল' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন শুধু, দূরদর্শনের পর্দায় তাই দেখলাম। ওঁর মৃত্যুর পরে, তাঁর আদি নিবাস ও প্রাকবিবাহ-নাম বিষয়ে খবর নিতে কাগজের রিপোর্টাররা দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন শহরে! তাঁর বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান আমাদের?

ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক আলাপ-পরিচয় আমাদের সঙ্গে লীলা রায়ের শুরু হয় অনেক পরে, ১৯৬০ সালে। অধ্যাপক লাল ও আমার ছোট্ট সংসার আমরা তখন গড়ে তুলেছি কলকাতার লেক গার্ডেনস্ অঞ্চলে। ভারতীয় সাহিত্যিক যাঁরা ইংরেজি ভাষায় লিখতেন এবং তার জন্য প্রচুর নিন্দাবাদ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে শিখছিলেন—তাঁদের ক'জন মিলে একটি ঘরোয়া ধাঁচের সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তুললেন, অধ্যাপক লালের প্রচণ্ড উৎসাহে। সেই সময়ে যাঁরা তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমর্থন যোগান দিতেন, সেই অতি অল্প ক'জনের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ডেভিড্ মেকাচ্চান্ ও শ্রীযুক্তা লীলা রায়। আসলে, আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ডেভিড্, তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। তার আগে তিনি বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করতেন, যেখানে লীলা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁকে তিনি নিজের সন্তানের মত সেবা-যত্ন করতেন। লীলামাসিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসেন ডেভিড্ই; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Entrance* প্রকাশিত হয় অধ্যাপক লালের সংস্থা 'রাইটার্স ওর্কশপ্' থেকে ১৯৬১ সালে। বইটির মুখবন্ধ লেখেন ডেভিড্ মেকাচ্চান, আর তারপরে *The Valley of Vision* ও দুটি বই তাঁর ঐ প্রকাশনা সংস্থা থেকেই প্রকাশ হয়; শেষের দুটি পৌত্র চন্দ্রহাস রায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে লিখিত, ১৯৮৬ সালে।

তখনকার দিনগুলি আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শীতের রোদে, সামনের ছোট বাগানটিতে বসে আমরা কত হাসি গল্প, তর্ক, আলোচনা করেছি, খাবার টেবিল ঘিরে সাদাসিধা ডাল-ভাত ভাগ করে খেয়েছি—সেই ঘরোয়া গোষ্ঠীর মাতৃস্থানীয়া সভ্যা ছিলেন লীলামাসি। ছেলেবেলায় যখন তাঁকে দেখেছিলাম, সেই চেহারার বদল হয়েছে তখন অনেকটা, কিন্তু সেই লাল সিঁদুর, সাদা শাঁখা আর খদ্দরের শাড়ি চলছে তখনও। ততদিনে অনেক দুঃখ-আঘাত পেয়েছেন জীবনে কিন্তু চোখের দৃষ্টি শান্ত—উজ্জ্বল, মুখের মিষ্টি হাসি মুছে যায়নি। যোধপুর পার্কে তাঁদের ছোট সংসারে দেখা করতে যেতাম মাঝে-মাঝে। নিজের হাতে করা কেক্ খেতে দিতেন অতিথিদের। বইয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে সুন্দর একটি পিঠসোজা Piano তাঁর সংগীত-সাধনার দিনগুলির কথা মনে করাত, বসে বাজাতেনও মাঝে-মাঝে। একবার ওঁর যৌবনকালের কথা জানতে চেয়ে কিছু প্রশ্ন করে ছিলাম। সংগীত সাধনার টানে ভারতবর্ষে এসে সুদর্শন বাঙালি এক যুবকের সঙ্গে কেমন ভাবে আলাপ হল, তাঁর কথা শুনে ভারতীয় সংগীত, গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রাম, রবীন্দ্রসাহিত্য সব বিষয়ে আগ্রহী হয়ে, কী দুঃসাহস নিয়ে এদেশে থেকে গেলেন, আর ফিরলেনও না—সব গল্প করলেন। বাঁকুড়ায় দরিদ্র গ্রামবাসীদের সেবা, ওড়িষ্যায় শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুরে রহস্যময় জীবনধারা, শান্তিনিকেতনে নানা

অভিজ্ঞতা—এবং সবার উপরে দুঃখে বা বিপদে বিহ্বল মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর শক্তি ও স্বস্তিবোধ, তাঁর স্নিগ্ধ-সরল বক্তব্যে এমন চমৎকারভাবে ফুটে উঠত। রামানন্দের বাণী আবার মনে পড়ল। 'প্রত্যক্ষভাবে কখনো কারো সেবা করলে যেমন তৃপ্তি হয়, আর কিছুতে নয়।' টেক্সাস্ প্রদেশ সম্পর্কে একটা মনে-রাখার-মত কথা তিনি বলতেন। আমেরিকার দক্ষিণ অংশে যে কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের প্রতি অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তা কিন্তু অতটা লক্ষ করা যেত না ওঁদের গ্রামাঞ্চলে। সেখানে মেকসিকোবাসী ও আদিম আমেরিকার 'ইণ্ডিয়ান' জাতিগুলি জড়ো হয়ে বসবাস করেছিল বহুদিন ধরে, বিদ্যালয়েও তিনি সেই জাতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছেন। তাছাড়া, তাঁর পরিবারের গুরুজন স্থানীয় আত্মীয়দের ভিতরে অনেকেই শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন, যাঁরা বর্ণবিদ্বেষকে ঘৃণা করতেন।

লীলা রায়ের পথনির্দেশকারী কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল Translators' Society of India প্রতিষ্ঠা করা; অনুবাদকের কাজ কৃতজ্ঞতার যোগ্য হয় না কখনই—বহু নিরলস অনুবাদকই এই কথাটি স্বীকার করেন, অতি দুঃখে। তবু, সাহসে ভর করে লীলা দেবী এই কাজ বেশ কিছু বছর চালিয়ে যান, শরীর ভেঙে যাবার আগে পর্যন্ত। তিনি তারাশঙ্কর, সতীনাথ, অন্নদাশঙ্কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি খ্যাতিমান লেখকদের সাহিত্য কর্মের অনুসৃজনে নিযুক্ত ছিলেন বহুবছর, শেষজীবনে সত্যজিৎ রায়ের film script-এর অনুবাদও করেছেন অনেক, যা প্রথমে ডেভিড্ করতেন। ওড়িয়া থেকে উচ্চমানের সাহিত্য অনুবাদও তিনি বহু করেছেন, যার হিসাব সাহিত্য অকাদেমি হয়ত করে রেখেছেন। লীলামাসি ছিলেন সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন কবিমনের সাহিত্যিক। ডেভিড্ মেকাচ্চানের আকস্মিক ও ভয়ংকর মৃত্যুর পরে তিনি দুটি অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন, তার থেকে একটি এখানে তুলে দিলাম, তার কারণ লীলামাসি সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়।

There are times in the lives of most men
When their hearts are like the Holy Ganges:
Every thing is contained in them.

But this boy was not like that.
He was as clear and as clean
As a sparkling mountain stream.

The changing quicksilver currents of
This sharp rippling waters cut
Stones down into polished gems.

The flowing patterns of experience
Passed like a shining light
Through his face, through his hands,
Through his stance, through his glance.
His smile was gay and quizzical.
(From—David Mccutchion, *Shraddhanjali,*
Writers Workshop)

'উদ্বাস্তু'-র সঙ্গে কি 'মারজিন্যাল মেন'-এর তুলনা চলে?

''চতুরঙ্গ'' পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর The Marginal Men-এর আলোচনা প্রসঙ্গে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থটির উল্লেখ করে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার।

'দি মারজিন্যাল মেন'-এর অনেক আগে লেখা হয় 'উদ্বাস্তু'। এই চিঠি থেকে মনে হয় 'দি মারজিন্যাল মেন'-এর লেখক 'উদ্বাস্তু'-র লেখকের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেন নি। তাঁর এই ধারণা হবার কারণ হল এই যে জ্যোতির্ময় বসু গ্রন্থটির সমালোচনা করবার সময় লিখেছেন তুলনীয় কিছু এ পর্যন্ত ইংরেজি বা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পত্রলেখক দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: এক, 'উদ্বাস্তু' 'মারজিন্যাল মেন'-এর বিশ বছর আগে লেখা; দুই, 'উদ্বাস্তু'-র সঙ্গে 'মারজিন্যাল মেন'-এর তুলনা করা চলে কিনা।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলি, 'মারজিন্যাল মেন'-এর লেখক তাঁর গ্রন্থের Acknowledgement-এ প্রথমেই 'উদ্বাস্তু'-র উল্লেখ করেছেন। যথা-

There is virtually no literature on the subject apart form three books: (1) Hiranmay Bannerjee's *Udvastu* which gives an account of the influx of refugees into West Bengal and the tentative rehabilitation work undertaken by the Govt. of West Bengal till the beginning of 1955. It is a running commentary of his work as Rehabilitation Commissioner of the Refugee Relief and Rehabilitation Dept, Govt. of West Bengal (p XIX).

'মারজিন্যাল মেন'-এর লেখক বইয়ের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে 'উদ্বাস্তুর' কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। যেমন প্রথম অধ্যায়ের সব কয়টি সারণীই 'উদ্বাস্তু' থেকে নেওয়া, একথা লেখক স্বীকার করেছেন (vide Chapter One, p. 2, 3, 4, Notes 3, 4, 6, 7, 8)। প্রথম অধ্যায়ে কানাডার সাংবাদিকের বিবরণও 'উদ্বাস্তু' থেকে আহৃত তাও তিনি স্বীকার করেছেন (vide Chapter One, p. 5, Note 9)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছড়াটিও উদ্বাস্তু থেকে নেওয়া (vide Chapter Two, p 6, Note 1)।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্তুদের যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন তা লেখক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী তাঁর বইতে 'উদ্বাস্তু' থেকে তুলে দিয়েছেন (vide Chapter Two, p. 10, Note 10)। ১৯৪৭ এর ১৬ জুলাইয়ে গান্ধীজির প্রার্থনান্তিক ভাষণ 'উদ্বাস্তু' থেকে উদ্ধৃত (vide Chapter Two, p. 9, Note 21)। গভর্নমেন্ট ক্যাম্পে রিফিউজিদের তিনটি শ্রেণীতে বিভাজনের কথা 'মারজিন্যাল মেন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ও 'উদ্বাস্তু' থেকে নেওয়া (vide Chapter Two, p. 26, Note 36)। উদ্বাস্তুদের ত্রাণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহনলাল শাকসেনার সঙ্গে ডঃ মেঘনাদ সাহার যে বিতর্ক হয়েছিল তার বিবরণও 'উদ্বাস্তু' থেকে সংগৃহীত (vide Chapter Two, p. 28 & 31, Notes 38 & 42)। West Bengal Rehabilitation Dept. মুসলমান উদ্বাস্তুদের যে পরিমাণ জমি ফিরিয়ে দিয়েছিল, তার পরিসংখ্যানও 'উদ্বাস্তু' তাকে আহৃত (vide Chapter Five, p. 107, Note 29)। সরকার যে ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যুক্তিসহ ব্যবস্থার কথা ১৯৫৫-তে ভাবতে শুরু করেন এই কথাও উদ্বাস্তু থেকে সংগৃহীত (vide Chapter Ten, p. 162, Note 1)।

এ থেকে যে কোনো পাঠ বুঝতে পারবেন যে লেখক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ের জন্য 'উদ্বাস্তু'কে আকর গ্রন্থের মতো ব্যবহার করেছেন এবং তার স্বীকৃতিও বইয়ে আছে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। কিন্তু তার আর্থ এই নয় যে উদ্বাস্তু সমস্যার ''সমাধানে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার একটি পুরো ছবি এই গ্রন্থে পাই''। তা যে নেই তা হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং স্বীকার করেছেন। It was only in 1955 and thereafter, that the Govt. of India settled down to tackle the problem of displaced persons from East Pakistan. 'উদ্বাস্তু'তে ১৯৫৪ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের আগমন ও ত্রাণের ব্যবস্থার কথা আছে।

কিন্তু ১৯৫৪তে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কী করা হবে তা কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করে উঠতে পারেননি।

১৯৫৪তে পণ্ডিত নেহরু উদ্বাস্তু সমস্যার বিশালতা ও জটিলতার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেছিলেন। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তখনও হয়নি। অতএব বোঝা কঠিন কী ভাবে 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের পুরো ছবি পাওয়া যায়। পার্লামেন্টের কমিটি অভ রিডিউ অভ রিহ্যাবিলিটেশন ওআর্ক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫৪ পর্যন্ত এদেশে অবগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২২,৮৮,১৩৪। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত আরও ২৯,৯৫,১৯০ জন উদ্বাস্তু এদেশে আসেন। ১৯৭০-এর পর যাঁরা এসেছেন তাঁদের সংখ্যা কমিটি অভ রিডিউয়ের পরিসংখ্যানে নেই। পত্রলেখকের বক্তব্য যদি মেনে নিতে হয় তবে একথা মেনে নিতে হবে যে উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার আগেই তাদের সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর 'উদ্বাস্তু' বইটি লেখা শেষ করেন তখন তিনি একথা কোথাও বলেননি যে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বরং উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহানা বিষয়ে তাঁর খেদ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও লোকই জানেন যে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। এ নিয়ে এখনও পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। অথচ পত্রলেখক জানালেন যে ১৯৫৪ তেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে! তিনি কোন্ দেশে বাস করেন?

আরও একটি কথা—'উদ্বাস্তু'তে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে বেসরকারী প্রচেষ্টার কথা তিনি কোথায় পেলেন? 'উদ্বাস্তু'তে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টার কথাই আছে। মাঝে মাঝে লীলা রায়, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন নেতার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়াসের কথা আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বেসরকারী প্রচেষ্টার যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ইউ.সি.আর.সি.তার উল্লেখও এই গন্থে নেই। পত্রলেখক কি 'দি মারজিন্যাল মেন' ও 'উদ্বাস্তু'—এই দুটি গন্থের একটিও কি পড়েছেন?

একমাত্র 'দি মারজিন্যাল মেন'-এই দেশ বিভাজন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু সমস্যাকে সামগ্রিক ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এতে এই সমস্যা সমাধানের সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রামাণিক দলিল-নির্ভর অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থের সঙ্গে 'তুলনীয় আর কিছু এ পর্যন্ত ইংরেজি বা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই'—একথা লিখে সমালোচক জ্যোতির্ময় বসু তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনেরই পরিচয় দিয়েছেন।

রণেন্দ্রনাথ দেব
কল্যাণী, নদীয়া

'উদ্বাস্তু'

জুলাই সংখ্যাটি চমৎকার হয়েছে—যেমন গেট-আপ— তেমনই বিষয় সন্নিবেশ।

এই সংখ্যায় ড.অরুণ মুখোপাধ্যায়ের পত্রখানি পড়ে আশ্বস্ত হলাম। তিনি একেবারে আমার মনের কথাগুলিই ব্যক্ত করেছেন। মে সংখ্যায় 'পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু ইতিবৃত্ত' পড়ে ড. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তু' বইখানির কথা মনে পড়েছিল। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবাসরের সদস্য ছিলেন। তাঁর 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থের একখানি আমাকে দিয়েছিলেন, বইটি সেইসময় পড়েওছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ হলে যা হয়, নানা বইয়ের স্তূপের মধ্যে সে বই কোথায় আছে খুঁজে বের করবার সামর্থ্য না থাকায় এ বিষয়ে লিখতে ইচ্ছা হলেও লিখতে পারিনি। পরে বিষয়টি ভুলেও গিয়েছিলাম। ড. মুখোপাধ্যায় একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ করেছেন—এ জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সন্তোষ কুমার দে
১৪৬ কে. এন. সেন রোড কলকাতা ২৮

লাল রক্তের নীল আভা

'চতুরঙ্গ' জুলাই (১৯৯২) সংখ্যায় শ্রী পান্থের 'সুভো ঠাকুর' শীর্ষক অতি হৃদয়গ্রাহী লেখাটি পড়ে একটি ছোট ঘটনা আমার চোখে ভেসে উঠল। সুভো ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ঘাটের দশকের শেষ ভাগে শ্রীনীহার চক্রবর্তী মহাশয়ের রাসেল স্ট্রিটের বাস ভবনে।

তখন শ্রীচক্রবর্তী বাড়ীতে *avant garde* লেখক-শিল্পী, দলছুট-দলখোঁজকারী-ক্ষমতা শিকারি ও ক্ষমতাচ্যুত রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার-ব্যারিস্টার ও আমাদের মত মেঠো হাকিমদের নানা রকম আড্ডা হত। তবে বেশ কায়দা

করে আড্ডা হত ভিন্ন ভিন্ন দিনে এবং কখনও একদিনে হলেও ভিন্ন ভাগে—যাতে তৈলাক্ত জল বা জলাক্ত তেলের বিশ্রী কম্পাউণ্ড কারুর অসোয়াস্তির কারণ না হয়। সেখানেই সুভো ঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা ও পরিচয়।

সৌম্য, শান্ত, মার্জিত, মিষ্টভাষী সুভো ঠাকুর হাস্যরস সিঞ্চিত ছোট ছোট কথায় সবাইকে হাসিয়ে সবার মন কেড়ে নিয়ে অল্পক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে নিজের কাজে চলে যেতেন। দুচার মিনিটের বেশি থাকতেন না। অনেক সময় চৌকাঠে দাঁড়িয়েই কথা সেরে চলে যেতেন। যেদিন উনি আমাদের আড্ডায় আসতেন না, মনে হত আড্ডাটা বৃথা গেল।

সম্ভবত, ১৯৭১ সালের শেষের দিকে হবে, খবর এল আমি যেন অফিস থেকে ফেরার পথে রাসেল স্ট্রিট হয়ে যাই। ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন আড্ডা বসছে এবং তা ঠিক হয়েছে হঠাৎ, তাই এই শমন। শীতের প্রারম্ভ বেলা ছোট হয়ে এসেছে। বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অফিস ফেরতা ভিড় ঠেলে রাসেল স্ট্রিট পৌঁছতে অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে গেল।

টগরগাছের পাশে আমার নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্ক করে গাড়ি হাঁটতে পোর্টিকোর তলায় যেতেই দেখি ঢোকার বিরাট দরজার ফ্রেমে এক খোদাই করা গ্রীক মূর্তির সিলোয়েটের মত দাঁড়িয়ে আছেন সুভো ঠাকুর। চারদিকে ঘন অন্ধকার, পিছনে বহুদূরে মৃদু আলোতে সিলোয়েটটি যেমন নিকষ কালো হয়ে দেখাচ্ছে চারিদিকের বাতাবরণ তেমনই রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

সব ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল। যাইহোক আমিই কথা শুরু করলাম 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করে। উত্তর এল 'আসুন আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।' কণ্ঠস্বর নরম কিন্তু সেই স্বভাবসুলভ মিষ্টতা নেই। খটকা লাগল—কোন ভাবে না জেনে ওঁকে অফেন্ড করিনি তো। আমার কিছু বলার আগে উনি নম্র কিন্তু বেশ রুষ্ট স্বরে বললেন ''বলুন ত আপনার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি যে আপনি আমার এমন শত্রুতা করলেন।' এবারে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম—কী বলব তা চিন্তা করছি—কিন্তু কোন উত্তরের সুযোগ না দিয়ে সুভোঠাকুর বললেন ''পদ্মটা না হয় আমি নিজে জোগাড় করে নিতে পারি। নিউ মার্কেটে দুই ফুলওয়ালা আমার চেনা আছে—বায়না দিলেই ওরা এনে দেবে। ওরা যদি না পারে তাহালে জনাইয়ে আমার জমির কাছে এক আধমজা পুকুর আছে সেখান থেকেও যে কোন সময় পেতে পারি। কিন্তু 'ভূষণ' বা 'শ্রী' ত আর আমি যোগাড় করতে পারব না। বাকি জীবনটা ভূষণহীন এবং শ্রীহীন হয়ে কাটাতে হবে আপনার জন্য। এটা কি খুব ভাল হল?'

'দেখুন ত কী পরোপকারী লোক তিনি।

'রাইটার্সের ক্ষুদে ছোট, সেজো মেজো এবং নাকি দু এক ক্ষেত্রে ম্যোদ বড় কর্তাদের কারুর বিলিতি সিগারেট, বা অন্যকারুর বিলিতি হুইস্কি, কাউকে বাটার ৩০০/- ক্রেডিট ভাউচার, আর কিছুকে ভাল ভাল হুলের কমপ্লিমেন্টারি টিকিট যার যা দরকার তাঁকে সেটা এনে দেন কত কষ্ট করে। উনিই নিজে থেকে আমায় কথা দিয়েছিলেন যে বড় বাবুকে দিয়ে ফাইল চালু করে যার যেখানে সই দরকার তা করিয়ে নিয়ে সুদূর দিল্লী ইস্তক ধাওয়া করে আমাকে এবার ২৬শে জানুয়ারিতে নিশ্চয়ই 'ভূষণ' নইলে নিদেন পক্ষে 'শ্রী' পাইয়ে দেবেন। কিন্তু কাল বিকেলে এসে বলে গেলেন যে যদি ওঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ তোলাতে না পারি তাহলে ওঁর পক্ষে আর কিছু সম্ভব নয়।'

এতক্ষণে উনি ঘুরে আমাকে নিয়ে ঘরের দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আলোর কাছাকাছি আসতে ভাল করে তাকিয়ে দেখি যে মুখ খুব গম্ভীর হলেও চোখে এক অদ্ভুত কৌতুকের দৃষ্টি।

এরপরেই তাঁর স্বভাবিক নম্র ও মিষ্টি ভাবে বললেন 'যাক, তাও সাহস করে কিছু করেছেন—যদিও ধোপে টিঁকবেনা। এবার ভেতরে যান—পঞ্চায়েত বসেছে। আপনার কী শাস্তি হয় দেখুন।'

মন থেকে এক জগদ্দল পাথর নেমে গেল। টাকের সঙ্গে মাথা দেবার সাহস নিয়ে ভেতরে গেলাম।

সুভো ঠাকুর তাঁর নীল রক্তকে যতই লাল করার চেষ্টা করুন, তাঁর লাল রক্তে নীল আভার স্বাভাবিক ও সাবলীল বিচ্ছুরণ কোন দিনই বন্ধ হয়নি।

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮সি, ব্লক—ডি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩

বিষ্ণু দে-র এলিঅট অনুবাদ

আপনাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—আমার স্বামীর (বিষ্ণু দে) জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীমান্ সুজিৎ 'চতুরঙ্গে' যে লেখাটি লিখেছে, সেটির জন্য।

আমার আরও আগেই আপনাকে লেখা উচিত ছিল—ক্ষমা করবেন। আমার ডান হাতে এমন একটা ব্যথা

হয়েছিল ক'দিন ধরে (যাকে বলে 'frozen shoulder'—তাই, বোধ হয়)—আমি কলম ধরতে পারছিলুম না! তাই আশাকরি আমার এই দেরি ক্ষমা করবেন। সেই কপি 'চতুরঙ্গ' টি আবার আমাদের এক বন্ধু নিয়ে গিয়েছেন—তাই ঠিক সংখ্যার নম্বরটিও লিখতে পারছিনা! তবে সুজিতের লেখাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার স্বামীও বলতেন—দেশের কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে কী ভাবেই যেন, এলিঅট অনুবাদগুলি এসে যেত—এ বিষয়ে নিজেও লিখেছেন। যেমন কবিতার বিষয়ে সব সময়ে ভাবতেন, তেমনই দেশের কথাও চিন্তা করতেন—তাই এক এক সময়ে দেশের কোনও বিশেষ ঘটনার সঙ্গে ওঁর অনুবাদও এসে যেত, স্বাভাবিক ভাবেই।

এই সঙ্গে আমি একটি ছোট্ট ভুলের কথা উল্লেখ করছি—খুবই ছোট, তবুও। সুজিৎ এলে ওকেও বলে দেব। 'চতুরঙ্গ' ৭ই নভেম্বর ১৯৯১এর সংখ্যায় (পৃ ৫৯১এ) সুজিৎ ছোট্ট একটি ভুল করেছে—তারিখে।

সুজিৎ লিখেছে—'বিষ্ণু দের বিবাহ ১৯৩৫ সালে।' কিন্তু আসলে ২রা ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে, রবিবার ছিল সেই দিনটি!

আপনাকে আবার আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানিয়ে শেষ করি।

প্রণতি দে
১/১০ প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ রোড কলিকাতা-২৬